নবম দশম

১ মার্চ ১৯৮২

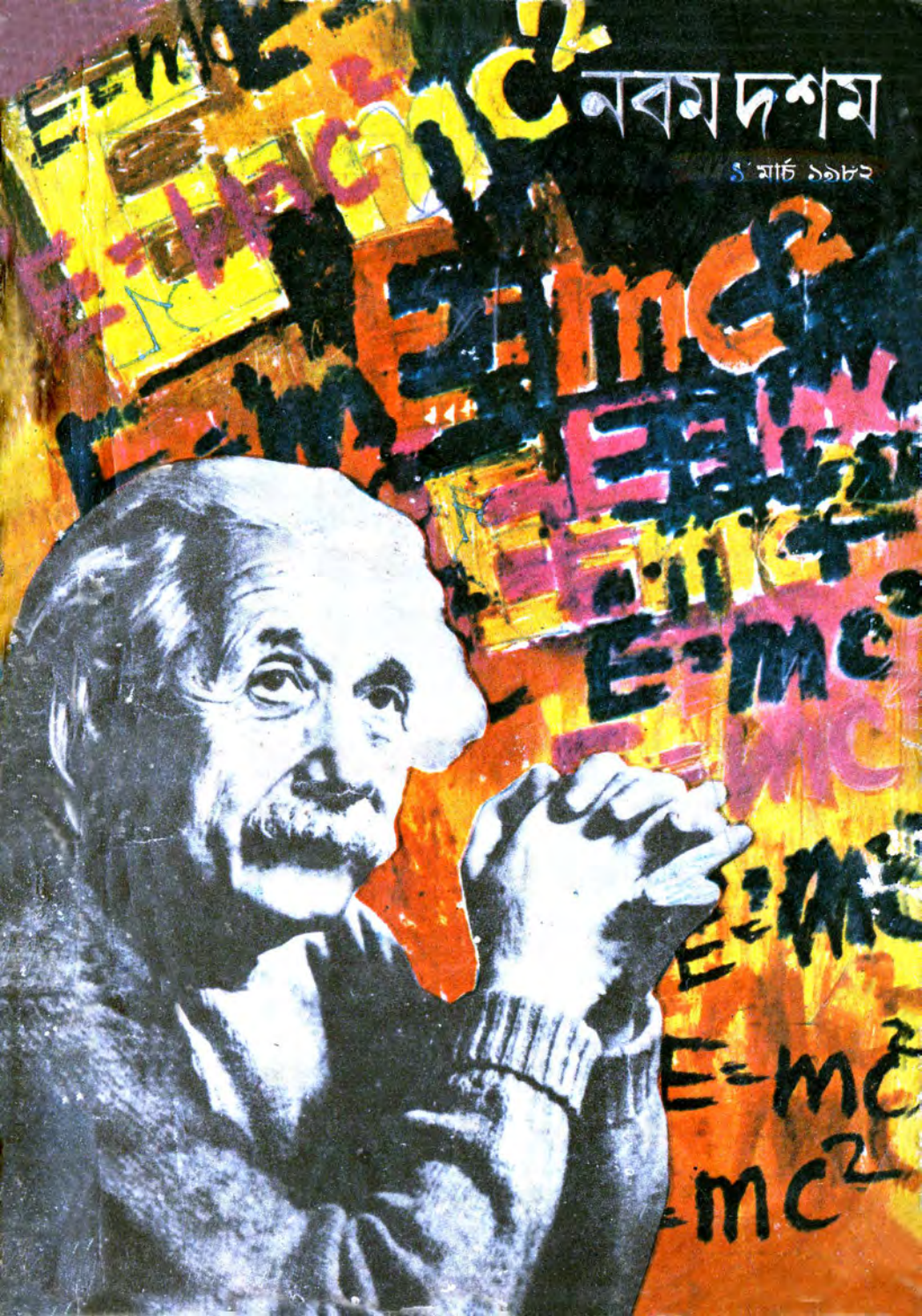

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন : অনির্বাণ দে

স্ক্যান ও এডিট করেছেন : সুস্মিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান আভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

পরিবর্তন

সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

* আপনি কি সম্প্রতি পরিবর্তন পড়েছেন ? পড়ে থাকলে নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন ব্যতিক্রমী পত্রিকা পরিবর্তন এখন আগের চেয়ে আরো উজ্জ্বল, আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

* পরিবর্তনে ভাসা ভাসা কিংবা দায়সারা লেখা ছাপা হয় না। দুর্ধর্ষ তদন্তমূলক লেখা পরিবর্তনের অনন্য বৈশিষ্ট্য। ফোন নিয়ে তো কত লেখাই ছাপা হয়, কিন্তু পরিবর্তনের মতন এমন মূলে নাড়া দিতে পারে কে ? পরিবর্তন আপনার হাতে তুলে দেয় দেশ-বিদেশের তাজা খবর, সঙ্গে দুর্লভ ফটো। প্রতি সপ্তাহেই নিত্য নতুন। অনেক ঝুঁকি নিয়ে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস লেগে থেকে পরিবর্তনের প্রতিবেদকরা তথ্য ও ফটো সংগ্রহ করেন। তাই এ পত্রিকার মেজাজই আলাদা—টাটকা, আধুনিক, অন্তর্ভেদী এবং গভীর।

* শুধু গত ডিসেমবরের পাঁচটা সংখ্যার কথাই ধরুন না। রেডক্রশের অপচয়-দুর্নীতি কিংবা বিশ্বভারতীর বন্ধ্যা দশা সম্পর্কে এমন গভীর তথ্য-নিষ্ঠ লেখা আর চোখ-জুড়ানো ফটো আর কোন বাংলা কাগজে পেয়েছেন কী ? কেউ কি দিতে পেরেছে মুরিয়াদের ঘোটুল জীবনের সাম্প্রতিক ধারা কিংবা ঝাড়খণ্ড আন্দোলন সম্পর্কে এত সাবিক লেখা ও এমন দুর্লভ ফটো ? প্রমোদ দাশগুপ্ত সম্পর্কে পরিবর্তন পড়ার আগে আপনি কতটুকু জানতেন ?

* পরিবর্তন কিন্তু নিজেকেই নিজে ভেঙে দেয়। তাই দেখুন না জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে কত নতুন ফিচার—বৈচিত্র্যে, অভিনবত্বে, গভীরতায় প্রতিটিই অসাধারণ। মন-কাড়া ফটো তো আছেই। আপনি কি জানেন কোন বিখ্যাত বাঙালী নেতা গণ-পিটুনির ভয়ে থানার আলমারিতে লুকিয়ে ছিলেন ? গ্রামে-গঞ্জের বিচিত্র মানুষজনকে কতটুকু চেনেন ? কী জানেন তৃতীয় বিশ্বের চলচ্চিত্র সম্পর্কে ? পরিবর্তন সব আপনার দুয়ারে এনে হাজির করছে।

* বিজ্ঞাপন দিয়ে কাউকে চিরকাল ভোলানো যায় না। নিজেই বরং হাতে তুলে নিন, তুলনা করুন, মেলান, তারপর নিন—পরিবর্তন।

পরিবর্তনের কোন তুলনা নেই—স্বাদে রুচিতে, গভীরতায়
পরিবর্তন মন ভরায়, ভাবায়, নাড়ায় এবং পালটে দেয়

শিলাদিত্য

এপ্রিল সংখ্যার
বিশেষ আকর্ষণ

বিমল করের
অসাধারণ রচনা
'আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা'
ধারাবাহিক বেরোচ্ছে

তিরিশ বছরেরও বেশি হলো সেই পঞ্চাশের মাঝামাঝি থেকে আজ আশির গোড়ার দিক—এই দীর্ঘ সময়ে বাংলা সাহিত্যে কত নতুন লেখকেরই না আবির্ভাব ঘটেছে। একদা যাঁরা বয়সে ছিলেন তরুণ ও সাহিত্যে নবীন, আজ তাঁদের সকলেরই যেমন বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে, অনেকেই আবার নিজগুণে বাংলা সাহিত্যে অতিপরিচিত।

বিমল কর যে সব অনুজ লেখকের সঙ্গে আজ প্রায় তিরিশ বছর পরিচিত ও কমবেশি ঘনিষ্ঠ—তাঁদের কথা যখন বলেন, অনুমান করা চলে, কিছু সংখ্যক সাহিত্যানুরাগী সে কথা শুনতে আগ্রহ বোধ করবেন। সাহিত্যিকদের আড্ডাখানা স্বভাবতই আকর্ষণীয়, বিশেষ করে সেই আড্ডায় যদি নানান ঘটনা, কৌতুকপ্রদ কাহিনী, লেখকদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতার অজস্র উপাখ্যান ছড়িয়ে থাকে। কলেজ স্ট্রিটের আড্ডাখানায় কত লোকের সঙ্গেই না পরিচয় ও বন্ধুত্ব ঘটেছে বিমল করের। সেই পরিচয়ের স্মৃতিকথা হিসেবে বিমল কর এই রচনাটি নিবেদন করছেন এপ্রিল সংখ্যা থেকে।

নবম দশম

প্রথম বর্ষ ● পঞ্চম সংখ্যা ● ১ মার্চ ১৯৮২ ● দাম ৫ টাকা
বিমান মাশুল ঃ পূর্বাঞ্চলে ৩০ পয়সা, ভারতের অন্যত্র ৪০ পয়সা

সূচীপত্র

পাঠক্রম বিভাগ

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য

● **প্রথম পত্র / কুমার চট্টোপাধ্যায়**
পাঠ সংকলন (পদ্যাংশ) ঃ মধ্যাহ্নে / ৫
অনুবাদ ঃ প্রকৃত অনুবাদ / ১০
ভাবসম্প্রসারণ ঃ ভাবোদ্ধৃতি নিয়ে আলোচনা / ১১
প্রবন্ধ রচনা ঃ তোমার প্রিয় কবি (সুকান্ত) / ১৩
কথা ও কাহিনী ঃ মূল্যপ্রাপ্তি / ১৭
কবিতা সংকলন ঃ ধাত্রীপান্না / ১৯

● **দ্বিতীয় পত্র / নির্মল লাহিড়ী**
পাঠ সংকলন (গদ্যাংশ) ঃ ভানুসিংহের পত্র / ২২
ব্যাকরণ ঃ প্রতিবর্ণীকরণ / ২৫
গল্প সংকলন ঃ রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা / ২৯
পদার্থবিদ্যার নবযুগ ঃ ইলেকট্রন / ৩২

দ্বিতীয় ভাষা ঃ ইংরাজী / অতনু রায়

Text Home they brought her warrior dead ৩৭
Grammar Preposition/ ৪০
Translation : Sequence of Tenses / ৪৬
Composition Paragraph Writing / ৫০
Discussion Simple Present ও Present Continuous Tense-এর আকার / ৫৩

ভারত ও ভারতবাসী

● **ইতিহাস / নারায়ণচন্দ্র চন্দ**
জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ৫৫
● **ভূগোল / গৌতম মল্লিক**
মধ্য ও পূর্ব হিমালয়ের কথা / ৬৬

বিজ্ঞানপর্ব

● **গণিত / দীপক সেনশর্মা**

পাটিগণিত / ব্যস্তানুপাত ও সমানুপাত / ৭৯

বীজগণিত / মিড্‌ল্ টার্ম ! ৮৩

জ্যামিতি / উপপাদ্যের extra সমাধান / ৮৮

পরিমিতি / আয়তক্ষেত্র এবং বর্গক্ষেত্র / ৯১

● **ভৌত বিজ্ঞান / অমৃতসূ দাস**

স্থিতি ও গতি / ৯৫

পদার্থের ধর্ম / ১০৩

● **জীবন-বিজ্ঞান / দেবাশিস বিশ্বাস**

সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের তাৎপর্য / ১০৭

কর্মশিক্ষাপর্ব

● **কর্মশিক্ষা / পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায় / ১২০**

● **শারীর শিক্ষা / অমিয় সাহা / ১২৫**

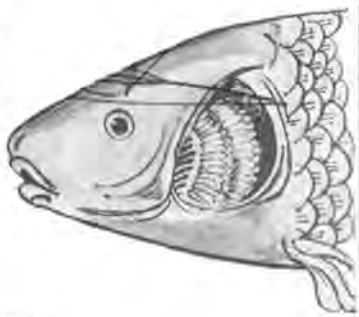

সহপাঠক্রম বিভাগ

বিচিত্রা : বিজ্ঞানী আইনস্টাইন \ সমরজিৎ কর\/১২৯

নতুন করে দেখা : মল্লভূমি বিষ্ণুপুর / উৎপল চক্রবর্তী / ১৩৯

গতির জগতে মানষ / শতঞ্জীব রাহা / ১৫১

দৃষ্টিহীন কৃতি ছাত্রী মণিকা ধর / সমীরণ মুখোপাধ্যায় / ১৪৫

টেবল টেনিস : সেকাল থেকে একাল / সন্দীপ দত্ত / ১৫৭

তুমি কী হতে চাও : বলেছেন শিল্পী সুধীর মৈত্র / ১৪৮

বিদ্যালয় পরিচিতি : পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ /তাপস কুমার ভট্টাচার্য/ ১৩৩

বুদ্ধির খেলা / ১৪৩

সন্ধানী প্রতিযোগিতা / ১৩৭

তোমাদের বই / লোচন শর্মা/ ১৫৫

এবং জবাব / ১৫৯

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : নিতাই ঘোষ

সম্পাদক : অশোক চৌধুরী

সংযুক্ত সম্পাদক : নীরদ হাজরা

শিল্প নির্দেশক : নিতাই ঘোষ

সম্পাদকীয় দপ্তর : ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭২, ফোন ২৭-২১৬৯।

সম্পাদকীয়

নবম দশমের পঞ্চম সংখ্যা যখন প্রকাশিত হবে, তার দিন কয়েকের মধ্যে শুরু হবে এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। ত্রিপুরা ও পশ্চিম বাঙলার সমস্ত পরীক্ষার্থী এখন, এই সম্পাদকীয় লেখার সময়ে রয়েছে প্রস্তুতিতে ব্যস্ত।

আমি চোখ না বুজেও যেন দেখতে পাচ্ছি, কেউ দিন-রাত পড়ে চলেছে, কেউ হা-হুতাশ করছে, কেউ পড়াশুনা করা সত্ত্বেও ভয়ে বিকল হয়ে পড়ছে—আর একদল জানেই যে ফেল করবে, তারা নিশ্চিন্ত মনে দিনযাপন করছে। এরা সকলেই অপ্রস্তুত বা আংশিক প্রস্তুত।

এর কোনটাই কিন্তু প্রকৃত পড়ুয়ার চিত্র নয়। যে ছাত্র বা ছাত্রী সারা বছর ধরে একটু একটু করে ক্রমিক অথচ অবিচ্ছিন্ন গতিতে পাঠক্রম প্রস্তুত করে যায়, তাদের এ দশা হয় না। তারা জানে পাঠক্রমে কি আছে, কি প্রশ্ন আসতে পারে আর কি তার উত্তর। এজন্য তারা ভয়ও পায় না, বিফলও হয় না। কারণ এরা প্রস্তুত।

অপ্রস্তুতরা পরীক্ষা সম্পর্কেই একটা বিকৃত ধারণা পোষণ করে। তারা ভাবে পরীক্ষক মানেই একজন উন্মত্ত কসাই। সে রক্তচক্ষু, উদ্যতছুরি—মুখে সর্ব মায়া-মমতাশূন্য নৃশংসতা। সুযোগ পেলেই আড়াই পোঁচে নয়—এক কোপে শেষ করে দেবেন।

কিন্তু পরীক্ষক সম্পর্কে এ ধারণাটাই ভুল। পরীক্ষকরা অবশ্যই তোমার পক্ষে কতটুকু জানা সম্ভব, আর কি কি জানা সম্ভব নয়। যেটুকু জানা সম্ভব, সেইটুকুর ভেতর থেকেই তিনি প্রশ্ন করেন। তোমাকে ফেল করাবেন বলে প্রতিজ্ঞা নিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন না। তা যদি করতেন, তবে কেউই পাশ করত না। আসলে তুমি যদি নিজে প্রস্তুত না হও তবে সাধ্য আছে কি কারও তোমাকে পাশ করাতে?

এই প্রসঙ্গে আরও একটা হিসাব তোমাকে বলি। মোটামুটি তিরিশ পেলে পাশ। অর্থাৎ একশ'র মধ্যে সত্তর না পেলেও তুমি পাশ। তুমি যতটা জান, ততটা পণ্ডিত আর যতটা না জান, ততটা মূর্খ যদি হও, তবে জেন, তুমি শতকরা ৭০ ভাগ মূর্খ হলেও পাশ করবে। এর পরেও যদি তুমি ফেল কর, তবে তুমি কত বড় মূর্খ প্রমাণ হয়ে গেলে, তা কি বুঝতে পারলে? চেষ্টা করলে কি ত্রিশ ভাগ পণ্ডিত হওয়া যায় না?

আর মাত্র দু বছর বাকি। আগামী ১৯৮৪ সালের মার্চে তোমাকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে হবে। এখন থেকে তার জন্য প্রস্তুত হও। তোমরা যারা 'নবম দশম' নিয়মিত পড়ে যাচ্ছ—আমরা নিশ্চিত তাদের ফেল করাবার সাধ্য কারও ত নেই-ই—তারা ভাল ফল করবেই করবে।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য

প্রথম পত্র

পাঠ সংকলন ঃ পদ্যাংশ

মধ্যাহ্নে ঃ অক্ষয়কুমার বড়াল

মধ্যাহ্নে কবিতাটির পাঠ এবং সাধারণ প্রশ্নোত্তর আলোচনা আমরা গত সংখ্যাতেই শেষ করেছি। তবু এ সংখ্যায় আমরা 'মধ্যাহ্নে' কবিতাকেই শিরোনামে রেখেছি। কারণ আমাদের বোধ হয়েছে, সব আলোচনা করেও ঘুরিয়ে এ কবিতা সম্পর্কে আমাদের বলবার কথা কিছু বাকি থেকে গেছে। অতএব এই সংখ্যায় আমরা পাঠ-পরবর্তী একটি মূল্যায়ন করে নিতে চাই। দেখে নিতে চাই, এই কবিতাটি আমাদের যথার্থ অধিগত হয়েছে কিনা।

প্রথমেই ধরা যাক, সমগ্র কবিতার মূল বক্তব্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে কি? **কবির বক্তব্য কি কি পর্যায়ে এবং পারম্পর্য অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছে?** বা **কবিতাটির ভাব-বস্তুর সংক্ষিপ্ত রূপ কি?**

এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে তুমি কবিতাটিকে মনে মনে আউড়ে, লাইনগুলো গদ্য করে সাজিয়ে দিলেই হবে। এজন্যই কবিতাটি তোমার মুখস্থ রাখা দরকার।

কিন্তু ঐরকম উত্তরে পাশ নম্বরের চেয়ে সামান্য বেশি কিছু পাওয়া গেলেও যেতে পারে, তার বেশি নয়। বেশি নম্বর পেতে গেলে এমন কিছু লেখা দরকার যার থেকে বোঝা যাবে, বিষয়টাকে তুমি খুব ভাল করে বুঝেছ এবং তাকে নানা দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে তোমার ধারণাকে মজবুত করে রেখেছ। **এবং,** যেহেতু এটা বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের পত্র, অতএব বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে তোমার জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় এবং সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে তোমার বোধের পরিচয়ও তোমায় ধরে দিতে হবে।

তুমি ভাবছ, ওরে বাবা! এত কিছু কি পারা যায়! আর আমি জানি নাকি অত কিছু!—তোমার এসব ভাবনা কিন্তু আদৌ সত্য নয়। এগুলো পারাও অসম্ভব ব্যাপার নয় আর তুমি একেবারেই জান না, এমনও নয়। যেমন ধর, তুমি নিচের কথাগুলো নিশ্চয় আগের সংখ্যা থেকেই জেনেছ—

১. অক্ষয়কুমার বড়াল একজন **রোমান্টিক গীতিকবি।**

২. রোমান্টিক গীতকবিরা কোন **কাহিনী বর্ণনা করতে চান না। কোন**

নীতি বা আদর্শ প্রচারও তাঁদের লক্ষ্য নয়।

৩. আপন মনের একান্ত ভাবনা **ব্যক্তিগত অনুভূতির গভীরতায় ও আন্তরিকতায়** সত্যমণ্ডিত ও সজীব করে তোলেন।

৪. বাঙলা সাহিত্যে **বিহারীলাল চক্রবর্তীই** প্রথম এজাতের কবি। অক্ষয়কুমার তাঁর ভাবশিষ্য।

৫. অক্ষয়কুমার ব্যক্তিজীবনে ছিলেন এ্যাকাউণ্টেণ্ট্। টাকাকড়ির হিসাব রক্ষা ছিল তাঁর জীবিকা। তাই অবসরে একান্তে নির্জনতায় ও প্রকৃতির সান্নিধ্যে তিনি **এক কাব্য পরিমণ্ডলে** ডুব দিতে চাইতেন।

কবি ও কাব্য ইতিহাস সম্পর্কে এসব কথা তুমি জান। এ কবিতাটি যে রোমাণ্টিক গীতিকবিতা এবং এতে যে কাহিনী-নীতি-আদর্শ প্রচার নেই আছে ব্যক্তিগত অনুভূতির আন্তরিক প্রকাশ—তা বলাই ত সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে তোমার ধারণার প্রকাশ।

আবার দেখ, কবিতাটিকেও আমরা বিশ্লেষণ করে পড়েছি। প্রথমাংশে কবি নিজের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক বর্ণনার স্তর আছে দুটি। প্রথম স্তরে, কবির মন বিচলিত। দ্রুত এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে ছুটে চলেছে কবির মন ও চোখ। সেখানে শব্দ, দৃশ্য এবং স্পর্শ অর্থাৎ কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক প্রত্যক্ষভাবে অনুভব জাগিয়ে চলেছে। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে কবির মন অপেক্ষাকৃত স্থির। আর এবারে কবি অনেকক্ষণ ধরে এক একটা দৃশ্য দেখছেন এবং ধীরে ধীরে বর্ণনা করছেন। লক্ষ্য কর, এই অংশে বাক্যগুলোও বড় বড়। কিন্তু প্রথম স্তরে বাক্যগুলো সংক্ষিপ্ত—দ্রুত মনোযোগ-সঞ্চালনের প্রমাণ।

দ্বিতীয় পর্বে কবির মন ক্রমেই আত্মসমাহিত হচ্ছে। তাঁর মনে কি এক হারানর বেদনা ঝরে পড়ছে। কবি ক্রমেই ব্যক্তি অনুভূতি থেকে এক সার্বজনীন বেদনার উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন।

এই আলোচনা থেকে বোঝা গেল, যে সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে একজন ভাল ছেলে ভাল নম্বর পায়, তা এমন কিছু অপ্রাপণীয় ব্যাপার নয়। তা তোমার হাতের কাছেই আছে—স্কুলে মাস্টারমশাই বা দিদিমণি যেগুলো বলেছিলেন, বুঝিয়েছিলেনও। কিন্তু তুমি সেগুলো না করেছ সংগ্রহ, না করেছ ব্যবহারের চেষ্টা। যে কোন শিক্ষার্থীর কম নম্বর পাওয়ার পিছনে ঐ এক কারণ থাকে।

তাহলে এবার একটা আদর্শ উত্তর তৈরী করা যাক। মনে রেখ, আদর্শ উত্তর অর্থ শ্রেষ্ঠ উত্তর নয়। আমার চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তি এর চেয়েও ভাল উত্তর লিখতে পারবেন। তবে আমরা তোমার সামনে একটা কাঠামো তুলে দিতে পারব। আর তাতে কবিতাটির গদ্যরূপ লেখার চেয়ে বেশি নম্বর পাবে।

* * *

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা কবিতার 'ভোরের পাখি' বিহারীলাল চক্রবর্তীর ভাবশিষ্য অক্ষয়কুমার বড়াল 'মধ্যাহ্নে' নামক গীতি-কবিতায় কোন এক নির্জন মধ্যাহ্নের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে আত্মসমাহিত হওয়ার ব্যক্তিগত অনুভূতির গভীরতা আন্তরিকভাবে বিবৃত করেছেন।

ব্যক্তিজীবনে অক্ষয়কুমার ছিলেন হিসাবনবীশ। সেই অবাঞ্ছিত জীবনযাত্রার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির অভিলাষে এবং প্রকৃতির রূপ-শব্দময় জগতের অকৃত্রিম স্পর্শে কাব্যজগতে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষায় কোন এক দুপুরে কবি এসে বসেছেন নদীতীরে—নির্জনে। আনমনা কবির দেহটিই যেন পড়ে আছে। পাশে

নধর বটগাছ হেলে পড়েছে ভাঙ্গা তীরে। গাছের পাতাগুলি মৃদু বাতাসে কাঁপছে। কবির শ্রুতি এবং দৃষ্টি জুড়ে রয়েছে প্রাকৃতিক শব্দ ও দৃশ্য। চাতকের কাতর ডাক বা অদৃশ্য ডাহুকের অবিশ্রান্ত কুব-কুব ধ্বনি বেজে চলেছে আবহসঙ্গীতের মত। দূরে নদীর বাঁকে চরছে বক, গাভীটি শুয়ে আছে গাছের তলায়—ছায়ায়! একটি হংসীই শুধু ব্যস্তভাবে ডুবে উঠে আহার্যের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে আছে। (এতক্ষণ নদীতে বহু কাজের মানুষ থাকায় সে আহার্য অন্বেষণের অবকাশ পায়নি।) ডিঙ্গিখানা তীরে বেঁধে রেখে বুঝিবা শেষ জেলেটিও ঘরে ফিরে গেল।

এবারে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করল দূরের দুটি পথিক। দূরত্বের কারণে মনে হচ্ছে মেঠো পথ দিয়ে গুটিগুটি অগ্রসর হচ্ছে তারা। কোন এক গৃহবধূ জল নিয়ে বাড়ি ফেরবার পথে হঠাৎ কবিকে দেখে লজ্জায় চমকে উঠে দ্রুতপদে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। চকিত-চমকের মতই সেই ক্ষণ দৃষ্টিতে কবি দেখলেন বধূটির চোখ দুটি ঢলঢল। সম্ভবত কবির মন এর পেছনে এক বেদনাসিক্ত কারণ খুঁজে পেল।

এমনি করে নিঝুম মধ্যাহ্নে আনমনে স্বপ্নজাল রচনা করে চলেছেন কবি! দূর মাঠের দিকে তাকিয়েই আছেন কবি, তাকিয়েই আছেন।

ক্রমেই এলিয়ে পড়ছে কবির হৃদয়। কি যেন স্বপ্নে বুঁজে আসছে কবির চোখ। কি এক অনাস্বাদিতপূর্ব আরামে কবি ক্রমেই আত্মসমাহিত হচ্ছেন—প্রবেশ করছেন এক অলৌকিক ভাব-জগতে। সেখানে কত গান, কত ভাবনা। কবি নিজেই যেন গাইছেন, ভাবছেন, বিরতিতে পড়ছে দীর্ঘশ্বাস। সেই স্বপ্নময় রহস্য-মায়ার দেশে ঝরা পাতার ঘুরে ঘুরে মাটিতে নামার মত ছায়া ছায়া কত ব্যথা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কবির মনে পড়ছে কত গাথা—বেদনার খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত পদ। সেগুলো পূর্ণ কবিতাও নয়, খণ্ড কাব্যও নয়—একটা এলোমেলো কাব্যজগৎ, যেন ক্রমেই স্থির হয়ে আসবার অপেক্ষায় রয়েছে।

এই স্বপ্নাবেশের বর্ণনাতেই 'মধ্যাহ্নে' কবিতাটি শেষ হয়েছে। কবি সত্যই সেই স্থির কাব্যস্বপ্নে প্রবেশ করতে পারলেন কি না তার বর্ণনা কবিতায় নেই।

* * *

এই উত্তরের প্রথম অনুচ্ছেদটি একটি দীর্ঘবাক্যে সমাপ্ত হয়েছে। এতবড় বাক্য লেখা সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে অসুবিধা-জনক। যে অসুবিধা বোধ করবে, সে অতবড় বাক্য লিখবে না। আসলে অনেক অপ্রাসঙ্গিক তথ্য জানাবার আগ্রহে অতবড় বাক্য লেখা হয়েছে। এটা ভাল ছেলেদের কৌশল। যারা অস্বস্তি বোধ করছে, তারা ঐ বাক্যটির বদলে মূল কথাকটি লেখ, 'কবি অক্ষয়কুমার বড়াল 'মধ্যাহ্নে' কবিতায় কোন এক মধ্যাহ্নের নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাবে ক্রমশ আত্ম-সমাহিত হওয়ার অনুভব আন্তরিকভাবে বিবৃত করেছেন'। এরপর অন্য অনুচ্ছেদ-গুলো যোগ করবে।

এবার আর একটি জটিল প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রশ্নটি তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য খুব যে আবশ্যক তা বোধহয় না। মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে ধরনের প্রশ্ন দেওয়া হয় তা পূর্ব সংখ্যাতেই যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। তবু উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে এবং মাধ্যমিকেও নিজের শক্তি বাড়াতে, বিষয়কে অধিকতর অধিগত করতে এসব প্রশ্নের আলোচনা অনাবশ্যক নয়। প্রশ্নটি হল, **এই কবিতা থেকে অক্ষয়কুমারের কবি-কৃতিত্বের কী পরিচয় পাওয়া যায়?**

এ প্রশ্নেরও প্রধান প্রধান আলোচনা আমরা গত সংখ্যা দুটি এবং বর্তমান সংখ্যার পূর্ব অনুচ্ছেদগুলোতে সেরে ফেলেছি। এ প্রশ্নের উত্তর এবার তুমি নিজেই লিখতে পারবে। আমরা তোমাকে সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছি।

প্রথমে তুমি লেখ যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা সাহিত্যের কাব্য জগতে এক নবরীতির কাব্য রচনা শুরু হয়। এর প্রবর্তক হিসাবে বিহারীলাল চক্রবর্তীর নাম বল। অক্ষয়কুমার, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি কবির কাব্যচর্চার ফলে এই রীতি পরবর্তী-কালে বাঙলা কাব্যধারার অন্যতম প্রধান ধারায় পরিণত হয়। আলোচ্য কবিতায় কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের সেই রোমাণ্টিক গীতি কবিতা রচনার বিশিষ্টতাই ফুটে উঠেছে।

প্রথম অনুচ্ছেদে এইসব বক্তব্য দিয়ে ভূমিকা রচনা করে, পরবর্তী অনুচ্ছেদে তুমি এ জাতীয় কবিতায় কি কি করা হয়, আর কি করা হয় না, তার বর্ণনা দাও। এ ব্যাপারে আজকের আলোচনার প্রথম পাঁচ অনুচ্ছেদের তলায় ১, ২ ইত্যাদি সংখ্যা সাজিয়ে যে সব তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে তার মধ্যে ২ ও ৩ সংখ্যক তথ্য কাজে লাগাও।

এবার কবি ব্যক্তি-জীবনের কর্মব্যস্ততাকে ভুলে কেমন করে তিল তিল করে প্রকৃতির সান্নিধ্যে আত্মভাবতন্ময়তায় নিমজ্জিত হতে চাইছেন, তার স্তরগুলি এক এক করে বল। কবির অকপট ভাষা, প্রকাশের আন্তরিকতা, সূক্ষ্ম ও মরমী অনুভূতি এবং বিশ্বব্যাপী এক বেদনার সুরকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করবার ব্যাকুলতা এ কবিতার বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখাও।

লক্ষ্য করে দেখ, কবির দৃষ্টিতেই বেদনা। আগাগোড়া কবিতাতে কবি যে সব শব্দ ও দৃশ্য বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর তলাতেও ছেঁড়া ছেঁড়া বেদনা ও না-পাওয়ার যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। তারটি ভাঙ্গা, পাতাগুলোর কাঁপা (কাঁপে ভয়ে বা উত্তেজনায়), গাভীটিও একা একা শুয়ে। যে জেলে নৌকা বেঁধে বাড়ি যায়, সেও নিঃসঙ্গ। দূরে বক চরছে বা হংসী ডুবে উঠে আহার্য সন্ধান করে চলেছে এই দুপুরের ক্লান্তিকর রৌদ্রতাপে—এর পেছনেও রয়েছে না-পাওয়ার বেদনা। আর যে কুবো বা চাতক অবিরত ডেকেই চলেছে, সে কি পাওয়ার আনন্দে? নিশ্চয়ই না। কুলবধূর চোখ কেন ঢলঢল? আসলে এক কুলবধূর ছবির ভেতর দিয়ে কবির মনে বাঙলাদেশের সব বধূর বেদনা জেগে উঠেছে। এইসব বেদনাই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে কবির অবচেতন মনে। অর্ধ-তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে কবি তাই অনুভব করেছেন 'ছায়া ছায়া কত ব্যথা ঘুরে ধরাধামে'।

কোন কোন নোটবইতে কবিতাটির অংশগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব প্রমাণ করা হয়েছে। কিন্তু তুমি দেখেছ ত, কবিতাটিতে কিভাবে সামগ্রিক ঐক্য রক্ষিত হয়েছে!

এইসব কথা লিখলেই এই প্রশ্নের উত্তর সমাপ্ত হবে। তবু যারা আরও ভাল ভাবে প্রস্তুত হতে চাও, তারা নিচের উদ্ধৃতিটি যোগ করতে চেষ্টা করবে।

ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়-কুমারের প্রতিভা সম্পর্কে বলেছেন: "তিনি বাস্তব জীবনকে সম্পূর্ণরূপে উহ্য রাখিয়া কীটসের 'এ্যাণ্ডি মিয়নের' মত অধরা অনন্তের মধ্যে রোমাণ্টিক নায়িকার সন্ধান করিয়াছেন। প্রাত্যহিক জীবনকে উপলব্ধি করিয়া তাহার মধ্যে উৎকৃষ্ট রোমান্স সৃষ্টি করিবার দুর্লভ যাদুশক্তি তাঁহার ছিল না। তাই তিনি গতানুগতিক রোমাণ্টিক পন্থা ধরিয়া বাস্তবাতিচারী কল্পনানলে ক্ষুব্ধবয়ন

করিয়াছেন। ফলে তাঁহার প্রেম ও সৌন্দর্যের কল্পনা বাঁধা জগতের হাহাকার বিষণ্ণতা প্রভৃতি চিরাচরিত রোমান্টিক পন্থা অনুসরণ করিয়াছে…।"

এই কবিতাটির শেষেও এমনই হাহাকার। তবু কবির গভীর আন্তরিকতায় কবিতাটি সজীব ও প্রাণস্পর্শী।

আগামী সংখ্যায় পরবর্তী কবিতা শুরু হবে।

প্রাগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ কথা

তোমাদের মনে হতে পারে হিসাব-নবীশ অক্ষয়কুমার বড়াল কিভাবে মধ্যাহ্নের অলস-মন্থরতায় গা ভাসিয়ে বিশ্ববেদনার না-বোঝা বাণীকে ধরবার মানসিকতা অর্জন করলেন? এই ব্যাপারটি বুঝতে গেলে তোমাদের কিছু গভীর কথা বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। তোমাদের বুঝতে হবে, একজন ব্যক্তি সাহিত্য-শিল্প সৃষ্টি করেন কেন এবং কেনই বা আমরা সাহিত্য-শিল্প পাঠ ও দর্শনে আনন্দ লাভ করি। তোমরা ত সকলেই জান যে আমাদের জীবনটা মূলত কাজের। মানুষ কাজ করে, উৎপাদন করে, উপার্জন করে, খায় এবং বেঁচে থাকতে গেলে আরও কিছু কিছু অবশ্য-প্রয়োজনীয় কাজ মানুষকে করতে হয়। কিন্তু মানুষ ত শুধুই জীব নয়, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণী। তাই মানুষ প্রয়োজনের জগতেই শুধু তৃপ্তি পায় না। কেজো পৃথিবীর বাইরে সে তার একঘেয়েমির ক্লান্তি অপনোদন করতে চায়। তাই সে সৃষ্টি করে শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির নব নব দিগন্ত। বাঁচবার জন্য একঘেয়ে কর্তব্য-কর্ম ত করতেই হবে। কিন্তু মানুষের মুক্তির জগৎ হচ্ছে তার অপ্রয়োজনের আনন্দের জগৎ—যা মানুষকে কেজো জগৎ থেকে উত্তীর্ণ করেছে প্রকৃত মানবধর্মে। 'মধ্যাহ্নে' কবিতার কবি অক্ষয়কুমারের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটিই ঘটেছিল। অক্ষয়কুমারের একঘেয়ে হিসাব-নিকাশের কর্মজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ক্লান্তি। তোমরা হয়ত অনেকেই জান যে, কর্মজীবনে তিনি প্রথমে দিল্লি এ্যাণ্ড লণ্ডন ব্যাঙ্ক, পরে নর্থ ব্রিটিশ লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে চাকরী করেন। সারা জীবন হিসাব-নিকাশের কাজ তাঁর ভাল লাগেনি। এই জগৎ থেকে তিনি মুক্তি খুঁজতেন। বস্তুত কাব্যের জগতের মধ্যেই তিনি নিজের আত্মাকে মুক্তি দিতেন। 'মধ্যাহ্নে' কবিতাতেও এটাই ঘটেছে। তাই 'মধ্যাহ্নে' কবিতার পরিমণ্ডলে কোথাও কোন ব্যস্ততা নেই, কাজের জগতের কোন হাঁকডাক নেই ('মধ্যাহ্নে' কবিতায় শেষ জেলেটিও বাড়ি ফিরে গেছে), প্রয়োজন বা স্বার্থের কোন সংঘাত নেই। চারদিকে প্রশান্তি। একাকী কবি মগ্ন-বিষাদে নিমজ্জমান। এখানেই যেন কবির মন ও আত্মা মুক্তি পেয়েছে।

অভীশ দেব

গত সংখ্যায় তোমাদের যে চারটি অনুচ্ছেদ অনুবাদ করতে দেওয়া হয়েছিল, প্রথমেই তাদের অনুবাদ মিলিয়ে নাও। আমরা যে বাক্যগুলো দিচ্ছি, হুবহু তার সঙ্গে মিলবার দরকার নেই, ঐ ভাব-প্রকাশক বাক্য হলেই চলবে।

(1)

সে খবরের কাগজ পড়ছিল। আমাকে সেখানে যেতে হবে। সূর্য অস্ত গেল। সূর্য অস্তমিত।। এমনটা কি হয়? (এও কি সম্ভব!)। আমি নতুন তারাটি দেখিনি। আমাদের একটি ক্রিকেট ম্যাচ (খেলা) ছিল। কাজটা এখুনি করে ফেল। যেমন বললাম, তেমন ভাবে কর। আমি দেখতে চাই যে সে শাস্তি পেয়েছে। কঠোর পরিশ্রম কর তাহলেই উত্তীর্ণ হবে।

(2)

খবরটায় এত খুশী হয়েছিলাম যে আমি আনন্দে প্রায় নেচে উঠেছিলাম। সে কাজটা করতে সাহস পায়নি। সে আমাকে বলেছিল যে তার আর কাজটি করবার দরকার নেই। তোমার সেখানে যাওয়া উচিত।

(3)

তুমি অবশ্যই বাড়ি যাবে (তুমি বাড়ি যাবেই)। সে কি উপস্থিত ছিল? (সে কি হাজির হয়েছিল? এসেছিল?) তুমি জিনিসটা কাল পাবে। ছেলেটিকে বেতান উচিত (দরকার) / ছেলেটিকে চাবকান উচিত। অনুগ্রহ করে বইটি আমাকে পাঠাবেন কি? ঘর ছেড়ে যাবে না।

(4)

(পাঁতি) হাঁসগুলো সাঁতরাচ্ছিল সাঁতার কাটছিল)। মেয়েটি সত্যি কথাই বলেছে। আমাকে কি চাকরিটি দেবেন? (দিয়ে বাধিত করবেন)। আমি আপনার কাছে চির-ঋণী থাকব। এ প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না (আমি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না।) অন্ধজনে ঘৃণা (তাচ্ছিল্য) কর না।

আজকের পাঠ

বাঙলায় অব্যয়পদগুলো নানারকম অর্থ সৃষ্টি করে। কোথাও বা অর্থশূন্যভাবেও অব্যয় ব্যবহার করা হয়। ইংরাজীতেও এ-জাতীয় শব্দ প্রয়োগ হয়। এরা সমগ্র বাক্যের অর্থকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। It, but, also, else, even, indeed, just, only, very ইত্যাদি শব্দ যেখানেই থাকবে, সেখানে বিশেষ নজর দিয়ে বাক্যের ভাবটি বুঝে নেবে, তারপর অনুবাদ বাক্য রচনা করবে। নিচের উদাহরণগুলো দেখ—

(IT)

1. Who was it that you saw?—তুমি যাঁকে দেখেছিলে, তিনি কে? তুমি কাকে দেখেছিলে?

2. It is Ram that say so. —কেবল রামই একথা বলছে।

3. How far is it to your house?—তোমার বাড়ি কত দূর?

4. I was, as it were, thunder-struck at the news. —সংবাদটা শুনে আমি বজ্রাহত হলাম।

5. It is the men who work hardest, not the women.—পুরুষেরাই কঠোর পরিশ্রম করে, মেয়েরা নয়।

6. It was this boy who

raised row.—এই ছেলেটিই গোলযোগ শুরু করেছিল।

(BUT)

1. I can but say it.—আমি শুধু বলতেই পারি।

2. I can not but say it.—আমি না বলে থাকতে পারছি না।

3. Who could have done this but him.—সে ছাড়া আর কে একাজ করতে পারত ?

(TOO)

1. He is too young for this work.—সে এত ছোট যে এ কাজের অনুপযুক্ত। (সে এ কাজের পক্ষে বড়ই ছোট।)

2. You too are here ?—তুমিও এখানে ?

3. He is too week to sit up.—সে এত দুর্বল যে (সোজা হয়ে) বসতে পারে না।

এই বাক্যগুলো বারবার পড়ে but, too, it জাতীয় শব্দের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য বুঝে নাও। তারপর নিচের অনুচ্ছেদগুলোর বাঙলা অনুবাদ কর। (এবারে it দিয়ে দুটি অনুচ্ছেদ দিলাম)।

(IT)

1. It is more blessed to give than to receive. It was very kind of you to come to see us. It was the English, Kaspar cried, who put the French to rout. If it is fine in the afternoon, we shall go for a walk.

2. What an ass it is ! It is probable that the day will be fine. It is six weeks since I saw you last. If the day is fine, it will be pleasant for our journey. There is no other course for it but to submit. It is too late to go. It is all over with him. It is little things that chiefly disturb the mind. It is probable that rain will fall to-day.

ভাবসম্প্রসারণ

গত কয়েক সংখ্যায়, বিশেষ করে গত সংখ্যায় আমরা তোমাদের দেখিয়েছি যে বহু উদ্ধৃতিকে সম্প্রসারিত করলে অনেক সময় একই বক্তব্য পাওয়া যায়। এবারেও আমরা তেমনই আরও কয়েকটি ভাবোদ্ধৃতি নিয়ে আলোচনা করব। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখবে, মূলগুলো আপাতভাবে পৃথক। ভালভাবে বিচার করলে, তবেই তাদের মধ্যে সমতা খুঁজে পাবে। এগুলো প্রায় এক।

(এক)

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন পশ্চাতে।

সাধারণ অর্থ ঃ যিনি উত্তম তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে অধম ব্যক্তির সঙ্গে চলতে পারেন। কিন্তু যিনি মধ্যম তিনি চলেন পিছনে পিছনে।

আলোচনা ঃ তাহলে দেখা যাচ্ছে লেখক কবি বক্তা এখানে সকল মানুষকে তিনটি দলে ভাগ করেছেন—১. উত্তম, মধ্যম, ৩. অধম।

তিনি বলছেন যে, উত্তম ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে অধমের সঙ্গে চলতে পারে কিন্তু মধ্যম ব্যক্তি চলতে পারে না। সে চলে পিছনে পিছনে- দূরত্ব বজায় রেখে।

কিন্তু কেন ?

এই কারণ বর্ণনা করাই এই ভাব-সম্প্রসারণের প্রধান কথা। কিন্তু কারণ কি ? কেনই বা উত্তম ব্যক্তি নিশ্চিন্তে অধমের সঙ্গে চলতে পারেন ? কেনই বা মধ্যমরা পারে না ?

একটু ভাবলেই বুঝবে যে, যিনি উত্তম তাঁর চরিত্র দৃঢ় এবং উদার। তিনি সকলকে সহানুভূতি দিয়ে দেখেন, মানবিক মূল্যে বিচার করেন। তাই সকলের সঙ্গেই তিনি মিশতে পারেন। তাঁর চরিত্রও দৃঢ়। তাই কারও সঙ্গে মিশলে তাঁর অধঃপতন হবে, এমন সম্ভাবনা নেই। এ কারণেও তিনি সকলের সঙ্গে মিশতে পারেন।

অধমের পক্ষেও মিশবার বাধা নেই। সে ত খারাপ আছেই। অতএব সঙ্গদোষে নয় সঙ্গ গুণে তার উন্নতি বই অবনতি হবে না।

কিন্তু মধ্যম ব্যক্তির অবস্থাটা কি ? তিনি সর্বদাই সচেতন যে তিনি উত্তমের মত মহৎও নন, অধমের মত হীনও তিনি নন। অধম হওয়ার মত লজ্জা-ঘৃণা-ভয় ছাড়া মন নয় তার, আবার উত্তম হওয়ার মত অত শক্তিও তার নেই। সে উত্তমের কাছে গেলেই নিজের হীনতা বুঝতে পারে, আবার অধমের কাছে গেলেই বুঝতে পারে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। যে হীনতাবোধ থেকে সে উত্তমের সঙ্গে মিশতে পারে না, ঠিক তার বিপরীতে অন্যেকে হীন ভেবে সে অধমের সঙ্গেও মিশতে পারে না। তাই তার এত বাছাবাছির পাট। বোঝা গেল। এবার তাহলে ভাব-সম্প্রসারণটা লিখে ফেলা যাক।

প্রথম উত্তর

সমাজে সব মানুষই সমান নন। কেউ ভাল, কেউ মন্দ, কেউ বা দুই-এর মাঝামাঝি —মধ্যম। আচরণের মধ্য দিয়েই মানুষ কোন শ্রেণীভুক্ত তা বোঝা যায়।

যারা উত্তম শ্রেণীর মানুষ, তাদের মন ও চরিত্র পবিত্র। পরশমণির মত তিনি যারই সংস্পর্শে আসুন না কেন, তাঁর নিজের কোন ক্ষতি বা পরিবর্তন হয় না। তাঁর সংস্পর্শে লোহার মত নিকৃষ্ট অনেক মানুষ সোনার মত উৎকৃষ্ট হয়ে ওঠেন। তাই এই শ্রেণীর মানুষ কাকেও ঘৃণা করে, না, অবজ্ঞা করেন না—সকলকে সমানভাবে বরণ করতে পারেন। তাঁদের মনের দৃঢ়তাই তাঁদের মনকে পবিত্র রাখে। অধার্মিক বা খারাপ মানুষও নির্ভয়। যে মানুষ নিঃস্ব, উলঙ্গ, তাঁর আবার চোরের কি ভয় ? চোর কি চুরি করবে ? অতএব তাঁরাও সকলকে সমানভাবে গ্রহণ করতে পারেন। তাঁদের হারাবার ভয় নেই, বরং লাভের সম্ভাবনাই প্রবল।

যত বিপদ মাঝারি বা মধ্যম শ্রেণীভুক্ত মানুষদের। তাঁরা উত্তমের পাশেও যেতে পারেন না, পাছে উত্তমের সঙ্গে তুলনায় তাঁদের দীনতা ধরা পড়ে। আবার যারা অধম, তাদের সঙ্গে মিশতেও তাঁদের ভয়। পাছে সঙ্গ দোষে তাঁর যেটুকু মহত্ব আছে সেটুকুও নষ্ট হয়। এই দলের মানুষের মনে সর্বদাই সংশয়, সন্দেহ, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব। সকলের কাছাকাছি থেকেও এঁরা স্বতন্ত্র। তাঁরা অন্ত্যজদের সঙ্গে একেবারে নেমে আসতে পারেন না, আবার উচ্চমানের মানুষের মত উঁচুতে উঠবার ক্ষমতাও তাঁদের নেই।

দ্বিতীয় উত্তর

যে একা সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ।

ঐক্যই সমস্ত শক্তির আধার। অনৈক্যই ধ্বংস।

এই পৃথিবীর সমস্ত শক্তির উৎসই সমষ্টি। এখানে টিকে থাকার মন্ত্রই ঐক্য।

একক বস্তু নিজে যত শক্তিমানই হোক, সে অপরের সঙ্গে সম্মিলিত হতে না পারলে তার ধ্বংস অনিবার্য।

একসময়ে জীবজগতে বিশালকায় সব জন্তুর জন্ম হয়েছিল। কিন্তু বিধাতা তাদের সম্মিলিত হবার শক্তি দেননি। তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরত। আজও ক্ষুদ্র পিপীলিকারা কোটি কোটি বছর বেঁচে আছে, কিন্তু ঐ অতিকায়েরা নেই। লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র প্রবাল কীট কিভাবে এক একটি দ্বীপপুঞ্জ গড়ে তোলে—এই হল ঐক্য শক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত।

জাতীয় জীবনেও একথা পরম সত্য। ঐক্যের অভাবের জন্যই ভারতবর্ষ বারবার বিদেশী আক্রমণ সহ্য করেছে ও বিদেশীর পদানত হয়েছে। শিবাজীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ মারাঠা শক্তি ঔরংজীবকেও কাঁপিয়ে তুলেছিল। রাশিয়ার সাধারণ কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে শক্তিমান 'জার'কে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। এ সমস্ত তথ্য ঐ এক সত্যেরই প্রকাশ মাত্র।

এ ভাব-সম্প্রসারণটা যদি বুঝে থাক, তবে নিচের ভাবোদ্ধৃতিগুলোকে সম্প্রসারিত কর তুমি :

(এক)

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম গোত্রহীন।
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।।
ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই।
সূর্য উঠি বলে তারে,
ভালো আছ ভাই।।'

(দুই)

কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন শিখা বলে—
'এস মোর দাদা।'

প্রবন্ধরচনা

আমরা ইতঃমধ্যে তোমাদের বেশ কয়েকটি জীবনী রচনার অনুশীলন করিয়েছি। এবার আর সরাসরি কোন জীবনী রচনায় প্রবৃত্ত হবার দরকার নেই। অনেক সময় 'জীবনী'কেই একটু ভিন্ন আকারে লিখতে দেওয়া হয়। আর পরীক্ষকদের এ জাতীয় প্রবন্ধ রচনা করতে দেবার ঝোঁকই বেশি।

উদাহরণ নেওয়া যাক। আমরা ইতঃপূর্বে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছি। কিন্তু সরাসরি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখতে না বলে যদি বলা হয় **'বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ কবি'** এই শিরোনামে প্রবন্ধ রচনা করতে গেলে কিন্তু সরাসরি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখলে বা কোনক্রমে সামনে 'বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ', কথাটুকু যোগ করে দিলে তোমার কাজ মিটবে না। কারণ, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি বহু। হোমার, ভার্জিল, দান্তে ইত্যাদির কথা যদি বাদই দাও, বাল্মীকি, কালিদাস ইত্যাদির দাবীও কম নয়। এদের সকলকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে তুমি কেন গ্রহণ করলে, তার কথা একটু তোমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। অর্থাৎ একথা বলাই হবে এই প্রবন্ধের 'ভূমিকা'। এবং সমগ্র প্রবন্ধে শুধু রবীন্দ্রনাথ কত সালে কি করেছিলেন, তা না বলে, কেন তাকে সত্যই 'বিশ্বের কবি' এবং 'শ্রেষ্ঠ কবি' বলা যায়, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।

যে শিক্ষার্থী উত্তরপত্রে এই বুদ্ধির পরিচয় দেবে সে কুড়ির ভেতর ১৫/১৬-ও পেতে পারে। আর যে শিক্ষার্থী কোন ভাবনা-চিন্তা না করে সোজা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখে আসবে, সে পরীক্ষকের

করুণার ওপর ৪ থেকে ৬-এর মধ্যে একটা কিছু নম্বর পাবে। অতএব, মুখস্থ বা প্রস্তুত থাকলেই লিখ না, একটু ভেবে নাও, যা শিরোনাম আছে, তার সঙ্গে তোমার প্রস্তুত প্রবন্ধটি কতখানি খাপ খাচ্ছে!

এবার তাহলে দেখা যাক, ওপরের শিরোনামের রচনাটিতে ভূমিকা অংশে কি জাতীয় তথ্য পরিবেশন করা যেতে পারে। আমরা একটি উদাহরণ দিচ্ছি। (আবার বলি, এটিই চূড়ান্ত নয়। আরও অনেক রকমভাবে ভূমিকা লেখা যেতে পারে। তোমরা নিজেরাও চেষ্টা করলে লিখতে পারবে।)

ভূমিকা

দেশে দেশে কালে কালে কত কবিই না আপন অনুভূতির বাণীরূপ রচনা করে চলেছেন কবিতায়। তাঁদের কারও কারও কবিতা দেশ কালের গণ্ডিকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবের দরবারে চিরকালের জন্য আসন তৈরি করে নেয়। এঁরা শুধু শ্রেষ্ঠ কবি নন, বিশ্বকবিও বটেন।

করাঙ্ক গণনা করলে এমন শ্রেষ্ঠ কবি ও বিশ্বকবির সংখ্যাও কম নয়। মনে পড়ে হোমার, ভার্জিল, দান্তে, চশার ইত্যাদি ইউরোপীয় কবিদের কথা, বলা যায় বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাসের কথা। এঁরা সকলেই দেশ ও কালের ব্যবধানকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবের হৃদয়তটে আপন আপন নির্দিষ্ট আসন তৈরি করে নিয়েছেন। কিন্তু এঁদের চাইতেও আমাদের প্রিয় হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। এই বিশ্বকবি যে শুধু এই কালের মানুষ, এই নয়—বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনায় এতখানি তৎপরতা আমরা অন্য কোন বিশ্বকবির মাঝে দেখিনি—আর আমাদের কালের এত কাছেও নেই অন্য কোন বিশ্বকবি। আমরা যে আজও তাঁরই বায়ু পরিমণ্ডলে বাস করছি। তাই বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ কবি বলতে আমাদের মনে প্রথম যার ছবি ভেসে ওঠে, তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* *

এই ভূমিকার পরে 'রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কে যা লিখবে সেই অংশ যোগ করলে **বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ কবি** রচনাটি যথাযথ হবে। তবে তার উপসংহার অংশেও কৌশলে 'বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ কবি এত সালের এত তারিখে তিরোধান করেন। সমস্ত বিশ্ব দিনে দিনে তাঁর ভাব ও ভাবনাকে আত্মস্থ করে নব নব আবিষ্কারের আনন্দে তন্ময় হচ্ছে' জাতীয় কিছু লিখে শিরোনামার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া দরকার।

আশা করি, এই রূপান্তরের কৌশল তোমরা বুঝেছ। যদি বুঝে থাক, তবে সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে প্রবন্ধটি তুমি সূত্রানুসারে লিখেছ, তাকে **'একজন বিশ্বখ্যাত বাঙালী বৈজ্ঞানিক'** শিরোনামে রূপান্তরিত কর।

* * *

এই রূপান্তরের আরও রকম-ফের হতে পারে। লক্ষ্য কর যদি **'তোমার প্রিয় কবি'** শিরোমামে একটি প্রবন্ধ তোমাকে লিখতে দেওয়া হয়, তাহলেও তুমি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত প্রবন্ধটিকে কাজে লাগাতে পার। কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমাকে প্রথমেই প্রমাণ করতে হবে যে রবীন্দ্রনাথই তোমার প্রিয় কবি এবং তারপর রবীন্দ্রনাথের কবি-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।

এই নির্দেশ মেনে নিয়ে কেউ যদি লেখ, 'রবীন্দ্রনাথই আমার প্রিয় কবি।' এবং তারপর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দেয়—তবে কিন্তু সে প্রবন্ধে বেশি নম্বর পাবে না। ভাল লাগবার কারণ দিয়ে অবশ্যই ব্যাপারটিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। [নিচে আমরা যে প্রবন্ধ

আলোচনা করেছি, সেটি পড়ে, রবীন্দ্রনাথকে প্রিয় কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে নিজে একটি প্রবন্ধ লিখবে।

এখন, এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকেই যে তোমার প্রিয় কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এমন নয়। তুমি সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, জীবনানন্দ এমন কি আধুনিক কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়কেও তোমার প্রিয় কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পার। কিন্তু মনে রাখবে তাঁর জীবন ও কাব্য আলোচনা করে কোন কোন কারণে তাঁকে প্রিয় মনে হয়, তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিচে আমরা সুকান্ত ভট্টাচার্যকে প্রিয় কবি হিসাবে গ্রহণ করে একটি প্রবন্ধ দিলাম। প্রবন্ধটিতে সুকান্তের 'জীবনী' সম্পর্কে কিছু কম বলা আছে। ওটুকুর সংকেত দেওয়া থাকল। তোমরা যোগ করে নিও।

'তোমার প্রিয় কবি'

৩০ শ্রাবণ, ১৩৩৩ সালে কলকাতার কালীঘাটে জন্ম—মামাবাড়িতে। বাবা নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য। মা সুনীতি দেবী। সুনীতি দেবীর দ্বিতীয় পুত্র সুকান্ত। ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষাকালে মাতৃহারা ......ছন্নছাড়া জীবন। অনর্গল লেখা এবং প্রচুর পড়া...... দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধেরকালে মাকর্সবাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে...দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সেবায় আত্মনিয়োগ......অসুস্থতা......১৯৪৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন......স্বাধীনতা পত্রিকার কিশোর সভা পরিচালনা......১৯৪৬ সালে আরও অসুস্থতা......১৩৫৪ সালের ২৯ বৈশাখ অকাল মৃত্যু।

যা শ্রেষ্ঠ তা যে সকলেরই প্রিয় হবে এমন কিছু বাঁধাধরা কথা নেই। রসগোল্লা নিশ্চয় ভাল। কিন্তু নিমপাতা ভাজা কারও প্রিয় খাদ্য হতে পারে। কেন না যা শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে আদর্শের যোগ, কিন্তু যা প্রিয় তার সঙ্গে যোগ রুচির। আমার রুচি আদর্শের বিচারে খারাপ হতে পারে। কিন্তু তবু তা-ই আমার কাছে প্রিয়। এই কথাগুলো আমি, আমার প্রিয় কবি সম্পর্কে আলোচনার ভূমিকা হিসেবে বলতে চাই।

বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ। বাঙলা সাহিত্যকে তিনি সমস্ত বিশ্বের সম্মুখে এক কৌতূহল ও আগ্রহের সামগ্রীরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ছন্দের নানা বৈচিত্র্যে এমন কি ছন্দের বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষাতেও তাঁর কাব্য অতুলনীয়। তাঁর ভাষা, ভাব, অলঙ্কার ত্রুটিহীন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসম্ভার যেন তাজমহলের মতই বিশাল, উদার, আশ্চর্য, কারুকার্যময় অথচ মহৎ আবেগে বিধৌত। ঠিক কারণেই রবীন্দ্রকাব্যকে যেন দূর থেকে প্রশংসা করতে পারি, দেখে মন খুশি করতে পারি, পড়ে কানকে তৃপ্ত করতে পারি—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়ে

আমার মনে হয় না যে, ঠিক আমারই ভাব, আমারই বক্তব্য কবির কলমে ধরা পড়েছে।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা পড়লে আমার মনে সন্দেহ থাকে না যে ঐ লেখা কবির নয়—আমারই ভাব, ভাষা নিয়ে কবি যেন বাণীরূপ দিয়েছেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যই আমার প্রিয় কবি।

আমাদের যুগের যে দুঃখ বেদনা এবং অভিশাপ—কবি সুকান্তেরও তাই। তাই কবি সুকান্তের মত আমার মন প্রশ্ন করেঃ

বলতে পারো বড় মানুষ মোটর
কেন চড়বে
গরীব কেন সেই মোটরের তলায়
চাপা পড়বে ?

এই যে গরীব বড়লোকের ভাগ করা দুনিয়া, তাতে আমরা যেন সেই মোরগটি, যে খাদের লোভে বড়লোকের বাড়ি গিয়ে নিজেই খাদ্য হয়ে গেল।

এই অনিয়ম ও অনাচারের বিরুদ্ধে আমাদের মন ফুঁসে উঠতে চায়। কবির সিগারেট আর দেশলাই কাঠিতে সেই অভিলাষ।

তোমাদের আরাম! আমাদের মৃত্যু।
এমনি করে চলবে আর কতকাল
আর কতকাল আমরা এমন নিঃশব্দে ডাকব
আধু হননকারী তিল তিল অপঘাতকে ?

নিঃশব্দে হঠাৎ জ্বলে উঠে
বাড়িশুদ্ধ পুড়িয়ে মারব তোমাদের।
যেমন করে তোমরা আমাদের পুড়িয়ে
মেরেছ এতকাল। (সিগারেট)

আমরা বারবার জ্বলি, নিতান্ত অবহেলায়—
তা ত তোমরা জানোই!
কিন্তু তোমরা ত জান না।—
কবে আমরা জ্বলে উঠব—
সবাই শেষবারের মত। (দেশলাই কাঠি)

চারদিকে দারিদ্র্য। শিক্ষিত বেকারের ছড়াছড়ি। কোথাও আমাদের সম্মানের বিন্দুমাত্র অবশেষ নেই। আমাদের মনও তাই বলতে চায়—এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,

অবাক পৃথিবী, সেলাম তোমায় সেলাম।
আর তাইত আমরা কান পেতে থাকি—
বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি
এস তবে আজ বিদ্রোহ করি!

কিন্তু কবি সুকান্তের মধ্যে যে প্রবল উন্মাদনা ছিল অনিয়ম অবিচারকে ভাঙ্গবার—তা কিন্তু আমার নেই। নেই তাই সুকান্তের কবিতা আবৃত্তি করে যেন সেই জ্বালা মিটিয়ে নিই।

সুকান্ত ভট্টাচার্যকে বিচার করতে বসে অনেকে বলেন, তিনি নাকি এক বিশেষ রাজনৈতিক দলের সাহিত্যশিল্পী। তাই তাঁর কবিতা শুধুমাত্রই শ্লোগান। রাজনৈতিক বক্তৃতা মাত্র। একথা সর্বৈব সত্য বলে মনে হয় না। প্রথমত সুকান্ত ভট্টাচার্য মারা যান মাত্র একুশ বছর বয়সে। বয়সটা আবেগ সর্বস্বতারই। একালের ছেলেই বলতে পারে—

প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙ্গেছিস ঘরবাড়ি,
সেকথা কি আমি জীবনে মরণে কখনো
ভুলিতে পারি ?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি
কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা
আমি তুলবই।

কিন্তু তাই বলে কবি কল্পনার মহত্বের পূর্বাভাষ কি তার রচনায় পাই না ? সেখানে কবি বলেন,

আর মনে করো আকাশে আছে
এক ধ্রুব নক্ষত্র,
নদীর ধারায় আছে গতির নির্দেশ,
অরণ্যের মর্মরধ্বনিতে আছে আন্দোলনের
ভাষা
আর আছে পৃথিবীর চিরকালের আবর্তন।

তখন কি মনে হয় না যে কিশোর

কবি তার বালকত্বের বেনো জল পার হয়ে আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়ভূমিতে পৌঁছে গিয়েছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য মৃত্যু কবিকে তাঁর চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছতে দিল না। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা যেন এই কারণে এক অশেষ অপরিতৃপ্তিতে মন ভরিয়ে রাখে। যা আছে তার ভেতর হলেই কি হতে পারত তার আভাস টেনে বার করতে মন ছোটে।

মোটকথা, কবি সুকান্ত আর কাকে কি দিয়েছেন জানি না, তবে আমার মত অক্ষম, অপদার্থ মানুষকে দিয়েছে, মনকে শান্ত করবার উপায়। মনের কোণায় যখন নানা কারণে উত্তাপ জমে ওঠে, সুকান্তের কাব্য পাঠের মধ্য দিয়ে যেন তার উত্তাপ বের হয়ে যায়। মন অপরিসীম শান্তিতে স্নিগ্ধ হয়। তাই সুকান্ত শুধু আমার প্রিয় কবি নন—প্রিয়তম কবি।

পদ্য সহায়ক পাঠ

কথা ও কাহিনী ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্যপ্রাপ্তি

কথা ও কাহিনী থেকে তৃতীয় যে কবিতাটি তোমাকে নবম শ্রেণীতে পড়তে হবে, তার নাম 'মূল্যপ্রাপ্তি'। এ কবিতাটি তোমার মুখস্থ করা দরকার। এ কবিতা থেকে তোমাকে অংশ বিশেষ মুখস্থ করতে বলা হতে পারে।

পাঠ শুরুর আগে জেনে নাও, **এ কবিতার 'কথা' রবীন্দ্রনাথ কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন?** এই প্রশ্নের উত্তর। দেখ, মূল গ্রন্থে উপ-শিরোনামে লেখা আছে 'অবদানশতক'। অর্থাৎ **রবীন্দ্রনাথ 'মূল্যপ্রাপ্তি' নামক কবিতাটির মূল কথাবস্তু পেয়েছেন 'অবদানশতক' নামক গ্রন্থ থেকে।**

কোন পরীক্ষক তোমাকে ঠকাবার মত প্রশ্ন করতে পারেন। তিনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, কবিতাটি কবে রচিত হয়েছে বলতে পার

আকাশ-পাতাল ভাববার দরকার নেই। জেনো, যা তোমার পক্ষে জানা সম্ভব, এমন প্রশ্নই তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। অর্থাৎ এ প্রশ্নের উত্তরটা তোমার হাতের কাছেই আছে। কবিতাটির শেষে দেখ, একটা তারিখ দেওয়া আছে। ঐ তারিখেই কবিতাটি রচিত হয়েছিল। তাহলে তোমার উত্তর হল, **কবিতাটি ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ২৬ আশ্বিন রচিত হয়েছিল।**

এবার কবিতাটির বিষয়বস্তু এবং পাঠের দিকে নজর দেওয়া যাক। লক্ষ্য কর কবিতাটিতে মোট তিনটি স্তবক আছে। প্রথম দুই স্তবকে আছে ষোল চরণ করে আর শেষ স্তবকে আছে মাত্র বার চরণ।

এই কবিতাটি লিখবার ধরন লক্ষ্য করেছ কি? অবশ্য এর আগে পড়া প্রতিনিধি কবিতাটিও এই একই রীতিতে লেখা। একে বলে ত্রিপদী। লক্ষ্য কর, প্রত্যেক চরণে যেন তিনটি অংশ, এই জন্যই একে বলে ত্রিপদী।

প্রথম স্তবকে কবি ঘটনার এক নাটকীয় মুহূর্ত গড়ে শেষ করেছেন।

অঘ্রাণ মাস। শীতকাল। শিশিরের নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করতে না পেরে পদ্মগুলো মরে গেছে। সুদাম মালীর বাগানের ধারের সরোবরে ঐ আবহাওয়াতেও কেমন করে একটি পদ্ম ফুটেছিল।

সুদাম সেটি তুলে নিয়ে বিক্রি করবার জন্য গেল রাজপ্রাসাদের সামনে। রাজার

দর্শনের আশায় সে দাঁড়িয়ে রইল। এমন সময় সেই ফুল দেখে আনন্দে আকুল হয়ে এক পথিক এসে বলল, তোমার এই অকালের পদ্ম আমি কিনব। এর কত দাম নেবে? ভগবান বুদ্ধ আজ এই পুরীতে এসেছেন। এটি আমি তাঁর পায়ে উপহার দেব।

মালী বলল, মশাই আমার মনের বাসনা এই যে, এই ফুলের বদলে আমি এক স্বর্ণমাষা পাব। পথিক এক মাষাই দিতে চাইল। কিন্তু তাদের লেনদেন চুকবার আগেই মহাসমারোহে স্বয়ং নৃপতি বেরিয়ে এলেন।

আমরা আগেই বলেছি এক নাটকীয় মুহূর্তে কবিতাটির প্রথম স্তবক শেষ হয়েছে। রাজদর্শন চেয়ে সুদাম যদি রাজার জন্য অপেক্ষাই করত এবং পথিককে যদি দাম না বলত, তবে কোন দ্বন্দ্বের সৃষ্টিই হত না। ঠিক তেমনি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হত না যদি রাজা আর একটু পরে আসতেন। যদি পথিক একমাষা দিয়ে কিনে নিতেন ফুলটি তবে আর দ্বন্দ্ব শুরু হত না। রাজার আসা এবং সুদামের দ্বিতীয় খরিদ্দার আহ্বানের ভিতর দিয়েই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছে।

এই অংশ থেকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর সাজাও—

১. অন্য সরবরের পদ্মগুলো মরে গিয়েছিল কেন? কার সরোবরে একটি পদ্ম ফুটে উঠেছিল? এই সরোবরটি কোথায় ছিল? পদ্মটি কি বিষাদের সৃষ্টি করে এবং সেই বিষাদের পরিণতি কি হয়?

শেষ অংশের উত্তর এখন তৈরী করা যাবে না। কবিতাটি পাঠ শেষ হলে ঐটুকুর উত্তর তৈরী কর।

২. সুদাম' কে? সে রাজার প্রাসাদদ্বারে গিয়েছিল কেন?

৩. 'হেনকালে হেরি ফুল, আনন্দে পুলকাকুল পথিক কহিল একজন' —পথিক কখন ফুল দেখেছিল? ফুল দেখে তার আনন্দ হল কেন? সে কি বলল?

মনে রেখ, পথিকের আনন্দের কারণ দুটি। ১. পদ্মটি অকালের বিরলবস্তু। ২. বিরল প্রতিভার মানুষ বুদ্ধদেবের চরণে অর্পণ করবার জন্য ত এমন বিরল বস্তুই প্রয়োজন। এই দুই বিরলের মিলন ঘটাবার সম্ভাবনা পথিকের মনে আনন্দের সঞ্চার করেছিল।

৪. 'কত মূল্য লইবে ইহার!' একথা কে কাকে বলেছিলেন, কখন বলেছিলেন? কিসের দাম জানতে চাইলেন তিনি? বস্তুটির প্রতি ক্রেতাটির আগ্রহ কতখানি ছিল? কেন?

৫. 'একমাষা স্বর্ণ পাব মনে আশা।' কার মনে এই আশা? কিসের বিনিময়ে এই স্বর্ণ পাবার আকাঙ্ক্ষা? দ্রব্যটি স্বর্ণ-তুল্য কেন? মাষা কাকে বলে?

'মাষা' শব্দটির অর্থ নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। তবে আমাদের এইটুকু জেনে রাখলেই চলবে যে সোনার তৈরী মুদ্রার একটি সর্বনিম্ন পরিমাপ হচ্ছে মাষা। অনেকে বলেন কলাই বা মাসকলাইয়ের ওজনের সমান সোনা দিয়ে মাষা তৈরী হত। কেউ বলেন, মাষা অত ছোট নয়। টাকাই সোনার তৈরী হলে মাষা নাম পায়। আমাদের অত বিবাদের মধ্যে প্রবেশের প্রয়োজন নেই। আমরা বলব, প্রাচীন ভারতে প্রচলিত এক প্রকার ক্ষুদ্র স্বর্ণমুদ্রাকে মাষা বলা হত।

৬. 'হেনকালে সমারোহে বহু পূজা-অর্ঘ্য বহে নৃপতি বাহিরে আচম্বিতে'—হেনকালে বলতে কোন কালকে বোঝান হয়েছে? নৃপতি বহু পূজা-অর্ঘ্য বহন করে কোথায় চলছিলেন? সমারোহ কেন? আচম্বিতেই বা বের হলেন কেন?

কবিতা সংকলন : মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ধাত্রী-পান্না : যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় পরিপূর্ণভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি। তিনি ১৮৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০০ খৃস্টাব্দে মারা যান। তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ সংকলিত হয়নি। সেকালের বহু পত্র-পত্রিকায় ইনি লিখতেন। তাঁর কিছু কবিতা ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়ে আজও বেঁচে আছে—যেমন আজকের পাঠের কবিতাটি।

কবিতাটি একটি করুণ আত্মত্যাগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা। চিতোরের রাণা ছিলেন উদয়সিংহ। এই উদয় বড় হয়েছিলেন পান্না নামে এক ধাত্রীর কাছে। উদয়ের জন্মের অল্প কিছুকাল পরেই তার পিতার মৃত্যু হয়। রাজ্য শাসনের দায়িত্ব অর্পিত হয় রাজ-পরিবারের এক ব্যক্তির উপর—নাম বনবীর।

কিছুদিনের মধ্যেই বনবীরের লোভ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। রাজ্য পরিচালনা যদি করতে পারি, তবে রাজা হতে দোষ কি? বাধা ত ঐ শিশু উদয়! অতএব দাও ওকে শেষ করে। ছুরি হাতে বনবীর ছুটে এলেন ধাত্রী-পান্নার ঘরে।

সংবাদটা পান্নার কাছে কিছু আগেই পৌঁছে গেছিল। যুগটা রাজভক্তির যুগ। জীবন-ধন-মান সব কিছুতেই তখন রাজার অধিকার। রাজাকে, রাজ-পরিবারকে দেবতার অংশ ভাবাই সেকালের শিক্ষা। বিশেষ করে রাজ-পরিবারের ধাত্রী-পান্না। রাজভক্তিতে টৈ-টম্বুর পান্নার মন। তাছাড়া কাচ শিশু উদয়ের প্রতি তার মমতাও কম নয়। সেই উদয়কে হত্যা করবে বনবীর! কি করে বাঁচান যায় উদয়কে? অতি অল্প সময়ে উপায় স্থির করতে গিয়ে পান্না এক অস্বাভাবিক পথ গ্রহণ করল। প্রায় উদয়েরই বয়সী এক পুত্র ছিল পান্নার। সে তাড়াতাড়ি তাকে উদয়ের পোশাক পরিয়ে শুইয়ে দিল 'উদয়ের বিছানায়, আর উদয়কে এক ঝুড়ির মধ্যে বসিয়ে পাঠিয়ে দিল কোন বিশ্বস্ত লোকের মারফৎ বাইরে।

বনবীর এসেই প্রশ্ন করল কোথায় উদয়?

পান্না বিছানাটা দেখিয়ে দিল বা বনবীর তাকে দেখাবারও সুযোগ দিল না। সোজা এসে উদয় ভেবে পান্নার ছেলেকেই আমূল ছোরা বসিয়ে হত্যা করল।

পান্নার এই তুলনাহীন ত্যাগে উদয় রক্ষা পেল। স্থির মাথায় আপন সন্তানকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে রাজপুত্রকে রক্ষা করে পান্না রাজভক্তির এক অবিনশ্বর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গঠন করল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি যদুগোপালের কাছে এই রাজভক্তির ঘটনাটি ভিন্ন অর্থে প্রতিভাত হয়েছে। এ যুগ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ। ব্যক্তির বেদনা ও ব্যক্তির জীবন-যন্ত্রণাই এ যুগের কবিদের বেশি আকৃষ্ট করত। যদুগোপাল এই বিংশ শতকীয় কবি দৃষ্টি দিয়ে পান্নার আত্ম-বিশ্লেষণকে

ধরতে চেয়েছেন। কবিতাটি যেন পান্নারই উক্তি। বনবীরের আসবার সংবাদ পেয়ে কিভাবে সে নিজ পুত্রকে 'হত' হবার জন্য প্রস্তুত করল, এই কবিতার দশটি অনুচ্ছেদে তারই স্বগতোক্তি।

এ জাতীয় কবিতাকে Dramatic Monolague বলে। বাঙলায় বলা যায় **'নাটকীয় একক ভাষণ'**। এই আলোচনা থেকে নিচের প্রশ্নগুলো দেওয়া যায়।

১. 'ধাত্রী-পান্না' কবিতাটির লেখক কে? তিনি কোন কালের লেখক? তাঁর কতগুলো গ্রন্থ ছাপা হয়েছে? তাঁর কবিতাগুলো প্রধানত কি জাতীয়?

২. ধাত্রী-পান্না কে? তাঁর প্রসিদ্ধি কেন? তাঁর কাজের মধ্যে তাঁর কি কি গুণ ফুটে উঠেছে?

৩. ধাত্রীপান্নাকে কি জাতীয় কবিতা বলা যায়? এই কবিতায় কটি অনুচ্ছেদ?

প্রথম অনুচ্ছেদ ঃ পান্না তার পুত্রকে লক্ষ্য করে বলছে ঃ—

দশ মাস তোকে গর্ভে ধারণ করেছি। তুই আমার স্নেহের পুতুল। তোকে কোলে তুলে স্তনপান করিয়েছি, কত রকমে লালন-পালন করেছি—নিজ মুখে তা আর কি বলব! বাছারে, সমুদ্রেরও তল আছে, পার আছে, কিন্তু মাতৃস্নেহকে যদি সমুদ্রের সঙ্গেই তুলনা করি, তবে সে সমুদ্রের তলও নেই, পারও নেই।

আলোচনা ঃ এই অনুচ্ছেদে পান্না মূলত মাতৃস্নেহ সম্পর্কেই বলেছে। পুত্রকে স্বেচ্ছায় বনবীরের ছোরার সামনে তুলে দিতে গিয়ে পান্নাকে কি অসাধ্য সাধন করতে হয়েছে, আলোচ্য অনুচ্ছেদে তারই ভূমিকা তৈরী করা হয়েছে। যে মা দশমাস গর্ভে ধারণ করেছেন, অতল অপার মাতৃস্নেহে এতদিন ধরে লালন করেছেন স্তনপানে জীবন বাঁচিয়ে রেখেছেন—তাকেই তুলে দিলেন ঘাতকের সামনে! এই পরিণতির চিত্রকে গাঢ় কালো করবার জন্যই এখানে মাতৃস্নেহের উজ্জ্বল ছবি আঁকা হয়েছে।

প্রশ্ন

১. 'নিজে কি বলিব মুখে!' —একথা কার? তিনি নিজ মুখে কি বলতে চান না? না বলতে বলতেও কি কি বলেছেন?

২. 'অতল অপার মাতৃস্নেহ পারাবার।' —বাক্যটির অর্থ বল। কি প্রসঙ্গে কে একথা বলেছেন? কেন বলেছেন?

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম অনুচ্ছেদে যে অতল অপার মাহস্নেহের কথা বলেছে পান্না, তারই জের টেনে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলছে—

অতল অপার যে মাতৃস্নেহের সমুদ্র থাকে মায়ের বুকে, নিয়তির দোষে পান্নার বুকের সেই সমুদ্রও আজ মরুভূমির মত শুষ্ক স্নেহশূন্য হল। যা ছিল দেবভোগ্য মন্দাকিনীর জলধারা তা ঠিক বৈতরিণীর স্রোতে পরিণত হল! শিরীষের ফুল আজ হল বজ্রের মত কঠোর। সুগন্ধ পক্ক হল দুর্গন্ধ মল!

আলোচনা ঃ পুত্রের প্রতি মাতার স্নেহ স্বাভাবিক। মা তার শত আঘাত থেকে পুত্রকে রক্ষা করেন। পুত্রের আঘাত তিনি নিজে বুক পেতে নেন, পিঠ পেতে গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই মা হয়েও পান্না তার পুত্রকে ঠেলে দিচ্ছেন ঘাতকের কাছে। মায়ের এই বিপরীত কাজকে কয়েকটি প্রতিবস্তুর সঙ্গে তুলনা করেছে পান্না। ১. সমুদ্রের মরুভূমিতে পরিণত হওয়া ২. মন্দাকিনীর ধারা বৈতরিণীতে পরিণত হওয়া, ৩. শিরীষ কুসুমের বজ্রে

পরিণত হওয়া এবং ৪. সুগন্ধ পক্কের পূরীষে পরিণত হওয়া।

এর ভেতর দ্বিতীয় তুলনাটি বোঝা তোমাদের পক্ষে একটু কঠিন হতে পারে। কারণ তোমরা মন্দাকিনী এবং বৈতরিণী নদী সম্পর্কে জান না। এ দুটি কাল্পনিক নদী। মনে করা হয় স্বর্গের চারদিক দিয়ে বয়ে চলেছে অমৃতবাহী মৃদুস্রোতা **মন্দাকিনী**। আর প্রেতপুরীর চারদিক দিয়ে বয়ে চলেছে **বৈতরিণী**। এ নদী কেমন? বাল্মিকী রামায়ণে বর্ণনা আছে,

নদী বৈতরিণী নামা দুর্গন্ধা
রুধিরবহা।
উষ্ণতোয়া মহাবেগা অস্থিকেশ-
তরঙ্গিণী ।।

অর্থাৎ, এ নদীতে মহাবেগে দুর্গন্ধ ও অস্থিমিশ্রিত রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে।

প্রশ্ন

১. 'নিয়তির ফলে আজি শুষ্ক মরুস্থল।'—কি জিনিস আজ শুষ্ক মরুস্থলে পরিণত হয়েছে? 'নিয়তি'র উল্লেখ কেন?

২. 'মন্দাকিনী বারিধারা—বহিল প্রবল।'—মন্দাকিনী এবং বৈতরিণীর মধ্যে পার্থক্য কি?

কুমার চট্টোপাধ্যায়

অনুচিন্তা

কমলা বালিকা বিদ্যালয়ের সহশিক্ষিকা শ্রীমতী দেবী মজুমদার আমাদের কয়েকটি ভুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। তার ভেতর 'দুহিতা' শব্দটির সমাস—একটি। ওটি সমাসের অন্তর্গত করা ঠিক হয়নি। শ্রীমতী মজুমদারকে এজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তবে তিনি 'জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা' পংক্তিটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে আপত্তি তুলেছেন, তাকে আমরা সর্বৈবস্বীকার করতে পারছি না। আমাদের ব্যাখ্যার বদলে শ্রীমতী মজুমদার যোগ করতে চান—

'তার পরিবর্তে অনসূয়াদেবীকেই সবার নমস্যা বলে বোধ হয়' এই ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত সুগম।'

আমাদের মনে হয় শ্রীমতী মজুমদার এখানে যে কথা বলেছেন তা যদিও নির্গলিতার্থ, তবু ঐ পদটির প্রত্যক্ষ অর্থ কি এটা হয়? 'জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা' বাক্যটিকে ঘুরিয়ে যদি এমন একটা গদ্যরূপ দেওয়া যায় যে '(তিনি) সবার নমস্যা গায়ত্রী কি?—(এইরূপ) জ্ঞান হয়।'—তবে ঐ অর্থ করা যায়। কিন্তু এই ব্যাখ্যা সুগম হল কি?

ভারতীয় দর্শন মনে করে মানুষ তপস্যা দ্বারা দেবত্ব অর্জন করতে পারে। তাপসী অনসূয়া গায়ত্রী-সমা হয়েছেন—এ কথায় গায়ত্রীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না—মনুষ্যত্বের মহিমা বাড়ে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমাদের এ চিন্তা যাঁদের ভ্রান্ত বলে মনে হবে তাঁরা শ্রীমতী মজুমদারের মত গ্রহণ করতে পারেন। সাহিত্য ব্যাখ্যায় অনেক ক্ষেত্রে এমন মতান্তর দেখা দেয়। ছাত্র-ছাত্রীরা সম্ভব হলে দুটি মতই উল্লেখ করবে।

তপোবনকে চতুর্থী তৎপুরুষ এবং (মধ্যপদলোপী) কর্মধারায় দুইই বলা যায়। এখানে ভুল নেই। তপোবনের সমাস নির্ণয় করতে গেলে ছাত্রছাত্রীদের দুটিই লেখা উচিত।

—লেখক

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য

দ্বিতীয় পত্র

পাঠসংকলন ঃ গদ্যাংশ

ভানুসিংহের পত্র

চতুর্থ পাঠে আমরা 'ভানুসিংহের পত্র'-এর প্রারম্ভিক আলোচনা সেরেছি। তা থেকে তোমরা নিশ্চয় জেনেছ যে ভানুসিংহ ঠাকুর আসলে রবীন্দ্রনাথেরই ছদ্মনাম। এক সময় তিনি প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে ব্রজবুলি ভাষায় কিছু পদ রচনা করেন। তার ভণিতায় কবি কৌশলে নিজের নামটাই প্রাচীনতার মোড়কে মুড়ে চালিয়ে দেন। কবিতাগুলো (আসলে গান) একত্রে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে প্রকাশিত হয় এর অনেক পরে। এ সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য ও বিবরণ আছে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে (পৃঃ ৮৫) তোমরা যারা পড়নি, পড়ে নিও। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফণি অধিকারীর কিশোরী কন্যা রাণুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এক গোপন স্নেহস্নিগ্ধ সম্পর্ক গড়ে উঠলে (অনেকটা দাদু-নাতনীর সম্পর্কের মত), রাণু কবিকে কোন গোপন নামে ডাকতে চায়—যা হবে শুধু তাদেরই জানা। এই অভিলাষ থেকেই সে রবীন্দ্রনাথকে 'ভানুদাদা' বলে উল্লেখ করতে থাকে এবং রবীন্দ্রনাথও পত্রশেষে ভানুদাদা বলে উল্লেখ করতে থাকেন।

পত্রগুলোতে ভানুদাদা রাণুর সঙ্গে যেমন স্নেহমধুর রঙ্গ-রসিকতা করতেন, তারও কিছু নমুনা তোমাদের তুলে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক অপ্রাসঙ্গিক না হলেও, তোমাদের পরীক্ষার কাজে লাগবে না, এমন অনেক বাড়তি সংবাদও গত সংখ্যায় দেওয়া হয়েছে। যেমন ধর মূল গ্রন্থে কতগুলো পত্র আছে বা কত সাল থেকে কত সালের পত্র ওতে সংকলন করা হয়েছে···ইত্যাদি। এগুলো তোমাদের স্মৃতিতে ধরে না রাখলেও চলতে পারে। কিন্তু আলোচনার কালে বাড়তি কিছু বলা হবেই। সেটা বলার টানে—জানাবার ঝোঁকে। আমরা যখন প্রয়োজন দিয়ে বিচার করি তখন পাঁঠার ল্যাজ, কান, ক্ষুর, শিং, ছাল, চামড়া একান্ত অনাবশ্যক ভাবি, কিন্তু জেনো, পাঁঠার নিজের বেঁচে থাকার জন্য ওগুলো একান্ত প্রয়োজন। যে বিষয় শিখতে চলেছ, পরীক্ষায় লাগুক, না লাগুক, তার গোটাটা জানাও তেমনি প্রয়োজন। এতে জানা যেমন পূর্ণ হয়, তেমনি হয় সজীব। উত্তর লিখতে গিয়ে বিষয়বস্তুর অভাব হয় না।

এই ভূমিকাটুকু সেরে আমরা আজকের পাঠে প্রবেশ করছি। মনে রেখ,

- **১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ পুজোর ছুটি কাটাতে শিলং গিয়েছিলেন।**
- **সেখানে তিনি ব্রুকসাইড নামে একটি বাড়িতে ছিলেন।**
- **তাঁর সঙ্গী ছিলেন পুত্র (রথীন্দ্রনাথ), পুত্রবধূ (প্রতিমা দেবী), এক নাতি**

(দিনেন্দ্রনাথ), নাতবৌ (কমল বৌঠান) এবং একজন ব্যক্তিগত ভৃত্য (সাধুচরণ)।

- তাঁরা সেখানে ছিলেন মাত্র তিন সপ্তাহ—১১ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত।

পাঠসংকলনে পত্রটির তারিখ দেওয়া হয়নি। কিন্তু জেনে রাখ, পত্রটি লেখা হয়েছে **১৩২৬ বঙ্গাব্দের** আশ্বিন মাসের **কৃষ্ণা তৃতীয়ায়**। ইংরাজীতে তারিখটা, **১২ অক্টোবর, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ**।

——— প্রশ্ন ———

ভানুসিংহের পত্রটি কোথা থেকে, কে কাকে কত তারিখে লিখেছিলেন?

এই পত্রে কিন্তু সমগ্র যাত্রা বর্ণনা করা হয়নি। সমগ্র যাত্রা জানতে ঠিক এর আগের চিঠিটি অর্থাৎ ৩৭নং চিঠিটিও পাঠ করা দরকার। সে চিঠিটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন **১৩২৬-এর আশ্বিনের পূর্ণিমা তিথিতে**। পূর্ণিমার পরের তৃতীয় দিনে হয় তৃতীয়া তিথি। আমরা আগেই জেনেছি যে তৃতীয়া ছিল **৯ অক্টোবর**। এই দিন বিকালেই তিনি শিলং যাত্রা করবেন বলে জানিয়েছেন। পরের চিঠি থেকে জেনেছি যাত্রার দিনটা ছিল বৃহস্পতিবার। অর্থাৎ ৯ অক্টোবর হল বৃহস্পতিবার। এর আগেই রবীন্দ্রনাথ বোলপুর থেকে কলকাতা জোড়াসাঁকোতে চলে আসেন। এর তারিখটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

যাই হোক, সমগ্র ভ্রমণটিকে আমরা দুটি পর্বে ভাগ করতে পারি ক. বোলপুর থেকে হাওড়া হয়ে জোড়াসাঁকো খ. জোড়াসাঁকো থেকে শিলং।

এই ভ্রমণের (ক) পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কবে বোলপুর থেকে রওনা হয়ে এসেছিলেন তা জানা যাচ্ছে না। তবে সেদিন গভীর রাতে তিনি এসে পৌঁছান হাওড়ায়। হাওড়ায় তখনও এই ঝুলন্ত সেতু হয়নি। এর আগের কালে লোক হাওড়া থেকে নৌকোতে এপারে আসত। ইংরেজরা মাঝে নৌকোর পর নৌকো সাজিয়ে হাওড়ায় পুল বানায়। একে বলা হত পন্টুন-ব্রিজ। সারাদিন ঐ পুল দিয়ে লোক যাতায়াত করত। কিন্তু রাত দশটার পর মাঝখানের বেশ খানিকটা অংশ খুলে বেয়ে নিয়ে যাওয়া হত পাশে। ঐ ফাঁক দিয়ে জাহাজ যাতায়াত করত। ১৮৭৪ সালের ১৭ অক্টোবর প্রথম পন্টুন ব্রিজ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঐদিন হাওড়ায় যখন এসে পৌঁছেছিলেন তার আগেই ব্রিজের মাঝের অংশ সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। ফলে হাওড়া থেকে মোটর গাড়ি বা ঘোড়ার গাড়িতে জোড়াসাঁকোতে ফেরা সম্ভব হল না। অগত্যা রবীন্দ্রনাথ নৌকা করে গঙ্গা পার হবেন মনস্থ করলেন।

কিন্তু তাতেও বিপদ। জোয়ার চলে গেছে তখন ভাঁটার সময়। পাড়ের কাছাকাছি থেকে নৌকা পর্যন্ত থিকথিকে কাদা। নৌকায় পৌঁছাবেন কি করে? এক মাঝি ঝপাং করে কোলপাঁজা করে তুলে নিলেন রবীন্দ্রনাথকে। ঐ ভাবেই সে পৌঁছে দেবে নৌকায়। মাঝ রাস্তায় পা পিছলে মাঝি ত কাদায় মাখামাখি হলই, কাদায় ফেলে জোব্বা-জামা দাড়িসহ রবীন্দ্রনাথকেও কাদার রবীন্দ্রনাথে পরিণত করল।

আমাদের পাঠ্য চিঠিতে এ ঘটনার উল্লেখ আছে যার প্রকৃত বর্ণনা আছে আগের ৩৭ নং চিঠিতে। এই অংশটা আমাদের পড়ে রাখা উচিত। তাই আমরা নিচে তা তুলে দিলাম।

'…রাত এগারটায় হাওড়ায় উপস্থিত। এসে শুনি হাওড়া ব্রিজ খুলে দিয়েছে।

নৌকায় গঙ্গা পার হতে হবে। মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে ঘাটে গেলাম। [মনে রেখ, নোবল প্রাইজ পাওয়ার প্রায় ছ বছর পরের ঘটনা এটা] এক মাল্লা এসে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে চলল। নৌকার কাছাকাছি এসে আমাকে শুদ্ধু ধুপাস করে পড়ে গেল। আমার সেই ঝোলা কাপড় নিয়ে সেইখানেই জলে কাদায় লুটোপুটি ব্যাপার। গঙ্গামৃত্তিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হয়ে নিশীথ রাত্রে বাড়ি এসে পৌঁছান গেল। গঙ্গাতীরে বাসা, তবু ইচ্ছে করে বহুকাল গঙ্গাস্নান করিনি--ভীষ্মজননী ভাগীরথী সেই রাতে তার শোধ তুললেন।'

উদ্ধৃতাংশ ভালভাবে পড়। দেখ, কবি জলে-কাদায় মাখামাখি হওয়াকে ভারি সুন্দর দুটি শব্দে প্রকাশ করেছেন—'গঙ্গা-মৃত্তিকায় লিপ্ত' এবং 'গঙ্গাজলে অভিষিক্ত'।

সাধারণভাবে গঙ্গামাটি দিয়ে তিলককাটা এবং গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধ করাকেই ঐ দুটি শব্দে প্রকাশ করা হয়। সে রাতের সেই জল-কাদায় মাখামাখি হওয়া তিলক-কাটার মতই শোভন আর সামান্য জল-ছিটানর মতই রুচিকর বটে। এতেও থামলেন না কবি। এর পিছনে স্বয়ং মা-গঙ্গার একটা অভিপ্রায়ও বের করে ফেললেন। অবাধ্য ছেলেকে যেমন মা কান ধরে স্নান করায়, অবাধ্য রবীন্দ্রনাথকেও তেমনি মা-গঙ্গা জোর করে গঙ্গাস্নান করিয়ে নিলেন। কিসে অবাধ্য রবীন্দ্রনাথ! তিনি গঙ্গার কাছাকাছি বাস করেও গঙ্গাস্নান করেননি। ভীষ্মজননীর তাই এই ভ্রম-সংশোধন।

বোলপুর থেকে কলকাতায় আসা ত এমনি করে কাটল। এর পর ৯ অক্টোবর বিকেলে, তখন পূর্ণিমা কেটে প্রতিপদ শুরু হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ শিয়ালদহ থেকে কোন গাড়িতে চেপে বসলেন শিলং যাওয়ার জন্য।

দেশ তখন ভাগ হয়নি। ইংরেজ রাজত্ব। তখন শিলং যাওয়ার পথটা আজকের মত ছিল না। এই পথটা তোমাদের জেনে রাখা দরকার। তখন শিয়ালদহ থেকে ব্রডগেজ লাইনে আসাম-মেল চলত। তা যেত শান্তাহার পর্যন্ত। শান্তাহার থেকে মিটার গেজে চড়তে হত। তারও নাম আসাম মেল। এই আসাম মেল পৌঁছে দিত আমিনগাঁও স্টেশনে। এই স্টেশন ব্রহ্মপুত্র নদের পারে। এই নদ পার হতে হত স্টিমারে। ওপারের শহরের নাম ছিল পাণ্ডু। পাণ্ডু থেকে গৌহাটি হয়ে শিলং যেতে হত মোটরে বা অন্য কোন যানে। পাণ্ডু থেকে গৌহাটির দূরত্ব খুব বেশি নয়। কিন্তু তারপর থেকেই পাহাড়ী পথ বলে বেলা দুটোর পর পাণ্ডু থেকে কোন মোটর গৌহাটির দিকে ছাড়তে দেওয়া হত না। ব্যাপারটাকে সহজভাবে বোঝবার জন্য নিচের ছক দেখ

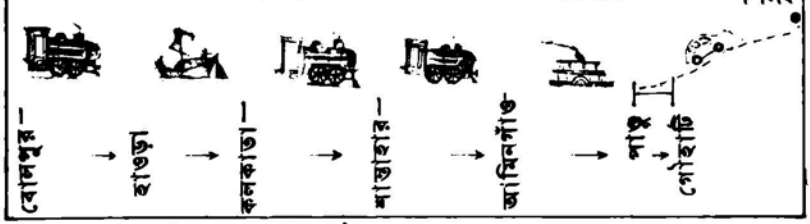

রবীন্দ্রনাথের শিয়ালদহ থেকে আসাম যাওয়ার পথ

দ্বিতীয় যাত্রার অংশে রবীন্দ্রনাথ শান্তাহার এবং গৌহাটি ছাড়া আর কোন স্টেশনের নাম ব্যবহার করেননি। কার্যকারণ দেখে চিঠিটি থেকে বুঝে নিতে হবে, কোথায় কোন ঘটনা ঘটেছে। এই ব্যাপারটিকে খুব ভালভাবে মগজে গেঁথে নাও। তাহলে ভ্রমণ বৃত্তান্তটি বুঝতে অসুবিধা হবে না।

আগামী সংখ্যায় আমরা মূল প্রবন্ধটি পাঠ শুরু করব।

ব্যাকরণ

প্রতিবর্ণীকরণ

১৯৭৪ সালে যখন মাধ্যমিক-স্তরের পাঠ্যক্রম স্থির হয়, তখন এই নতুন অংশটি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নাম **'প্রতিবর্ণীকরণ'**। এর অন্য কতকগুলি নামও প্রচলিত আছে যেমন লিপান্তরকরণ।

নাম যাইহোক লিপ্যান্তরকরণ বা প্রতিবর্ণীকরণ বিষয়টা কি আমরা মুখে যা উচ্চারণ করি তাকে লিখে প্রকাশ করাই তো বর্ণীকরণ! এইজন্যই তো বর্ণকে বলা হয় ধ্বনির লিখিত রূপ। তাহলে যে কোন ভাষার যে কোন ধ্বনিকে লিখে বলাই বর্ণীকরণ।

তাহলে প্রতিবর্ণীকরণ ব্যাপারটি কি? আসলে, কোন ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ যদি একবার কোন লিপিতে ধরা পড়ে এবং তাকে যদি অন্য এক লিপিতে পরিণত করি তবে তাকে বলা হবে লিপ্যান্তরকরণ বা প্রতিবর্ণীকরণ। এও এক ধরনের অনুবাদ। এক ভাষার ধ্বনিকে অন্য ভাষায় প্রকাশ করা। অনুবাদের সঙ্গে কিন্তু প্রতিবর্ণীকরণের পার্থক্যও আছে। দুই-ই ভাষান্তর। তবে, অনুবাদ করি অর্থের দিকে তাকিয়ে আর প্রতিবর্ণীকরণ করি ধ্বনির দিকে তাকিয়ে—অনুবাদে ভাষান্তর হয়, ধ্বনিরও পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু অর্থান্তর হয় না। কিন্তু প্রতিবর্ণীকরণে ভাষান্তর হয়, ধ্বনি বা অর্থ কিছুরই পরিবর্তন হয় না।

উদাহরণ নাও :—

SCHOOL	বিদ্যালয়	স্কুল
মূল ভাষা	**অনূদিত**	**প্রতিবর্ণীকৃত**

দেখ, বিদেশী ইংরেজী ভাষার school শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে বিদ্যালয়। এখানে ভাষা এবং ধ্বনি দুই-ই বদলে গেছে। বদল হয়নি অর্থের। অতএব এটি যথার্থ অনুবাদ। 'স্কুল' লিখলে ভাষাটা বদলে যায় বটে কিন্তু ধ্বনি এবং অর্থ ঠিকই থাকে। একেই বলে **প্রতিবর্ণীকরণ বা লিপ্যান্তরকরণ।**

কিন্তু, এক ভাষার ধ্বনি বা **ধ্বনি** সমষ্টিকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে গেলে অসুবিধাও কম ঘটে না। এই অসুবিধাটার কথা চিন্তাবিদ ও ভাষাবিদ রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই শোন :

'ইংরেজি শব্দ বাংলা অক্ষরে লিখিবার সময় কতকগুলি জায়গায় ভাবনা উপস্থিত হয়। যথা—ইংরেজি **sir**। বাংলায় সার লেখা উচিত না সর লেখা উচিত? ইংরেজি v অক্ষরে বাংলার 'ব' না 'ভ' vow শব্দে বাংলায় কি বৌ লিখিব না ভৌ লিখিব না বাউ অথবা ভাউ লিখিব!'

খুব সংক্ষেপে এখানে রবীন্দ্রনাথ মূল সমস্যাটিকে তুলে ধরেছেন। বাঙলায় বহু বিদেশী শব্দ গৃহীত হয়েছে। যে কোন ভাষা সমৃদ্ধ হয় প্রধানত দুই উপায়ে। ১. অন্য ভাষা থেকে শব্দগ্রহণ, ২. নিজ ভাষায় নূতন নূতন ধ্বনি সৃষ্টি করে। বাঙলা ভাষা যেমন নিজে প্রয়োজন

অনুসারে বহু শব্দ সৃষ্টি করতে পারে, ঠিক তেমন অন্য ভাষা থেকে প্রচুর ধ্বনি গ্রহণও করতে পারে।

এমন ধ্বনি গ্রহণের প্রয়োজনও আছে। আমরা প্রতিনিয়ত অন্য ভাষা থেকে যে জ্ঞান আহরণ করি তা নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে গেলেই প্রতিবর্ণীকরণের প্রয়োজন হয়। সেক্সপীয়রের রোমিও জুলিয়েট নাটকের কথা বলতে গেলে নাট্যকার ও নাটক, দুয়ের নামই প্রতিবর্ণীকৃত হওয়া দরকার। লণ্ডন বা আল্পস পর্বতমালার নামের কি অনুবাদ করা যায়? সেখানে প্রতিবর্ণীকরণ ভিন্ন পথ কি? স্পুতনিক বা স্তানিসলাভস্কি বা লুসুনের কথা বলতে গেলে কি করবে? অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, **কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম বা ভৌগোলিক বা বৈজ্ঞানিক বিশেষ শব্দ ইত্যাদির প্রতিবর্ণীকরণ ভিন্ন পথ নেই।**

প্রশ্ন

১. প্রতিবর্ণীকরণ কাকে বলে? প্রতিবর্ণীকরণ এবং অনুবাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

২. প্রতিবর্ণীকরণের প্রয়োজন কি? কোন কোন স্থানে প্রতিবর্ণীকরণ ভিন্ন পথ নেই?

প্রতিবর্ণীকরণ যখন করতেই হবে, তখন প্রতিবর্ণীকরণের সমস্যাটা ভালভাবে বুঝে নেওয়া যাক। আমরা রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিটি দিয়ে তোমাদের কাছে প্রতিবর্ণীকরণের সমস্যার একটা সাধারণ রূপ ধরে দিয়েছি। এবার তাকে বিশ্লেষণ করে, সমস্যার আরও গভীরে ঢুকতে চাই।

সমস্যার প্রথম দিক

এক ভাষার বর্ণ সংখ্যা ও উচ্চারণরীতি কখনই অন্য ভাষার সঙ্গে হুবহু এক নয়। যদি এক হত তবে কোন সমস্যাই থাকত না। তুমি ছবি আঁকতে বসে অস্তায়মান সূর্যের গাঢ় লাল যদি না পাও তবে লালচে দিয়েই কাজ চালাও। এখানেও সেই কাজই করতে হয়। অর্থাৎ যে ধ্বনির প্রতিবর্ণ চাইছি তা যদি না থাকে তবে তার কাছাকাছি কোন ধ্বনি দিয়ে চালাতে হয়।

আমরা আমাদের এই আলোচনায় ইংরাজী এবং বাঙলা ভাষা নিয়েই সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাত করছি। দেখ, বাঙলায় দন্ত্যমূলীয় আনুনাসিক ধ্বনি পেয়েছি **'ন'** —ইংরাজীতে অনুরূপ ধ্বনি রয়েছে **'N'** এক্ষেত্রে কোন অসুবিধা ঘটে না। নীরদ বা নারায়ণ লিখতে N ব্যবহারে কোন দ্বিধাই ঘটে না। বা Nipple, Note বা Notice-এর প্রতিবর্ণীকরণ করতে বসে 'ন' ব্যবহার করি চিন্তার কোন অবকাশ না রেখেই। অর্থাৎ, **যেখানে দ্বিতীয় ভাষায় (প্রতিবর্ণীকরণের ভাষায়) প্রথম ভাষার অনুরূপ ধ্বনি আছে, সেখানে প্রতিবর্ণীকরণের কোন সমস্যাই নেই।**

কিন্তু যেখানে অনুরূপ প্রতিবর্ণ নেই—সমস্যা সেখানেই। যেমন ধর ইংরাজি **T ও D** ধ্বনি দুটির বাঙলা প্রতিবর্ণ কি হবে! ইংরাজীতে এদের উচ্চারণ অনেকটা ঘৃষ্ট। জিভের অগ্রভাগ দিয়ে দন্তমূল স্পর্শ করিয়ে, জিভের মাঝখানটা মূর্ধার কাছাকাছি এনে, দুয়ের মাঝে সামান্য ফাঁক রেখে, ঐ ফাঁকের ভেতর দিয়ে ঘষে বাতাসকে বের করে T এবং D উচ্চারণ করতে হয়। বাঙলায় এর কাছাকাছি বর্ণ দুটি নেহাত সাদামাঠা স্পর্শবর্ণ—**ট ও ড**। এদের ব্যবহার করা ছাড়া পথ কি? তবু বলবে যে, ওতে ত ঐ ঘৃষ্টতা থাকল না। আমরা বলতে বাধ্য হব, উপায় কি! মধুর অভাবে গুড় দেবার কথা ত শাস্ত্রেই বলেছে।

অনুরূপ সমস্যা দেখা দিতে পারে **K, P, T** নিয়ে। এরা সকলেই মহাপ্রাণ এবং স্পৃষ্ট ধ্বনি। এদের সবচেয়ে কাছের যে ধ্বনি কটি তারা সকলেই অল্পপ্রাণ এবং স্পর্শবর্ণ। উপায়হীন হয়েই ঐ দুর্বল বর্ণকটিই ব্যবহার করতে হয়—ক্ প্ ট্।

তাহলে, এর থেকে আমরা কি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাতে পারি? এই প্রথম জাতের **সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দুটি :**

১. মূল ভাষার ধ্বনিকে যথাযথ প্রকাশ করতে পারে এমন ধ্বনি যদি প্রতিবর্ণীকরণের ভাষায় থাকে তবে সেই ধ্বনিই গ্রহণ করতে হবে।

২. মূল ভাষার ধ্বনি যথাযথ প্রকাশ করতে পারে এমন ধ্বনি যদি প্রতিবর্ণীকরণের ভাষায় না থাকে তবে সেই ধ্বনির সবচেয়ে কাছের ধ্বনিকেই গ্রহণ করতে হবে। তাতে মূলের যে বিকার ঘটবে তাকে সহ্য করা ছাড়া পথ নেই।

সমস্যার দ্বিতীয় দিক

বাঙলা ভাষায় ভিন্ন ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ চলছে দীর্ঘকাল থেকে। বাঙলা ভাষা যখন সবে ভগ্নী স্থানীয় অসমীয়া, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষা থেকে পৃথক হয়েছে, তার কিছু পরেই এদেশে হয় তুর্কী আক্রমণ। তুর্কীদের বঙ্গবিজয় এদেশের নানা দিকে এমন পরিবর্তন আনল যে ওদের ভাষা বাঙালীকে প্রয়োজনবোধেই গ্রহণ করতে হল। এই প্রবাহে বাঙলায় এসে ঠেকে বহু আরবী, ফারসী এবং তুর্কী শব্দ।

এরপর এল পর্তুগীজ বণিক ধর্মযাজক ও জলদস্যুর দল। এদের সংস্পর্শে এসে ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পর্তুগীজ শব্দ গৃহীত হয়েছে এমনভাবে যে, আজ আমরা অবাক হব যদি শুনি যে এগুলো বিদেশী শব্দ।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এল ইংরেজরা। ইংরেজদের দু'শ বছরের শাসনে কত যে নতুন শব্দ বাঙলায় ঢুকে পড়ল এবং আজও ঢুকছে, তার হিসাব বের করা খুব সহজ নয়। আজ অবশ্য বিশ্বের অন্য সব ভাষা থেকেও শব্দ ঢুকছে।

এইসব শব্দের প্রতিবর্ণীকরণে আরও এক জাতের সমস্যা দেখা দেয়। ১. অতীতে আরবী-ফারসী-তুর্কী বা পর্তুগীজ এমন কি প্রথম দিকের বহু ইংরাজী শব্দও প্রথমে গ্রহণ করেছে বাঙালী সমাজ, পরে গৃহীত হয়েছে লিখবার ভাষায়। সমাজ আগে গ্রহণ করায় সে নিজের মত করে দুমড়ে মুচড়ে শব্দটার ধ্বনিগত নূতন রূপ দিয়েছে। আসল শব্দটা লোকব্যবহারে অনেকখানি বদলে অন্য রূপ নিয়েছে। আমরা পরে লেখা ভাষায় সমাজ প্রচলিত রূপটার 'প্রতিবর্ণীকরণ' করেছি। এমনি করে সমাজ গ্রহণ করাকে ভাষা বিজ্ঞানীরা বলেন **স্বাঙ্গীকৃত হওয়া**। যে সব শব্দ স্বাঙ্গীকৃত (naturalised) হওয়ার পর প্রতিবর্ণীকৃত হয়েছে, তাদের কখনই আর মূলের মত বানান করতে নেই। যেমন,

ফারসি— বর্-আওর্দ → বরাদ্দ
আরবি→ থালিথ → সালিস
পর্তুগীজ→ ANANAS→ আনারস
→ ARMARIO→ আলমারী
→ IGREJA — গির্জা
ইংরাজী → DOCTOR → ডাক্তার
HOSPITAL→ হাসপাতাল

এই শব্দগুলোকে কখনই মূল ভাষার উচ্চারণে পরিণত করে বর্ণীকরণের প্রয়োজন নেই।

২. বর্ণীকরণ সমস্যার আর একদিক হচ্ছে আধুনিককালের যেসব নতুন নতুন শব্দ বাঙলায় গৃহীত হচ্ছে। নানা ধরনের ভৌগোলিক, বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক বা

তাত্ত্বিক আলোচনায় যে সমস্ত বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেগুলি যথাসম্ভব মূলানুগত রাখাই উচিত। যেমন,

স্পুটনিক, রোবট, রেডিয়াম।

সমস্যার তৃতীয় দিক

বাঙলা ভাষায় ইংরেজরা বর্ণীকরণের আর একসমস্যা সৃষ্টি করে গেছেন। ওঁরা ছিলেন তখনকার রাজার জাত। অতএব ওঁরা যেমন যেমন উচ্চারণ করতেন, আমাদের দেশী মানুষেরাও তেমন তেমন উচ্চারণ করতে চাইতেন—এবং ভাবতেন ঐ রকম নকল উচ্চারণই বুঝিবা যথার্থ সভ্যতার পরিচায়ক। বুঝতেই পারছ, ইংরেজরা বাঙলা শব্দের যে উচ্চারণ করতেন, তা আদৌ শুদ্ধ উচ্চারণ নয়—একেবারেই কদুচ্চারণ। আজও অনেকক্ষেত্রে আমরা এমন উচ্চারণ এবং ঐ রীতি অনুসারে বর্ণীকরণ করি। এমন বলা বা লেখা সম্পূর্ণ জাতীয়তাবিরোধী এবং তা মাতৃভাষার ওপর অত্যাচার। যেমন—

- কলিকাতা বা কোলকাতা বা কল্‌কাতা না বলে, ক্যালকাটা বলা বা লেখা।
- কাঁথি না বলে বা না লিখে কন্টাই (Contai) বলা বা লেখা।
- সংস্কৃত না বলে স্যান্‌স্‌ক্রিত্‌ বা স্যাঁয়েসক্রীট বলা বা লেখা।
- চীন না বলে China বা চায়না বলা বা লেখা।

এগুলো আজ অনেকক্ষেত্রে সংশোধিত হচ্ছে। আজ আর আমরা গঙ্গাকে গ্যান্‌জেস বলি না বা লিখি না। ইংরাজীতেও লিখি The Ganga. আমরা সাহেবী বানানে লিখি না, Krishnagar লিখি Krisnanagar.

বহু বাঙলা উপাধি এমন বিকৃত-উচ্চারণ বা সাহেবী উচ্চারণের নকলে বর্ণীকৃত করা আধুনিক ফ্যাসান। এমন বলা যে কতখানি আত্ম অবমাননাকর কতখানি হীনমন্যতার পরিচয়—তা বলে শেষ করা যায় না। দেখ, বহু বড় উপাধিকে সংক্ষেপে উচ্চারণ করবার রীতি বাঙলায় প্রকাশিত আছে। যেমন ধর, পূর্ণ শুদ্ধরূপে যা চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় বা গঙ্গোপাধ্যায় তাকেই বাঙলা রীতিতে সংক্ষেপে বলা যায় চট্টো, মুখো বা গঙ্গো লেখাও যায়—আমরা তার কোনটাই ব্যবহার না করে সাহেবদের বিকৃত উচ্চারণের নকল করে আজও বলি চ্যাটার্জি, মুখার্জি, গাংগুলি বা গ্যাংগোলি। অনেকে বাঙলাতেও লেখেন রবীন্দ্রনাথ টেগর, সুভাষ বোস, অমিট রে। আজ এই দাস্য মনোভাব কি আমাদের ত্যাগ করা উচিত নয়?

আজকের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা থেকে যেসব প্রশ্ন দেওয়া যায়, তার তালিকা নিচে দেখ এবং উত্তর করতে চেষ্টা কর। মূলত উত্তরগুলো ওপরের আলোচনাতেই পাবে।

১. বাঙলায় কোন কালে কি কি ভাষা থেকে শব্দগ্রহণ করা হয়েছে? এদের প্রতিবর্ণীকরণের সমস্যাগুলি বল।

২. স্বাঙ্গীকৃত হওয়া কাকে বলে? স্বাঙ্গীকৃত শব্দের বর্ণীকরণ কিভাবে হবে?

৩. বর্ণীকরণের ক্ষেত্রে দুই ভাষায় অনুরূপ ধ্বনি থাকা এবং না থাকা কিভাবে সমস্যা সৃষ্টি করে, এবং কি ভাবেই বা তার সমাধান হয়? উদাহরণ দাও।

৪. আধুনিককালে গৃহীত শব্দের বর্ণীকরণের সূত্র কি?

৫. বর্ণীকরণের ক্ষেত্রে হীনমন্যতা ও দাস্য মনোভাব কিভাবে কাজ করে?

গল্প-সংকলন

রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা

আমরা এই গল্পটিকে যে আটটি পর্বে বিভক্ত করে নিয়েছিলাম, এবার তার ৫-ম পর্বে এসে পৌঁছেছি। আমরা এই পর্বের নাম দিয়েছিলাম 'ষড়যন্ত্র ও মামলার সূচনা'। এই নামকরণ থেকেই এই পর্বের বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে। ১৩ এবং ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ নিয়ে এই পর্ব।

এখানকার কাহিনী কি? কাহিনীতে নবদ্বীপ এবং বরদাসুন্দরী পরস্পরের নামে কোর্টে উইল-জালের মামলা এনেছেন। মামলার অবস্থা কি? নবদ্বীপের পেশ করা উইলটিতে গুরুচরণের স্বাক্ষর স্পষ্ট (হবেই ত, তা যে নকল করা) আর তাতে কয়েকজন নিঃস্বার্থ স্বাক্ষীও পাওয়া গেছে। নিঃস্বার্থ কথাটা লক্ষ্য করবার মত। সত্যের খাতিরে অন্য লোক সাক্ষ্য দেবে এটাই ভাবা হয়। অথচ লোকে যায় অর্থের বিনিময়ে মিথ্যা প্রতিষ্ঠার জন্য। নবদ্বীপ যাদের সাক্ষ্য দিতে এনেছে, তারা যে প্রকৃত সাক্ষী নয়—তা আমরা জানি। কারণ গুরুচরনের মৃত্যুকালে এরা ছিল না।

আসল উইলের অবস্থা কি? মোটেই সুবিধাজনক নয়। তার উইলের সই একে বোঝা যায় না তায় উইলের সাক্ষী যে ব্যক্তি সে রামকানাই—নবদ্বীপের বাবা। অতএব এই সাক্ষ্যও যে বরদাসুন্দরীর বিপক্ষে তা—ভাবাই স্বাভাবিক।

এই অবস্থায় বরদাসুন্দরীকে আশ্বাস দিল, তারই এক পোষ্য মামাতো ভাই। সে কাজে কিছু করল বলে মনে হয় না। এমনি করে ষড়যন্ত্র ও মামলার সূচনা হল।

এই অংশের প্রশ্ন :—

১. নবদ্বীপ ও বরদাসুন্দরী পরস্পরের নামে কিসের অভিযোগ আনলেন। ২. ওরা দুজনে যে দুটি উইল বের করলেন, তার কোনটির অবস্থা কেমন? ৩. উভয় পক্ষের সাক্ষীর অবস্থা কেমন ছিল? ৪. 'তোমার ভাবনা নাই'। বক্তা কে? সে কাকে ভাবনা নেই বললে? ভাবনার কারণ কি? তা না থাকারই বা কি কারণ?

ষষ্ঠ পর্ব

রামকানাইয়ের প্রতিক্রিয়া

ষড়যন্ত্র বেশ করে পাকিয়ে নেবার পর নবদ্বীপের মা রামকানাইকে কাশী থেকে ডেকে পাঠালেন। রামকানাই অনুগতের মত এলেন। এরপর পঞ্চদশ অনুচ্ছেদের শেষাংশ থেকে সপ্তদশ অনুচ্ছেদের শেষ পর্যন্ত রামকানাই এবং তাঁর স্ত্রীর দাম্পত্য আলাপন। ঐ অংশে কাহিনী কিছু অগ্রসর হয়নি। তবে এর ভেতর দিয়ে রামকানাইয়ের সহ্য শক্তি এবং তাঁর স্ত্রীর বিচিত্র মানসিকতা ফুটে উঠেছে।

অষ্টাদশ অনুচ্ছেদ কাহিনীর পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। তাই অনুচ্ছেদেই প্রথম রামকানাই জানতে পারলেন তাঁর পুত্রের কীর্তির কথা—মামলার কথা। আদালত থেকে সাক্ষীর-সপিনা পেয়ে যখন হতবুদ্ধি রামকানাই ব্যাপারটা বুঝে

নিতে চেষ্টা করছেন এমন সময় নবদ্বীপের মা এসে কেঁদে পড়লেন।

বোঝাই যাচ্ছে যে এ কান্না সাজান। পূর্ব-পরিকল্পিত। রামকানাইয়ের চিন্তা-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে নিজেদের দিকে টেনে আনবার কৌশলমাত্র। তাই নবদ্বীপের মা রামকানাইকে বোঝাতে চাইলেন যে সব ষড়যন্ত্র বরদাসুন্দরীর। তিনি গুরুচরণের স্নেহ থেকে ত সোনার নবদ্বীপকে বঞ্চিত করেছেনই, এবার তাকে জেলে পাঠানরও ষড়যন্ত্র করেছেন।

দুই আকস্মিক ঘটনার আঘাতে রামকানাই খানিকক্ষণ হতবুদ্ধি হলেও, অল্প সময়েই তিনি প্রকৃত ঘটনা বুঝে নিলেন। তাঁর 'চক্ষুস্থির হইয়া গেল'। অর্থাৎ তিনি ভেবে হতভম্ব হয়ে গেলেন যে, তাঁরই পুত্র উইল জাল করে তাঁর জেঠিকে তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে এমন এক ষড়যন্ত্র করেছে? সত্যনিষ্ঠ রামকানাই তাই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তোরা এ কী সর্বনাশ করেছিস'।

এর উত্তরে নবদ্বীপের মায়ের কথাকটিও অনুধাবন যোগ্য। তিনি বললেন, 'কেন! এতে নবদ্বীপের দোষ কোথায়? সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে?' বটেই ত! জ্যাঠা দিতে চাক্ বা না চাক্, নবদ্বীপ যখন মনে মনে ভেবেছে ও সম্পত্তি তার হওয়া উচিত, তখন সে সম্পত্তি ত তারই। আর তা কি এক কথায় ছেড়ে দেওয়া যায়! তার জন্য উইল জাল, মিথ্যা সাক্ষী সাজান ইত্যাদি যা খুশী করা যেতে পারে। এতে নবদ্বীপের দোষ কোথায়! আদর্শ মা বটে! (১৯ অনুচ্ছেদ)

বিংশতিতম অনুচ্ছেদটি আসলে নবদ্বীপের মায়ের কথা। সে এরপর যে কথাগুলো বলল, রবীন্দ্রনাথ তাকে সাধু ভাষায় পরিণত করেছেন। চলতি ভাষায় সাজালে বোঝা যাবে কত কুৎসিত ভাষাতেই না বরদাসুন্দরীকে আপ্যায়ন করা হয়েছে। ওকে নবদ্বীপের মায়ের মুখের ভাষায় সাজালে হবে—

'কোত্থেকে এক চোখখাকী, ভাতারখাকী, আটকুড়ের ঝি উড়ে এসে জুড়ে বসবে, এ কোন ভদ্রবংশের সোনার ছেলে সহ্য করতে পারে! যদি মরণকালে কোন ডাকিনীর মন্তর তন্তরে কোন এক বিটলেবুদ্ধি জ্যাঠার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েই থাকে, তবে সোনার ভাইপো সে ভুল নিজে হাতে শুধরে নিলে এমন কি অন্যায় কাজ হয়!' (২০ অনুচ্ছেদ)

রামকানাইয়ের ওপর পুত্রের তর্জন-গর্জন এবং স্ত্রীর অশ্রু বিসর্জন চলতেই থাকল। রামকানাই কপালে করাঘাত করে চুপ করে রইল। বাইরে চলল অসহযোগ—রামকানাই আহার-পান ছেড়ে দিল, সে তার অন্তরে অন্তরে নিজেকে নিয়ে দ্বন্দ্বে ব্যস্ত হল। সে সত্যকে প্রকাশ করবে, না স্ত্রী-পুত্রকে খুশী করবে?

প্রশ্ন

১. কখন রামকানাইকে কাশী থেকে আসতে বলা হল? ঐ সময় আসতে বলার কারণ কি? আসবার পর রামকানাই এবং তার স্ত্রীর মধ্যে কথোপকথন কেমন হল?

২. আদালত থেকে সাক্ষীর সমিনা পাওয়ার পর রামকানাইয়ের অবস্থা কেমন হল? সে যখন বুঝতে চেষ্টা করছে, তখন কি ঘটল?

৩. 'এমন কি অন্যায় কার্য হয়!'—এ কথা কার? সে কাকে অন্যায় কাজ বলছে না? তাকে সত্যিই কি অন্যায় বলা যায়! কেন? এই বাক্য থেকে তার চরিত্র সম্বন্ধে কি ধারণা জন্মে?

৪. রামকানাই আহার ত্যাগ করলেন, জল পর্যন্ত গ্রহণ করলেন না—কেন?

সপ্তম পর্ব ● মকদ্দমার দিন ও রামকানাইয়ের সাক্ষ্যদান (২২-২৪

এবার কাহিনী আদালতে চলে এসেছে। ইতঃমধ্যে বরদাসুন্দরীর অন্যতম সাক্ষী তার মামাতো ভাই নবদ্বীপের ভয়ে এবং প্রলোভনে নবদ্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে গেছে। নবদ্বীপ যে জয়ী হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এমন সময় প্রায় দুইদিন নিরম্বু উপবাস করে রামকানাই এসে দাঁড়াল সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

২৩ সংখ্যক অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ সাক্ষী রামকানাই এবং ব্যারিস্টারের চিত্র এঁকেছেন। লক্ষ্য কর, রামকানাইকে এবারে 'বৃদ্ধ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৃদ্ধের বিশেষণ তিনটি। ১. অনাহারে মৃতপ্রায়, ২. শুষ্ক ওষ্ঠ, ৩. শুষ্ক রসনা। না খেয়ে আধমরা হয়ে আছে রামকানাই। ঠোঁট গেছে শুকিয়ে, জিভ-ও। শীর্ণ আঙ্গুল দিয়ে সে কাঠগড়া চেপে ধরেছে।

আর ব্যারিস্টার? তিনি আঙ্গুল বাঁকা করে যেমন গলার ভেতর থেকে আটকে যাওয়া জিনিস টেনে বার করা হয়, তেমনি কৌশলে অনেকদূর থেকে নানা প্রশ্নে তাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

২৪ নং অনুচ্ছেদে সত্যবাদী রামকানাই মূলসত্য প্রকাশ করে দিল। এই সত্য প্রকাশের জন্যই সে ছিল নিরম্বু উপবাসী, সে যেন নিজের সঙ্গে লড়াই করে জিতেছে। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, পুত্রের প্রতি মমতা এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তার সব দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়েই সত্য প্রকাশের আত্মিক সাহস অর্জন করেছে। তাই ব্যারিস্টারের ফাঁকা কৌশলের তোয়াক্কা না রেখে নিয়মের কোন জারিজুরি না মেনে, সে সহজ ভাষায় সত্যকে অনাবৃত করেছে।

প্রশ্ন

১. বরদাসুন্দরীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করছিল কে? সে শেষ পর্যন্ত কোন দিকে সাক্ষ্য দিল? কেন?

২. কি কি পদ্ধতিতে নবদ্বীপের জয় সুনিশ্চিত হল?

৩. সাক্ষীর কাঠগড়ায় উপস্থিত রামকানাইয়ের বর্ণনা দাও।

৪. চতুর ব্যারিস্টার কিভাবে জেরা শুরু করেছিল?

৫. রামকানাই কিভাবে কি সাক্ষী দিল?

অষ্টম পর্ব ● রামকানাইয়ের সাক্ষ্য সম্পর্কে নানাজনের ব্যাখ্যা ও পরিসমাপ্তি।

রামকানাই সত্যের খাতিরেই সত্য প্রকাশ করেছিল। কিন্তু তার এই কাজকে নানাজনে তাদের স্বার্থ-পুষ্ট দৃষ্টিতে নানা-ভাবে ব্যাখ্যা করলেন—

ব্যারিস্টার ভাবলেন, তাঁর জেরার কৌশলেই রামকানাই সত্য না বলে নিস্তার পায়নি। এর দ্বারা তাঁর ভ্রান্ত গর্ববোধ-ই (অহমিকা) প্রকাশ পেয়েছে।

বরদাসুন্দরীর মামাতো ভাই সাক্ষ্য দিয়েছিল নবদ্বীপের দিকে। এই বিশ্বাস-ঘাতক চরিত্রটি বরদাসুন্দরীর কাছে গিয়ে মিথ্যাকথা বলল। রামকানাইকে অসৎ বলে নিজেকে বড় বলে প্রতিষ্ঠা করল।

বরদাসুন্দরী জানতেন যে প্রকৃত উইল রামকানাই নিজে তার হাতে দিয়েছিল। অন্যান্য কাজেও রামকানাইকে তার না জানা থাকবার কথা নয়। তবু সে রামকানাইকে অবিশ্বাস করে বিশ্বাস করল তার মামাতো ভাইকে।

নবদ্বীপের বন্ধুরা বাস্তববাদী লোক। তারা ভাবল, সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে অনেকের বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায়। রামকানাইয়েরও তেমনি কিছু ঘটেছিল। তারা রামকানাইকে শহরের সেরা নির্বোধ বলে স্থির করল।

শেষ অনুচ্ছেদে রামকানাইয়ের মৃত্যু

বর্ণিত হয়েছে। ভালই হয়েছে। বেঁচে থাকলে ঘরে-বাইরে তাকে নির্যাতন ভোগ করতে হত। রামকানাই মরে বেঁচেছে। কিন্তু কিছু লোক বলতে লাগলেন এই মরা সাক্ষ্য দেওয়ার আগে হলে ভাল হত! লেখক তাদের নাম বলতে চাননি। তবে তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি যে নবদ্বীপের মা তা আমরা হলফ করে বলতে পারি।

প্রশ্ন

১. রামকানাইয়ের সাক্ষ্য সম্পর্কে ব্যারিস্টারের ধারণা বল। এর থেকে তার চরিত্র সম্পর্কে কি ধারণা জন্মে?

২. বরদাসুন্দরীর মামাতো ভাই গল্পে কোথায় কোথায় কি কি কাজ করেছে? তার চরিত্র সম্পর্কে তোমার ধারণা বল।

৩. নবদ্বীপের বন্ধুরা রামকানাই সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করে? এর থেকে তাদের সম্পর্কে তোমার কি ধারণা জন্মে?

৪. রামকানাইয়ের মৃত্যুর প্রয়োজন কি ছিল? কারা তার মৃত্যু আরও পূর্বে হোক ভেবেছে বলে তোমার ধারণা?

সমস্ত গল্প পড়ে আরও দুটি বিষয় সম্পর্কে তোমার ধারণা খাতায় লিখে রেখ।

১. এই গল্প পড়ে আমাদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে তোমার ধারণা।

২. রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা কতখানি?

পদার্থ বিদ্যার নবযুগ : চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ইলেকট্রন

এবারে আমরা আলোচ্য প্রবন্ধের **পঞ্চমপর্বে** (৭ম ও ৮ম অনুচ্ছেদ) এসে পৌঁছেছি। এই পর্বের নাম দেওয়া হয়েছে **'টমসনের পরীক্ষা'**। এই পর্বে অবশ্য টমসনের সঙ্গে মিলিকানের পরীক্ষাও বর্ণনা করা হয়েছে। তবে মিলিকান টমসনের সূত্র ধরেই এগুতে থাকলেন। এইজন্য আমরা সংক্ষেপে একে টমসনের পরীক্ষা বলে বর্ণনা করেছি।

এই পর্বে লেখক তিনটি মোটা কথা বলেছেন।

১. টমসনের পরীক্ষা
২. মিলিকানের পরীক্ষা
৩. কণিকাগুলোর নামকরণ।

১. ক্যাথোড-রশ্মিকে বিজ্ঞানীরা এক ধরনের কণিকা বলে গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু ঐ কণিকাগুলোর স্বভাবের আরও নিখুঁত পরিচয় জানা দরকার ছিল। এ বিষয় নিয়ে পরীক্ষা শুরু করলেন জে জে টমসন। তোমরা ভৌত বিজ্ঞান পাঠ পড়তে গিয়ে জেনেছ, বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রথম কথাই হল মাপজোক। আমরা আগেই জেনেছিলাম ক্যাথোড-রশ্মির কাছে চুম্বক বা তড়িৎযুক্ত পদার্থ আনলে তার পথ বেঁকে যায়। টমসন এর নিখুঁত মাপ কষলেন। ১. কতটা পরিমাণ বিদ্যুৎ কতখানি বাঁকায় তার পরিমাপ করলেন তিনি। ২. একটি কণিকার ভরের তুলনায় তার তড়িতের পরিমাণের একটা অনুপাত বের করলেন তিনি। এরপর তিনি অবাক হয়ে দেখলেন যে, যে ধাতুর তৈরি ক্যাথোডই ব্যবহার করা হোক আর ভেতরে যে গ্যাসই থাক—কণিকার ভর আর তড়িতের অনুপাতটা থাকে অপরিবর্তিত—অর্থাৎ নিত্য (constant).

আরও একটা কাজ করলেন টমসন। তিনি কণিকাগুলোর গতিবেগ নির্ণয়

করলেন। দেখা গেল তড়িত বিভব যত বাড়ান যায় ওদের গতি তত বাড়ে। রুম কর্ফের কুণ্ডলির মধ্য দিয়ে অল্প বিভবের বিদ্যুৎ পাঠিয়ে বেশি বিভবের বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। তাই রুমকর্ফের কুণ্ডলির মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের বিভব বাড়িয়ে কণিকা-গুলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে ১৬৮০০০ মাইল পর্যন্ত পাওয়া গেল। এই গতির তীব্রতা বুঝাতে লেখক তিনটি তুলনা এনেছেন :

১. আলোর গতি → সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল।

২. সাধারণ অবস্থার কণিকার গতি → সেকেণ্ডে ৫০০০ মাইল।

৩. বিভব বাড়ালে কণিকার গতি → সেকেণ্ডে ১৬৮০০০ মাইল।

এই অংশ থেকে প্রশ্ন দেওয়া যেতে পারে প্রধানত টমসনের পরীক্ষা সম্পর্কে এবং কণিকাগুলোর গতি সম্পর্কে তথ্যগুলো আগেই বর্ণনা করা হল। দেখ উত্তর তৈরি করতে পার কিনা!

১. জে. জে. টমসন ক্যাথোড রশ্মি সম্পর্কে কি কি তথ্য নির্ণয় করেন? ২. ক্যাথোড-রশ্মি কণিকার ভর ও তড়িতের অনুপাত সম্পর্কে কে গবেষণা করেন? তিনি কি তথ্য আবিষ্কার করেন? ৩. টমসন ক্যাথোড-রশ্মি কণিকার গতিবেগ সম্পর্কে কি কি তথ্য আবিষ্কার করেন? ৪. লেখক কোন কোন কণিকাকে অলস বলেছেন? এদের অলস বলবার কারণ কি?

২. মিলিকান টমসনের থেকেও এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। তাঁর পরীক্ষায় জানা গেল ঐ সব কণিকা কতটা বিদ্যুৎ ধারণ করে। এটা জানতে পারার ফলে কণিকার ভরও জানা গেল।

দেখ, টমসন কণিকাগুলোর ভর ও বিদ্যুতের অনুপাতটাই পেরেছিলেন, পৃথক পৃথকভাবে ভর ও তড়িতের পরিমাপ করতে পারেননি। এবার টমসনের ধ্রুবকে (constant) ঐ মান বসালেই ভরের পরিমাপ বেরিয়ে এল।

কিন্তু এই পরিমাপ কেমন? তোমরা ত জান, হাইড্রোজেন অ্যাটম হল সবচেয়ে হাল্কা। এই পরিমাণ বের হল, সেই সবচেয়ে হাল্কা অ্যাটমের ১৮৪৫ ভাগের একভাগ মাত্র।

এই অংশ থেকে প্রশ্ন হতে পারে :

১. মিলিকান ক্যাথোড-রশ্মি কণিকার কি বিষয়ে গবেষণা করেন? তাঁর গবেষণালব্ধ ফল কি?

২. টমসনের বক্তব্যের থেকে মিলিকানের বক্তব্য কোন দিক থেকে অগ্রসর হয়েছে?

৩. মিলিকানের মতে ক্যাথোড-রশ্মি কণিকার ভর কত?

৩. এবারে লেখক এই ক্যাথোড-রশ্মি কণিকার নামকরণ সম্পর্কে বলেছেন।

এই ক্যাথোড-রশ্মি কণাগুলোর নাম-করণ হয় ইলেকট্রন। বিদ্যুৎ পরিবহন করে বলেই এদের বিদ্যুৎ-কণা বা ইলেকট্রন বলা হল। কিন্তু ইলেকট্রন কথাটা এল ইলেকট্রিকসিটি থেকে। লেখক এই 'ইলেকট্রিসিটি' কথাটার উৎপত্তি বর্ণনা করেছেন এখানে।

তোমরা হয়ত দেখেছ কোন কোন চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াবার পর, ঐ চিরুনি চুল টেনে ধরে। কুচো কাগজের কাছে নিলে চুম্বকের মত টেনে নেয়। কাঁচকে সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘষলেও এমন ব্যাপার ঘটে। শুধু কাঁচ কেন, ইবোনাইট বা রবারের দণ্ডও এমন ক্ষমতা লাভ করতে পারে।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও আগে সম্ভবত ৬৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে গ্রীক দার্শনিক থেলস

(Thales) মিলিটস নগরে বসে প্রথম এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন। তিনি একটি অ্যাম্বার দণ্ডকে পশুলোম দিয়ে ঘষে দেখলেন যে, দণ্ডটি খুব হাল্কা বস্তুকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা লাভ করেছে।

এরপর বহু বছর কেটে গেল। রাণী এলিজাবেথের আমলে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের এক বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়ম গিলবার্ট নতুন করে এই ব্যাপারটি নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। থেল্‌স অ্যাম্বার দণ্ড ঘষে পরীক্ষা করেছিলেন। অ্যাম্বারকে গ্রীক ভাষায় ইলেকট্রন (electron) বলে। ইলেকট্রনে সঞ্জাত শক্তি বলে গিলবার্ট-এর নাম দিলেন 'ইলেকট্রিসিটি'—এবার ইলেকট্রিসিটির কণিকা বলে আবার ক্যাথোড-রশ্মিকণাগুলোর নাম হল ইলেকট্রন।

মিলিকান দেখলেন, যেখান থেকে যেভাবেই ইলেকট্রন তৈরি হোক না কেন, (অর্থাৎ ক্যাথোড যে ধাতুতেই তৈরি হোক বা ভেতরে যে গ্যাসই থাক) ইলেকট্রনের ভর থাকে সর্বদাই সমান।

প্রশ্ন

১. থেল্‌স কোন দেশের বিজ্ঞানী? তিনি কোন অব্দে কি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন?

২. গিলবার্টের পুরো নাম কি? তিনি কার রাজত্বে কোন সময়ে জীবিত ছিলেন? তাঁর গবেষণার বিষয় কি ছিল?

৩. ইলেকট্রিসিটি নাম কি কি ভাবে জন্মাল? কাকে ইলেকট্রন নাম দেওয়া হল?

ষষ্ঠ পর্ব ঃ ইলেকট্রন চিন্তায় বিপ্লব

৯ ম থেকে ১৩শ অনুচ্ছেদ।

এবার আমরা এই প্রবন্ধের শেষ পর্বে এসে পৌঁছেছি। এই পর্বে লেখকই ইলেকট্রন আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন দিকে যে যে পরিবর্তন দেখা দিল তারই কথা বর্ণনা করেছেন। পরিবর্তন খুবই মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ হলে তাকে বলা হয় বিপ্লব। ইলেকট্রন আবিষ্কারের পর যে পরিবর্তন ঘটল, লেখক তাকে মৌলিক বলেই গ্রহণ করেছেন। আর তাই একে বলেছেন বিপ্লব।

'বিজ্ঞানে এক বিপ্লব দেখা দিল।' বিপ্লব কথাটির তাৎপর্য কি? এখানে কাকে বিপ্লব বলা হয়েছে? বিপ্লব বলা ঠিক হয়েছে কি?

এই বিপ্লব যথেষ্ট মৌলিক কিনা, তার পরিচয় নেওয়া যাক। লেখক প্রথমেই ইলেকট্রন বিজ্ঞানের জগতে যে চিন্তাগত পরিবর্তন আনল তার কথা বলেছেন।

১. 'অ্যাটম' কথার অর্থ এবং অ্যাটম-চিন্তার মূলোচ্ছেদ ঘটাল ইলেকট্রন আবিষ্কার। আমরা এতদিন জানতাম অ্যাটম অবিভাজ্য। এখন প্রমাণ হল নেগেটিভ তড়িতযুক্ত ইলেকট্রন হচ্ছে অ্যাটমের একটা অংশ। তাহলে অ্যাটমকে যে অবিভাজ্য বলা হত—তা আর সত্য রইল না।

২. তড়িৎ-প্রবাহ কথাটার অর্থও গেল বদলে। এখন প্রমাণ হল ইলেকট্রনের স্রোতই হল তড়িৎ-প্রবাহ।

৩. তড়িতের পরিমাপে ইলেকট্রন গৃহীত হল। একটা ইলেকট্রনে যে পরিমাণ তড়িৎ থাকে, তাকে ধরা হল তড়িতের একক। কারণ, এর চেয়ে কম বিদ্যুৎ আর কোথাও থাকতে পারে না, আর যেখানে যে বিদ্যুৎ-ই থাকুক না কেন, সর্বত্র তা হবে সেই এক ইলেকট্রন বিদ্যুতের পরিমাণের গুণিতক।

ইলেকট্রন আবিষ্কারের পর পুরোন নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকে নতুন করে ব্যাখ্যা করতে হল, অনেক ক্রিয়ার

ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছিল না, এবার পাওয়া গেল।

১. থেল্‌স-এর পরীক্ষাকে নতুন করে ব্যাখ্যা করতে হল ঃ থেল্‌স একটুকরো অ্যাম্বারকে পশুলোম দিয়ে ঘষে, অ্যাম্বারকে আকর্ষণী শক্তি লক্ষ্য করেন। একে প্রাকৃতিক সত্য বলে গ্রহণ করেই গিলবার্ট তাঁর গবেষণা চালান। কেন হয় তা নিয়ে ওঁরা ব্যস্ত হননি। এবারে ব্যাপারটা বোঝা গেল।

অ্যাম্বার বা কাঁচকে পশুচর্ম বা রেশম বস্ত্র দিয়ে ঘষলে, অ্যাম্বার বা কাঁচ থেকে ইলেকট্রন চলে আসে পশুচর্ম বা রেশমে। আমরা জানি ইলেকট্রন নেগেটিভ তড়িৎ-যুক্ত। তাই পশুচর্ম বা রেশম হয়ে যায় নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত। উল্টো দিকে যে কাঁচ বা অ্যাম্বারে তড়িৎ ছিল না, তার থেকে কিছু নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রন চলে যাওয়ায় পজেটিভ তড়িৎযুক্ত হয়ে যায়।

২. ব্যাটারির প্রকৃত ব্যাখ্যা ঃ আমরা জানি, একটা কাঁচের পাত্রে সালফিউরিক অ্যাসিড রেখে, তাতে যদি একটা তামা আর একটা দস্তার পাত ডুবিয়ে দিই, এবং পাত দুটি তার দিয়ে যুক্ত করে দিই, তবে তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তড়িৎ যায় তামা থেকে দস্তায়।

ইলেকট্রন আবিষ্কারের পর প্রকৃত ব্যাপার বোঝা গেল। ঐ পরীক্ষায় তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলে না। আসলে তারের অ্যাটম থেকে অ্যাটমে সঞ্চালিত হয় ইলেকট্রন। আর ইলেকট্রনরা চলে দস্তা থেকে তামায়।

৩. এডিসন ক্রিয়ার তাৎপর্য ঃ 'এডিসন ক্রিয়া'টির কথা মনে কর। এডিসন লক্ষ্য করেছিলেন, মধ্যের ধাতব চাকতিযুক্ত তারের সঙ্গে বাইরের পজেটিভ দ্বারযুক্ত করলে ঐ বর্তনীতে ও (curcuit)

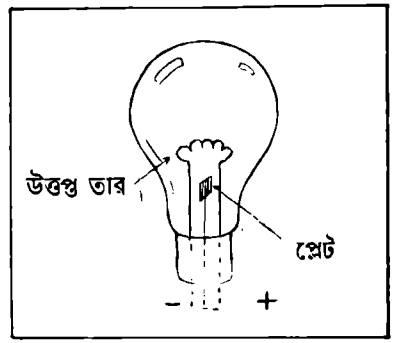

একটা ক্ষীণ তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু ছিন্ন বর্তনীতে তড়িৎ-স্রোত কেন? এ প্রশ্নের জবাব এডিসন দিতে পারেননি। একেই বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছিলেন 'এডিসন-ক্রিয়া।'

এখন, তুমি নিজে বুঝে নাও। মূল তার দুটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু বিদ্যুৎ-প্রবাহ মানে ত ইলেকট্রনের স্রোত। এখন, মাঝের চাকতিটি যদি নেগেটিভ তড়িৎ-যুক্ত হয়, তবে মূল ইলেকট্রন স্রোতকে সে আদৌ আকৃষ্ট করতে পারবে না। তাই মাঝের দণ্ড থেকে তার এনে নেগেটিভ দ্বারে যুক্ত করে এডিসন কোনও সাড়া পাননি। এবার যখন তিনি পজেটিভ দ্বারে যুক্ত করলেন, তখন চাকতিটি হল পজেটিভ তড়িৎ-যুক্ত। তার মূল বর্তনীতে ছুটে চলেছে নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত ইলেকট্রনের স্রোত। তাহলে নেগেটিভ ইলেকট্রনরা মাঝের পজেটিভ তড়িৎযুক্ত চাকতির দিকেও ছুটে চলবে।

শেষ অনুচ্ছেদে ইলেকট্রন সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা বলা হয়েছে। সে কথা কি?

প্রচণ্ড বেগযুক্ত কিছুটা নেগেটিভ তড়িৎ হল ইলেকট্রন। বেগই এর সত্তা। বস্তু বলে এর কোন পৃথক কিছু নেই। যদি কোন ক্রমে বেগকে স্তব্ধ করা যায় তবেই ইলেকট্রনের

অস্তিত্ব ধ্বংস হবে। কিন্তু সে বেগ ধারণ অসম্ভব ব্যাপার।

এই পর্ব থেকে প্রশ্ন হবে মূলত ইলেকট্রনের আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন সম্পর্কে। প্রশ্নগুলো লেখ :

১. ইলেকট্রনের আবিষ্কার কিভাবে অ্যাটম চিন্তার মূলোচ্ছেদ ঘটায় ?

২ তড়িৎ-প্রবাহ কথাটির অর্থ ইলেকট্রন-তত্ত্ব কিভাবে বদলে দেয় ?

৩. কেন তড়িতের পরিমাপে ইলেকট্রন গৃহীত হল ?

৪. কাঁচের দণ্ডকে রেশম বস্ত্রে ঘষলে কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তা ব্যাখ্যা কর।

৫. ব্যাটারির বিদ্যুৎ কিভাবে প্রবাহিত হয় — ইলেকট্রন-তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা কর।

৬ এডিসন ক্রিয়াকে ইলেকট্রন-তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা কর।

৭. ইলেকট্রন কি ? ইলেকট্রনের স্বরূপ কি ?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করবার পর, গোটা প্রবন্ধ কয়েকবার পড়বে এবং কেমন করে ধীরে ধীরে ইলেকট্রন সম্পর্কিত চিন্তায় উপনীত হলেন বিজ্ঞানীরা, তা ভাল করে বুঝে নেবে। সহজ ভাষায় সেই কথাগুলোকেই সাজিয়ে তোমাদের দেওয়াল পত্রিকার জন্য একটা প্রবন্ধ লিখে ফেল না।

নির্মল লাহিড়ী

নিয়মাবলী

যাঁরা লিখতে চান

- আমাদের পত্রিকা একান্তভাবে 'নবম-দশম' শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-সহায়ক রূপে পরিকল্পিত। এই উদ্দেশ্যের সমানুপাতিক রচনা আমাদের দপ্তরে সাদরে গৃহীত হবে। তবে কবিতা-গল্প আমাদের দপ্তরে পাঠাবেন না।
- শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, আগ্রহ ও কৌতূহল বৃদ্ধি ও মানসিক সজীবতা ও ক্রিয়াশীলতা প্রবর্ধক রচনা দপ্তরে সাগ্রহে গৃহীত হবে।
- সব রচনাই চলিত ভাষায় রচিত হওয়া প্রয়োজন। 'ফুলস্ক্যাপ' কাগজের একপৃষ্ঠে বাঁদিকে বড় মার্জিন রেখে কালো অথবা কোন গাঢ় কালিতে স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাবেন। কোন লেখাই ষোলশ শব্দের চেয়ে বড় হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সঙ্গে প্রয়োজনীয় ছবি, চার্ট ম্যাপ ইত্যাদি পাঠালে ভাল হয়।
- প্রেরিত রচনা সম্পাদনার অধিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের থাকবে। এ বিষয়ে আপত্তি থাকলে স্পষ্ট করে জানাবেন।
- কপি রেখে লেখা পাঠাবেন। আমাদের পক্ষে কোন লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে লেখা মনোনীত হলে সংবাদ দেওয়া হবে। লেখার সঙ্গে ডাকটিকিট পাঠাবার দরকার নেই।
- লেখার সঙ্গে সাদা কাগজে স্পষ্টাক্ষরে নিজ ঠিকানা তিনবার [একবার ইংরাজীতে] লিখে দেবেন।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা : সম্পাদক, নবম দশম, ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড। ৩৩, বিপ্লবী অনুকূল-চন্দ্র স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০ ০৭২।

দ্বিতীয় ভাষাঃ ইংরাজী

TEXT

'HOME THEY BROUGHT HER WARRIOR DEAD' কবিতার মূল গল্পটি তোমাদের গত পক্ষেই বলে দিয়েছি। এবার আমরা সোজাসুজি কবিতাটি পড়তে শুরু করব। লক্ষ্য কর, কবিতাটি খুব বড় নয়। মাত্র চারটি স্তবক (STANZA) এখানে আছে। অতএব কবিতাটি মুখস্থ করে ফেলা তোমাদের পক্ষে খুবই সহজ হবে। আমরা এখানে প্রতিটি স্তবককে আলাদা আলাদা ভাবে খুঁটিয়ে আলোচনা করব।

প্রথম স্তবকটি দেখ—

1. 'Home they brought···
···she will die.'

বাঙলায় এর অর্থ হল—

তারা তাঁর বীর স্বামীর মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে এল। তিনি (যোদ্ধার স্ত্রী) কিন্তু মূর্চ্ছা গেলেন না বা কেঁদেও উঠলেন না। এই দেখে তাঁর সব সহচরী বলল—'এ'কে কাঁদাতেই হবে, নতুবা ইনি মারা যাবেন।'

কয়েকটি শব্দ খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন—

They—যোদ্ধার বন্ধু ও অনুচরগণ; the friends and attendants of the warrior. **Her**—বলতে এখানে 'যোদ্ধার স্ত্রী'র; the warrior's wife's. **Swoon'd**—মূর্চ্ছা গেলেন, fainted. **Utter'd cry**—শব্দ করে কেঁদে উঠেছিলেন; wept loudly. **Maidens**—সহচরীরা; lady attendants. **Watching**—লক্ষ্য রাখতে রাখতে, looking at. **Weep**—কান্না, cry.

এবার কিছু ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর।

● **What did the warrior's wife do, when the warrior's dead body was brought home ?**

উঃ The dead warrior's wife was stunned with grief. Thus, even after seeing her husband's corpse, she neither fainted, nor wept.

● **Why did not the dead warrior's wife cry or swoon ?**

উঃ Excessive grief had overwhelmed the warrior's wife. The suddenness of her hnsband's death had paralysed her feelings. Thus she neither fainted nor cried.

● **What did the maidens plan to do ?**

উঃ The maids of the warrior's wife felt the necessity of giving her sorrow an outlet, otherwise she would die of that shock. So they planned

to make her weep, and thus, to lighten her bereaved heart.

2. Then they praised him ....neither spoke nor moved. (St. 2)

তখন তারা খুব কোমল ও নিচু স্বরে যোদ্ধার প্রশংসা করল ; বলল, তিনি ভালবাসার যোগ্যপাত্র, তিনি বিশ্বস্ততম বন্ধু ও উদারতম শত্রু। কিন্তু তবু যোদ্ধার স্ত্রী কথা বললেন না বা নড়লেন না।

কয়েকটি শব্দের মানে ও প্রয়োগ লক্ষ্য কর—

They—বলতে এখানে 'যোদ্ধার স্ত্রীর **সহচরীরা'** **the female attendants of the warrior's wife. Praised**—প্রশংসা করল, gave honour and glory. **Him**—বলতে 'যোদ্ধাকে', to the soldier. **Soft and low**—কোমল ও মৃদুস্বরে, in a tender and subdued voice. **Worthy**—যোগ্য, deserving. **Truest**—বিশ্বস্ততম, most loyal. **Noblest**—উদারতম, most generous. **Foe**—শত্রু, enemy. **Moved**—নড়লেন, changed her position.

এবার কিছু প্রশ্নোত্তর—

● **What did the maidens do ? Why did they do so ?**

উঃ The maidens, with a tender and gentle voice, praised and glorified the warrior.

They thought that the mentioning of her husband's virtues they would be able to solace the grief-stricken wife of the warrior, and in the process she might break down into tears.

● **What did they say about the warrior**

উঃ The maidens praised the warrior by describing him as the right person to be loved.; and, they added, he was always loyal to his friends and generous to his enemies.

● **What impact did those words have on the wife of the warrior ?**

উঃ Evidently, all the words of praise uttered by the maidens proved fruitless. The dead warrior's wife neither wept nor moved. Those words

ছবি এঁকেছেন : দ্বি. সাহা

failed to give any solace to her grief-stricken heart.

3. 'Stole a maiden
nor wept.' (St. 3)

একজন সহচরী নীরবে তার জায়গা ছেড়ে উঠে আস্তে আস্তে যোদ্ধার দেহের কাছে গেল এবং তার মুখ থেকে সরিয়ে দিল চাপা দেওয়া কাপড়টা। তবু তিনি একটুও নড়লেন না বা কাঁদলেন না।

কয়েকটি শব্দ লক্ষ্য কর—

Stole—সকলের অজান্তে উঠে গেল, went without being noticed. **Lightly**—ধীরে ধীরে, gently. **Stept**—পা ফেলে ফেলে গেল, moved by performing steps. **Took**—অর্থ এখানে 'সরিয়ে নিল', removed. **Face-cloth**—মুখঢাপা কাপড়, piece of cloth that covered the warrior's face. **Wept**—কাঁদলেন, cried.

এখন কয়েকটি প্রশ্নোত্তর—

● **What did the maiden do ? Why did she do such a thing ?**

উঃ A maiden got up noiselessly, and gently went near the warrior's corpse. Then she removed the cloth that had covered the warrior's face.

The maiden thought that the sight of the face of her living husband would evoke the memories of past love and affection into the widow's mind and she would break down into tears.

● **What happened to the widow when she saw her dead husband's face ?**

উঃ Even the sight of her dead husband's face could not bring tears into the eyes of the warrior's wife. She remained as unmoved as she had been before.

4. 'Rose a nurse·····I live for thee.' (St. 4)

নব্বই বছর বয়সের একজন ধাত্রী উঠে যোদ্ধার স্ত্রীর কোলে তাঁর ছেলেটিকে বসিয়ে দিতেই—গ্রীষ্মের ঝড়ের মত কান্না এল তাঁর চোখে। (তিনি বললেন), 'বাছা আমার, আমি তোমার জন্যই বেঁচে থাকব।'

কয়েকটি শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ লক্ষ্য কর—

Rose—আসন ছেড়ে উঠল, got up from her seat. **Nurse**—ধাত্রী, care-taker of a child. **Set**—বসিয়ে দেওয়া, placed. **Summer tempest**—কালবৈশাখী, sudden storm in the summer. **Knee**—কোল, lap. **Came her tears**—তিনি কেঁদে ফেললেন, her tears burst forth. **Sweet**—প্রিয়, beloved. **Thee**—এখানে 'শিশুটি', the child.

এখন কিছু ছোট প্রশ্নের উত্তর দেখে নাও—

● **What did the old nurse do ?**

উঃ The old nurse placed the warrior's child onto the lap of the dead warrior's wife.

● **What happened when the old nurse put the child on the widow's knee ?**

উঃ Seeing her child on

her knee, the widow suddenly burst into tears and said that she would be living henceforth only for the child.

● **Why did the widow burst forth into tears in the sight of her child ?**

উঃ The sudden death of her husband stunned the warrior's wife ; every charm in life, for her, seemed to be lost in abysmal grief. But the sight of her child revived the maternal feelings within her, and she realised that everything was not lost. The burden of her grief being lightened, she burst into tears.

কবিতাটির text পড়া আমাদের এখানেই শেষ। কবিতাটি থেকে যেসব বড় প্রশ্ন সাধারণত পরীক্ষায় আসে, এবং এর Lexical elements সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদি—এসব নিয়ে আমরা আলোচনা করব আগামীপক্ষে।

GRAMMAR

গত সংখ্যার আর্টিকল সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর—

1. ——, the. 2. ——, the, a. 3. ——, the. 4. the, —— , a. 5. a, a. 6. ——. 7. ——, the. 8. the, the, the, 9. the, a. 10. the, a, the, the.

PREPOSITIONS

মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে গেছে, এমন বড় কাউকে জিজ্ঞেস কর, Preposition বসানর প্রশ্নের জন্য সে কিভাবে তৈরী হয়েছিল ? প্রায় প্রত্যেকেই উত্তরটা এক দেবে—'একটা তালিকা মুখস্থ করতে হয়েছিল। তার শুরু ছিল Abide by, According to, In accordance with এবং সেটা ছিল প্রায় দশ-বার পৃষ্ঠা লম্বা। স্বাভাবিকভাবেই পরীক্ষার হলে গিয়ে তার দশ শতাংশও মনে ছিল না, এবং Preposition বসাতে হয়েছিল চোখ বুজে, না ভেবে, দৈবের ওপর নির্ভর করে।'

আমরা তোমাদের ওই ফালতু পদ্ধতি অনুসরণ করতে বলব না। Preposition-এর ক্ষেত্রে পুরো নম্বর তোলার সবচেয়ে নিশ্চিত অথচ সহজ পদ্ধতিটা হল—প্রতিটি Preposition-এর প্রয়োগ ও ব্যবহারটুকু বুঝে নেওয়া। এবং সেটা আদৌ কঠিন নয়।

PREPOSITION কি ? এগুলো হল কিছু ছোট ছোট শব্দ, যেমন, to, in, out, of, as far as ইত্যাদি, যারা একটি NOUN বা PRONOUN বা ing দিয়ে শেষ-হওয়া কোন VERB-form-এর আগে বসে এবং অনেক সময় সেটিকে পরিচালনা করে। এই উদাহরণগুলো দেখ—

Go **to** the door. Stay **in** your place. **Walk with** me **as far as** the main road.

Practise the prepositions by using them **in** context. অর্থাৎ Preposition-গুলোকে প্রথমেই দেখতে ও বুঝতে হবে, কোন নির্দিষ্ট অবস্থান বা গতির দিক নির্দেশকারী হিসেবে। তুমি

নিজে যেসব কাজ করছ বা তোমার চারপাশে যেসব ঘটনা ঘটতে তুমি দেখছ সেগুলো লক্ষ্য করলেই Prepositions-এর এই স্থানিক সম্পর্কের কথাটা তুমি বুঝতে পারবে। এছাড়া সময়গত সম্পর্ক দিয়ে Prepositionকে বিচার করা যায়—অথবা কিছু বস্তুনিরপেক্ষ (abstract) সম্পর্কের সাহায্যেও। এইভাবে দেখলে ও বিচার করলে, তোমরা সহজেই এই Preposition-গুলোর একটি স্বতন্ত্র অর্থ আবিষ্কার করতে পারবে—এবং এগুলোকে একটা নিয়মের মধ্যে বেঁধে ফেলতে পারবে। সম্পর্ক অনুযায়ী Preposition-গুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি—

1. স্থান সম্বন্ধীয় Preposition যেমন—at, in, out, near, over, ইত্যাদি।

2. কাল সম্বন্ধীয় Preposition যেমন, at, in, after, before, since ইত্যাদি।

3. অন্যান্য সম্পর্কযুক্ত Prepositions. যেমন—by, with, for, from ইত্যাদি।

স্থান সম্বন্ধীয় PREPOSITIONS

● ⟶ GO	TO	—ONTO	—INTO
Stop	AT	—ON	—IN
⟵ GO	FROM	—OFF	—OUT OF

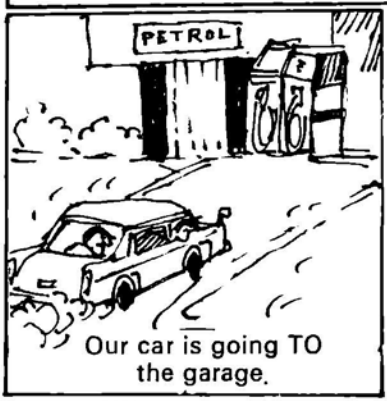

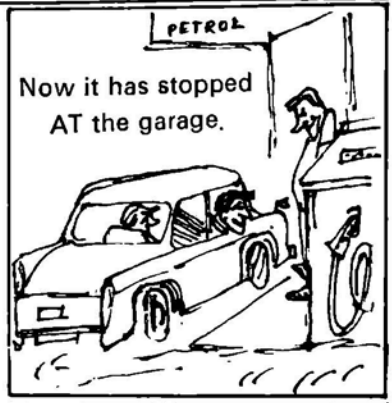

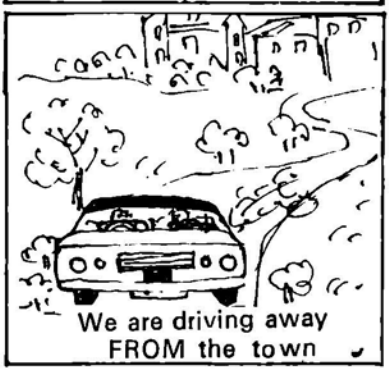

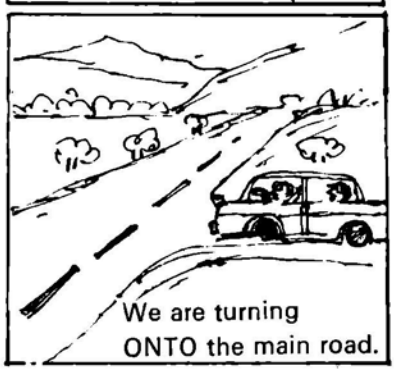

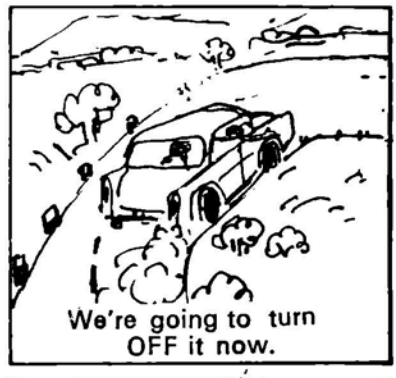

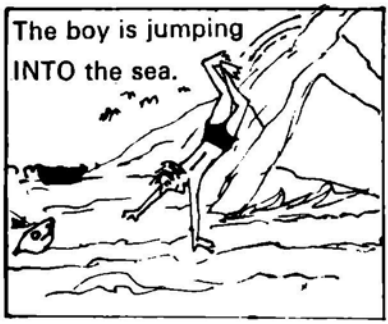

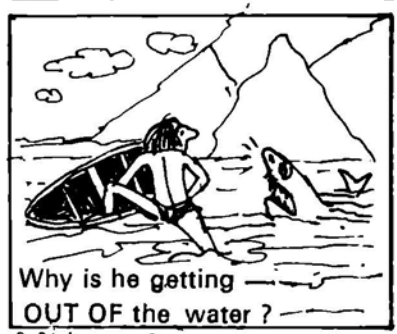

কল্পনা করে নাও, কোন একটা জিনিস চলছে, অন্য একটা জিনিস কাছে যাচ্ছে, বা তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ; অথবা একটা নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে থেমে আছে। এই 'অন্য একটি জিনিস'টা একটা 'বিন্দু' হতে পারে। অথবা কোন জায়গা, যার নির্দিষ্ট কোন দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা) আছে বলে আমরা ভাবিনি, অথবা হতে পারে 'এক-মাত্রিক' কিছু (একটা রেখা, একটা রাস্তা, একটা গলি, ইত্যাদি)। অথবা 'দ্বিমাত্রিক' কিছু জিনিস (একটা তল, একটা জমি, মেঝে, একটা টেবিলের উপরটা) অথবা 'ত্রিমাত্রিক' কিছু (একটা ঘনবস্তু, একটা ঘর, একটা বাড়ি, খানিকটা জল ইত্যাদি)।

ওপরের ছবি দেখে এগুলো মিলিয়ে নাও।

মনে রেখ—	বিন্দু	রেখা তল	ঘনবস্তু
অন্য একটি জিনিসের দিকে যাওয়া বোঝালে হয়	TO	ON TO	INTO
পৌঁছনর পর অবস্থান বোঝাতে বসে	AT	ON	IN
অন্য জিনিসটিকে ছেড়ে যাবার কথা বোঝালে হয়	AWAY FROM	OFF	OUTOF

FOR, TOWARDS, AS FAR AS

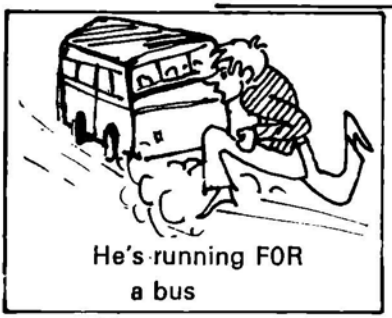

He's running FOR a bus

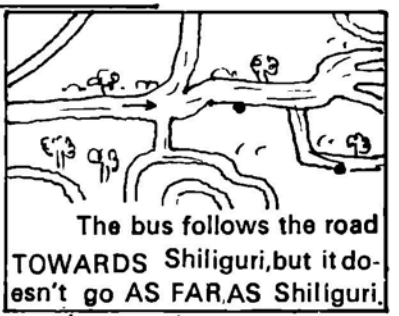

The bus follows the road TOWARDS Shiliguri, but it doesn't go AS FAR AS Shiliguri.

মনে রেখ— ● For ব্যবহৃত হয় কোন একটি কাজের উদ্দেশ্য বা গন্তব্যস্থল বোঝাতে। ● 'Towards Shiliguri' মানে 'শিলিগুড়ির দিকে' ; As Far As অর্থ 'ওই পর্যন্ত' (আর বেশি নয়)।

INSIDE

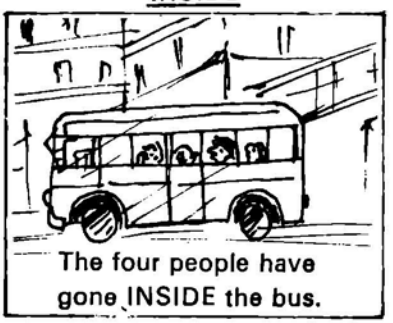

The four people have gone INSIDE the bus.

OUTSIDE

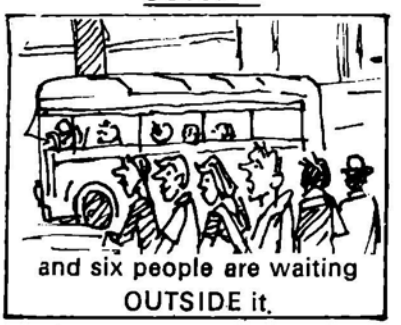

and six people are waiting OUTSIDE it.

● INSIDE বলতে বোঝায় ঘটনাটি ভিতরে ঘটছে, OUTSIDE বাইরে।

BY একটি বিন্দু

I passed BY her window

ALONG একটি রেখা

We're both walking ALONG, the path beside the stream.

THROUGH
একটি ঘনবস্তু

ACROSS
একটি রেখা তল

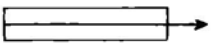

মনে রেখ—

- **BY** বোঝায় কোন একটি বিন্দু বা অবস্থানকে পেরিয়ে যাওয়া।
- **ACROSS** বোঝায় একটি রেখা বা তলের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে যাওয়াকে।
- **THROUGH** বোঝায় একটি ঘনবস্তুর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে যাওয়া।

WITH

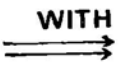

AGAINST

ROUND **BETWEEN**

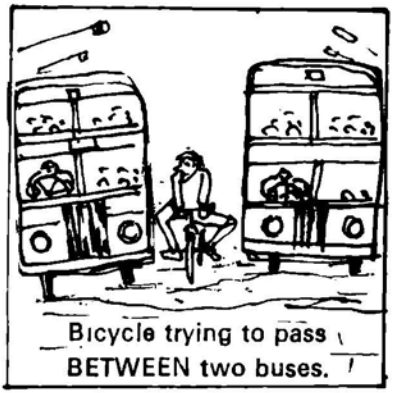

Athletes running ROUND the track.

Bicycle trying to pass BETWEEN two buses.

মনে রেখ—

- **WITH** দ্বারা কোন একটি ব্যক্তি বা বস্তু অন্যের সঙ্গে যাচ্ছে এরূপ বোঝায়।
- **BETWEEN** ব্যবহার করবে দুটি জিনিস, দুজন ব্যক্তি বা দল বোঝাতে ; কিন্তু দুই-এর বেশি হলেই বসাবে **AMONG**.

UP **DOWN**

Fat man climbing UP a hill.

Fat man DOWN it in no time.

OVER

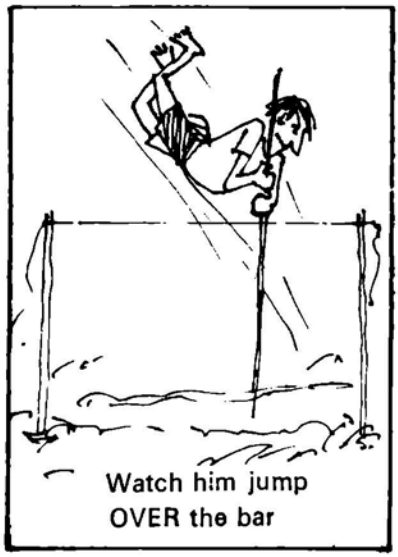

Watch him jump
OVER the bar

UNDER

I'm UNDER. the umbrella.

মনে রেখ—

- **OVER** something— মানে কোন কিছুকে ঢাকা দেওয়া বা কিছুর ওপর দিয়ে অন্যদিকে পৌঁছন।
- **UNDER** sometihig—মানে 'কোন কিছুতে ঢাকা পড়ে থাকা'।

এইগুলিই হল মোটামুটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত স্থান সম্বন্ধীয় prepositions. প্রয়োগগুলো তোমরা বুঝে বুঝে মনে রাখার চেষ্টা কর।

PREPOSITION-এর বাকি দুটি বিভাগ, অর্থাৎ কাল সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য সম্পর্কযুক্ত Prepositions —নিয়ে আমরা আগামী সংখ্যায় আলোচনা করব।

TRANSLATION

গত কয়েকটি সংখ্যায় আমরা বিভিন্ন TENSE-এর আকার ও প্রয়োগ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। আমাদের এবারকার আলোচনা SEQUENCE OF TENSES নিয়ে। বাঙলা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদের ক্ষেত্রে এর নিয়মগুলো মনে রাখা ভীষণ জরুরী।

কিন্তু এই আলোচনায় যাবার আগে তোমাদের মনে যেন CLAUSE কাকে বলে, কি কি ধরনের CLAUSE হয় সে সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকে। ইতিমধ্যেই TRANSFORMATION OF SENTENCES করতে শেখানর সময় PRINCIPAL CLAUSE, SUBORDINATE CLAUSE ইত্যাদি কাকে বলে বলেছি। তবু তোমাদের সুবিধার জন্যে CLAUSES নিয়ে আর একবার আলোচনা করে নেওয়া যাক।

CLAUSES

নিচের বাক্যগুলোতে যে সব শব্দগুচ্ছ

underline করা আছে, লক্ষ্য কর—

1. I know **he is my teacher**
2. This is the school **where we learn.**
3. I met my friend **when I went out.**

1. এখানে 'he is my teacher' একটি শব্দগুচ্ছ। যার মধ্যে আছে একটি উদ্দেশ্য (he) এবং একটি বিধেয় (is).

2. এখানে 'where we learn'এ 'we' হল উদ্দেশ্য ও 'learn' বিধেয়।

3. 'When I went out'-এর মধ্যে 'I' উদ্দেশ্য এবং 'went' বিধেয়। এইসব শব্দগুচ্ছকেই বলে CLAUSES.

এবার এই বাক্যগুলো দেখ :

1. He said / **that he did it.**
2. This is the cow/**which gives six litres of milk daily.**
3. I shall do it / **when it pleases me.**

প্রথম বাক্যটির দ্বিতীয় অংশটি একটি **NOUN-এর কাজ করছে।** এটির নিজস্ব একটি উদ্দেশ্য ও বিধেয় আছে। 'what did he say ?' এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে এটি।

দ্বিতীয় বাক্যটির দ্বিতীয় অংশটি **কাজ করছে একটি ADJECTIVE-এর।** Noun 'Cow'কে এটি বর্ণনা করছে।

একটি শব্দগুচ্ছ, যা আরও বড় একটা বাক্যের অংশ, এবং যার নিজস্ব একটা উদ্দেশ্য ও বিধেয় আছে, তাকেই একটি Clause বলা হয়।

এবার নিচের বাক্যগুলো ভালভাবে লক্ষ্য কর :

1. I went to the shop **and** bought a knife.
2. He wanted to drink water **but** he could not get it.
3. Work hard **or** you will fail.

উপরের প্রত্যেকটি বাক্যেই দুটি করে clause আছে। এগুলো and, but, or ইত্যাদি CO-ORDINATING CONJUNCTION দ্বারা যুক্ত। এই প্রত্যেকটি clause-কে বলে PRINCIPAL অথবা MAIN CLAUSE.

এটিরও একটি নিজস্ব উদ্দেশ্য ও বিধেয় আছে।

তৃতীয় বাক্যটির দ্বিতীয় অংশটি একটি **ADVERB-এর কাজ করছে।** এটি verb 'shall do'-কে নিয়ন্ত্রণ করছে। এটির নিজস্ব একটি উদ্দেশ্য ও বিধেয় আছে।

এই তিন ধরনের clause-কে বলে SUBORDINATE CLAUSES.

Subordinate clause তিন ধরনের হয়।

1. Noun clause, 2. Adjective clause, এবং 3. Adverbial clause উদাহরণ তোমরা এইমাত্র দেখেছ।

Principal clause হল একটি বড় বাক্যের অংশ, যার নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ আছে এবং যাকে আলাদাভাবে একটি Simple Sentence হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

একটি Subordinate Clause একটি Complex বা Compound Sentence-এর অংশ। যেহেতু এর নিজস্ব সম্পূর্ণ অর্থ নেই, অতএব এটিকে আলাদাভাবে ব্যবহার করা যায় না। এটি সবসময় অন্য কোন clause-এর সাথে ব্যবহৃত হয় এবং অর্থটিকে সম্পূর্ণ করার জন্য এটি অন্য clause-টির ওপর নির্ভরশীল হয়। এটি শুরু হয় কোন Relative Pronoun অথবা Relative Adverb দিয়ে। Subordinate Clauseগুলি সবসময়ই তাদের সম্পূর্ণ অর্থের জন্য Principal Clause-এর ওপর নির্ভর করে থাকে।

এইসব SUBORDINATE CLAUSE গুলোতে কি TENSE-এর ব্যবহার হবে, তাও নির্ভর করে PRINCIPAL CLAUSE-এর VERB-টি কি TENSE-এ আছে তার ওপর। যেমন, MAIN CLAUSEটি যদি PAST TENSE-এ থাকে, তবে SUBORDINATE CLAUSE-টিও Past tense-এ হবে। এবং একেই আমরা বলছি 'SEQUENCE OF TENSES'.

SEQUENCE OF TENSES

মনে রেখ, বাঙলা ব্যাকরণে Sequence of tense নিয়ে বিশেষ কোন কড়াকড়ি নেই। 'আমি ভেবেছিলাম যে সে আসবে'। তুমি অনায়াসেই লিখতে পার। কিন্তু এর ইংরাজি অনুবাদ যদি তুমি কর 'I thought that he will come', তবে কিন্তু ভুল হবে। আগেই বলেছি main clause-এ past tense থাকলে Subordinate clause-ও হবে past tense-এ। অতএব ঠিকটা হল—'I thought that he would come', অতএব বুঝতে পারছ, ইংরাজীতে অনুবাদের ক্ষেত্রে Sequence of tense-এর নিয়মগুলো জানা থাকা কত জরুরি!

এবার নিচের বাক্যগুলো দেখ—

1. ঘণ্টা পড়লে আমরা লিখতে শুরু করি—**We begin** to write **when** the bell **rings**.

2. গত সপ্তাহে অতবড় চিঠিটা যে তুমি আমায় লিখেছিলে, সেজন্য ধন্যবাদ—**I thank** you for the long letter you **wrote** to me last week.

3. ওর যে কি হবে ভগবানই জানেন!—God **knows** what will become of him!

এখানে দেখ, Principal clause-এ present tense বসা সত্ত্বেও **(begin, thank, knows)** Subordinate clause-এ Present, Past, Future তিনরকম Tense-এরই ব্যবহার হয়েছে। অতএব তোমরা শিখলে—

Principal Clause-এর Verbটি যদি Present Tense-এ হয়, তবে Subordinate Clause-এর Verbটি অর্থানুযায়ী যে কোন Tense-এ হতে পারে।

এবার এই বাক্যগুলি লক্ষ্য কর—

1. তুমি এরকম কথা বলেছ আমি কোনদিন বিশ্বাস করব না—I **shall** never **believe** you **said** such a thing.

2 সে আসা পর্যন্ত আমি এখানে

অপেক্ষা করব—I **shall wait here** until he **comes.**

এখানে Principal clause-এর verbটি Future tense-এ আছে, কিন্তু Subordinate clause-এ ব্যবহৃত হয়েছে Present, Past অর্থাৎ—

Principal Clause-এর Verbটি যদি Future Tense-এ থাকে, তবে Subordinate Clauseটি অর্থানুসারে যে কোন Tense-এ হতে পারে।

এখন দেখ নীচের এই বাক্যগুলো

1 এত গরম পড়েছিল যে আমি ঘুমোতে পারিনি—**It was** so hot **I couldn't** sleep.

2. আমি ভেবেছিলাম তুমি উত্তরটা জান- I **thought** you **knew** the answer.

3. যতটা ভাল লাগল তারা খেল- They **ate** as much as they **liked.**

এখানে কিন্তু PRINCIPAL clause-এ যেহেতু past tense, অতএব subordinate clause-এও past tense বসেছে। আগেই বলেছি ত

verb Past tense-এ, তবে Subordinate clause-এ Present tense **(moves, doesn't like)** বসল কিভাবে মনে রেখ—

যদি Subordinate clause-এ এমন কিছু বলা হয় যা চিরসত্য বা অভ্যাস-সম্বন্ধীয়, তবে Principal clause-এর verb-টি Past tense-এ থাকলেও Subordinate clause-এর verb-টি Present tense-এ হবে।

এবার এই বাক্যগুলো দেখ—

1 যে ঘোড়াটায় চড়ছি, এটা একবছর আগে কিনেছিলাম—I **bought** an year ago the horse, which I **am riding.**

2. এত বোকা, তবু সে ও পরীক্ষায় পাস করে গেছে—He, who is so stupid, passed the examination.

এখানেও Principal clause-এ

Principal Clause-এ যদি Past Tense থাকে, তবে Subordinate Clause-এর Verbটিও Past Tense-এই হবে।

নিচের বাক্যগুলো দেখ এবার—

1. গ্যালিলিও প্রমাণ করেছিলেন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে- Galileo **proved** that the Earth **moves** round the Sun.

2. তিনি আমাদের বলেছিলেন যে মিথ্যা কথা যারা বলে তাদের তিনি পছন্দ করেন না He **told** us that he **doesn't like** those who tell lies.

এখানে Principal clause-এর Past tense থাকা সত্ত্বেও, Subordinate clause-এ Present tense -অথচ চিরসত্য বা অভ্যাসের কথা ত নেই! মনে রেখ—

যে সব clause-এ ঘটনার সময় Principal clause-এর ওপর নির্ভর করে না, সেখানেও Main clause-এ Past tense থাকলেও, Subordinate clause-এ Present tense হতে পারে।

এবার এগুলো দেখ—

1. সে আমার চেয়ে ভাল কবিতা আবৃত্তি করত—He **used to recite** better than I **do.**

2. যতখানি ভেবেছিলাম, তার চেয়ে কম দুঃখই পেলাম—I **was less shocked** than I **had expected.**

3. আমি এখন যেমন করি, সে তখনই সেরকম আবৃত্তি করত—He **used to recite** as well as I do now.

মনে রেখ—

Subordinate clause-এ 'Than' অথবা 'As' শব্দটি থাকলে অর্থ অনুযায়ী Subordinate clause-এর verb যে কোন tense এ হতে পারে।

নিয়মগুলো বারবার পড়, উদাহরণগুলো মিলিয়ে নাও, এবং ইতোমধ্যে তোমার করা বাঙলা থেকে ইংরাজী অনুবাদে এই নিয়মগুলো ঠিক ঠিক মেনে চলেছ কিনা লক্ষ্য কর। ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল যেন আর না হয়।

COMPOSITION

PARAGRAPH-WRITING

Paragraph সম্বন্ধে গত পক্ষের বিস্তারিত আলোচনাটি থেকেই আমরা পেয়ে যাচ্ছি—একটি আদর্শ Paragraph-এর আপন বৈশিষ্ট্যগুলো। যা হল—

ক. একটি Paragraph আর মূল বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করবে। যতক্ষণ তা সম্পূর্ণ না হচ্ছে, ততক্ষণ নতুন নতুন তথ্যাদি যোগ করে যেতে হবে। Paragraph-টি ভাল করার জন্য 1. উদাহরণ, 2. খুঁটিনাটি তথ্য, 3. কার্যকারণের ব্যাখ্যা, 4. বৈপরীত্য, 5. তুলনা, 6. বিষয়টির পুনরাবৃত্তি প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে।

খ. একটি Paragraph যেহেতু একটিমাত্রই মূল Topic-কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, Paragraph-এর প্রতিটি বাক্যকে অতএব ওই মূল বিষয়টির সাথে জড়িত হতে হবে। যে জিনিসগুলো তোমায় সবসময় এড়াতে হবে—

১. অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা।

২. যে বিষয়বস্তু দু-তিনটি Paragraph-এ যাওয়া উচিত, সেটিকে জোর করে একটি Paragraph-এর অন্তর্ভুক্ত করা।

গ. Paragraph-এর প্রতিটি বাক্যকেই ক্রম-অনুযায়ী যুক্তিপূর্ণভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত হতে হবে, যাতে পুরো Paragraph-টিই বেশ সুসংবদ্ধ হয়। বাক্যগুলো একে অপরকে যেন স্বাভাবিক পরম্পরায় অনুসরণ করে। এই পরম্পরাগুলো হল ১. সময়ের পরম্পরা; ২. কার্যকারণের পরম্পরা ৩. একটি General Statement-কে কিছু উদাহরণ ও প্রমাণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা অথবা, ৪. অনেকগুলো বাক্য, সবকটিই বিষয়টির কোন একটি বিশেষ দিকের সাথে যুক্ত, একটি পরম্পরার সাহায্যে সিদ্ধান্তের দিকে এগোতে পারে। সেক্ষেত্রে শেষ বাক্যটি তোমার মূল বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করবে। একেই বলা হয় CLIMAX. এই ধরনের বিভিন্ন পরম্পরার আলাদা আলাদা উদাহরণ তোমরা পরে বিভিন্ন ধরনের Paragraph লেখার অভ্যাস করার সময় আরও দেখতে পাবে।

ঘ. Paragraph-এর প্রতিটি বাক্যই যেন পরস্পর পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়।

এগুলো যুক্ত করা যেতে পারে—

১. CONJUNCTIONS (যেমন and, or, but, as well as ইত্যাদি), RELATIVE PRONOUNS (যেমন, who, whom, that, as ইত্যাদি), RELATIVE ADVERBS (যেমন, where, why, when) অথবা অনুরূপ সংযোগরক্ষাকারী শব্দ দিয়ে।

২. আগের বাক্যের কোন শব্দ বা Phrase পরের বাক্যটিতে পুনরাবৃত্ত করে।

৩. বাক্যের মধ্যে Subject, Verb প্রভৃতির অবস্থান মাঝে মাঝে বদল করে—শব্দগুলোকে বিভিন্ন কায়দায় সাজিয়ে। এবং সর্বোপরি, লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে যুক্তি বা ঘটনার ক্রমানুযায়ী বাক্যগুলো পরপর থাকে।

৪. অধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণগুলোর চাইতে বেশি জোর দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে।

৫. Paragraph-এর শুরুটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। যদি Paragraph-এর মূল ভাবটি প্রথম বাক্যটিতেই বলে দেওয়া যায় (Topic Sentence), তবে Paragraph-টি ভাল হয়।

৬. Paragraph-টিকে অবশ্যই নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের মধ্যে হতে হবে।

Paragraph লেখার সময় তোমরা এই নিয়মগুলো যথাসম্ভব মেনে চলার চেষ্টা করবে।

এখন দেখ, নবম শ্রেণীর তোমাদের কয়েকজন সহপাঠীকে বলা হয়েছিল 'A DREAM' এই বিষয়টির ওপর একটি Paragraph লিখতে—অর্থাৎ তোমার দেখা একটি স্বপ্নের বিবরণ। বিষয়টা দারুণ, না?

তাদের মধ্যে একজনের লেখা Paragraph সামান্য কিছু সংশোধন করে নিচে দেওয়া হল—

A DREAM

A few weeks ago I dreamed a very unusual dream. I dreamed that I was walking along a street and all the friends I had ever known were walking behind me. I was leading them and telling jokes and singing. I thought that the other people in the street would be angry, but they started to laugh and to clap. Later we all went into a big hotel and I stood up and made a speech. At this point all my friends became angry and started to chase me. I ran up and up flights of stairs and at the top came a door which was locked. I felt very afraid and thought they would catch me. Just then I woke up.

এটিকে মোটামুটি একটি ভাল Paragraph বলা যেতে পারে। দেখ এখানে স্বপ্নটির সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে—এবং এমন কোন বাক্য ব্যবহার করা হয়নি যা এই বিষয়টির সাথে যুক্ত নয়। ঘটনা এবং সময়ের পরম্পরাও মেনে চলা হয়েছে পুরোপুরি। And, but, at this point প্রভৃতি সংযোগরক্ষাকারী শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত এবং প্রতিটি বাক্যই একে অপরের সাথে কোন না কোন ভাবে যুক্ত।

Paragraph-টির প্রথম বাক্যটি এখানে TOPIC SENTENCE, কেন না এর মধ্যেই বলা হয়েছে Paragraph-টির

বিষয়বস্তু। এর পরের প্রতিটি বাক্য এই **প্রথম** বাক্যটিকেই ব্যাখ্যা করেছে—এবং আস্তে আস্তে এগিয়েছে ঘটনার অন্তিমপর্ব Climax-এর দিকে, যেখানে লেখক সিঁড়ির মাথায় উঠে দেখতে পেয়েছে দরজা তালাবন্ধ! Paragraph-টির শেষ বাক্য 'Just then I woke up' বিষয়বস্তু ও পরম্পরা অনুযায়ী একটি সুন্দর Conclusion.

দেখেশুনে কি তোমারও ইচ্ছে করছে না তোমার দেখা একটি স্বপ্নের কথা লিখে ফেলার ?

যাই হোক, এবার তোমায় নিজেকে **একটি Paragraph** লিখতে হবে। এই বিষয়টিও খুব মজার—**An Unhappy First Visit.**

ধর, স্কুলে তোমার প্রথমদিন, বা কোন হাসপাতালে তোমার প্রথম যাওয়া, বা যে কোন জায়গা বা যে কারুর বাড়িতে যাওয়া—যেটা তোমার একদম ভাল লাগেনি। সেই Visit-টা নিয়েই লিখতে হবে একটা Paragraph, ১২০টি শব্দের মধ্যে।

প্রথমে ভেবে নাও তুমি কি নিয়ে লিখবে—স্কুলে প্রথমদিন, না হাসপাতালে, অথবা অন্য কোথাও। তারপর মুখে মুখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও—

1. How old were you when you first went to x's house / school /a cinema / the doctor / hospital/

উত্তর—যেমন, I was ten years old when I first went to a cinema.

2. Did you go alone or with someone ?

যেমন, I went to the cinema with my mother.

3. Did you feel afraid, unhappy/ frightened/ terrified/ nervous/ shy/ when you went to...?

উত্তর—যেমন, When I went to the cinema, I felt afraid.

4. I was most frightened by the darkness/ the huge building/ the strange faces/ the medical instruments(etc.)

5. When the lights went out I sat in the dentists chair/ I entered the school (etc.) I felt very.....

যেমন—When I entered the library, I felt very nervous.

6. What happened next ? Then I looked for my friend's house /
was given an anaesthetic/
was given an injection /
shut my eyes.

7. What happened after that ?
(একটি উত্তর বাছ)
I watched the rest of the film in silence.
I began to enjoy the film.
I got lost.
(অথবা তোমার ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল)

এবার এই উত্তরগুলো একত্র করে, ক্রম-অনুযায়ী সাজিয়ে পরস্পর যুক্ত করে দিলেই দেখবে সুন্দর একটি PARAGRAPH হয়ে গেছে। লিখে দেখ।

এই বিষয়টির ওপর লেখা একটি নমুনা PARAGRAPH আগামী পক্ষে থাকবে।

DISCUSSION

ভেবেছিলাম, প্রথম পক্ষের DISCUSSION অংশেই tense সংক্রান্ত একটি প্রাথমিক ভুল, যা তোমরা হামেশাই করে থাক, সেই Simple Present ও Present continuous tense-এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করে দেব। প্রথম পক্ষের LESSON এমনিতেই খুব বড় হয়ে যাওয়ায় শেষ অব্দি ওই অংশটুকু ছেঁটে বাদ দিতে হয়। অথচ দ্বিতীয় পক্ষে continuous tense সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়, তাই বাদ দিয়ে দেওয়া অংশটুকুর সম্বন্ধেও আমরা উল্লেখ করেছি। তোমরা অনেকেই চিঠি লিখে এই ত্রুটির কথা জানিয়েছ। আমি সত্যিই দুঃখিত, তোমাদের সুবিধার জন্য সেই তুলে রাখা আলোচনাটুকু আমরা এখন করছি।

SIMPLE PRESENT ও PRESENT Continuous Tense-এর আকার কিরকম হয়, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। যেমন,

1. Simple Present—He **goes** to school everyday.
2. Present Continuous—He **is walking** to school now.

মনে রেখ, Simple Present tense ব্যবহার করবে দুটি ক্ষেত্র বাদ দিয়ে। এগুলো হল—

ক. যদি কাজটা বেশিক্ষণ ধরে না চলে, অর্থাৎ তুমি ভাব যে কাজটা খুব শিগগিরই শেষ হয়ে যাবে ; যেমন **I am eating** my dinner. এবং

খ. যদি তুমি ভবিষ্যতের কথা ভেবে কথাটি বলে থাক যেমন, He is going to cinema tomorrow.

অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে তুমি এমন একটা ঘটনার কথা বলছ যা তোমার বলা বা লেখার সময়ই ঘটছে—এবং যেটা বেশিক্ষণ ধরে চলবেও না—সেক্ষেত্রে তোমায় Simple Present-এর বদলে Present Continuous ব্যবহার করতে হবে।

এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু **কিছু কিছু Verb আছে যাদের সঙ্গে Present Continuous form ব্যবহার করা যায় না।** এদের মধ্যে প্রধান হল 'to have' যার মানে to possess, to own, to suffer from (an illness) অথবা 'to feel (pain)'.

যেমন, যদি লেখ 'I am having a cold now' অথবা 'She is having my book now' ভুল হবে ; তোমায় বলতে হবে, 'I have a cold now', 'She has my book now.'

কিন্তু যদি ভবিষ্যৎ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে কিন্তু 'to have এ continuous form হবে। যেমন, 'I am having a new bicycle next week.'

এছাড়া আরও কিছু Verb-এ Present Continuous হয় না, এইসব VERB হল, **'এমন সব কাজ যা করতে কোন পরিশ্রম হয় না।'** দেখ–

১. যেসব VERB ইচ্ছা বা পছন্দ বোঝায়, যেমন, want, wish, desire, need, like, love, adore, care, prefer, dislike, detest, hate. একটা উদাহরণ দেখ—

Now I **hate** him and **like** her.

দেখ এই Love / hate করার জন্য তোমায় পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। চুপচাপ বসে বসেই তুমি যাকে খুশি এগুলো করতে

পার। অতএব Continuous এখানে হবে না।

২. কিছু VERB যার দ্বারা দ্বিধা বা অবিশ্বাস বোঝায় : think, believe, understand, mean, know, doubt, suppose.

উদাহরণ দেখ—

Now I **know** him and **think** he is honest.

কিন্তু যখন তুমি সত্যিকারের পরিশ্রম করবে, তখন কিন্তু Present Continuous tense ব্যবহৃত হবে। যেমন—

We **are thinking** about your plan.

তাহলে তোমরা বুঝতে পারলে, কোন কোন ক্ষেত্রে SIMPLE Present ও কোথায় Present Continuous tense ব্যবহার করতে হয়।

ইতোমধ্যে তোমাদের লেখা অজস্র চিঠি আমাদের দপ্তরে এসে জমে আছে। আগামী সংখ্যার DISCUSSION অংশে তারই কয়েকটির উত্তর দেব।

অতনু রায়

'ইংরাজী ভাষার ডিকসনারী'

আট বছর পরিশ্রম করার পর ডঃ স্যামুয়েল জনসন প্রথম ইংরাজী ডিকসনারী তৈরী করেন। এটিই প্রথম ইংরাজী ডেকসনারী। প্রকাশ পায় ১৭৫৫ সালে। স. মু.

দশের এক

মেডিক্যাল কলেজ হস্‌পিটাল-এর বিপরীতে কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে আরপুলি লেন-এর একটি দোতলা বাড়ি। বাড়িটা আজ জরাজীর্ণ, প্রায়-পরিত্যক্ত। অথচ এমন একদিন ছিল, যেদিন এ-বাড়িতেই বাঙলা সাহিত্যের তা-বড় তা-বড় খ্যাতিমান মানুষের পদার্পণ ঘটত। বাঙলা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের স্বনামধন্য গুণীজন যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও যেমন ছিলেন, আসতেন শরৎচন্দ্র, সত্যেন দত্ত, উপেন গাঙ্গুলী, কালিদাস রায় এঁরাও। ···একদিন সর্বজনীন পবিত্রদা (গঙ্গোপাধ্যায়) সঙ্গে করে নিয়ে এলেন চমৎকার একটি কবি-কবি চেহারার দামাল যুবককে। বাড়ির মালিক কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন পবিত্রদা—নাম কাজী নজরুল ইসলাম। যতীন বাগচী নজরুলকে বুকে জড়িয়ে বললেন—আবার এসো। ঠিকানাটা মনে থাকবে ত ?

নজরুল বললেন, নিশ্চয়ই আসব। আর ঠিকানা—আপনি বাঙলা দেশের দশ-জনের একজন। ঠিক মনে থাকবে। সবাই হেসে উঠলেন।

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর আরপুলি লেনের আজকের দিনের ক্লান্ত-জীর্ণ—অসহায় বাড়িটার নম্বর দশের-এক আরপুলি লেন।

ভারত ও ভারতবাসী
[ইতিহাস]

জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব

পূর্বেই আমরা সিন্ধুসভ্যতা অঞ্চলের লোকেদের ধর্মচিন্তা ও ধর্মীয় আচরণ কেমন ছিল দেখানর চেষ্টা করেছি। অবশ্য মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দেবালয় বা দেবতার বড় মূর্তি কিছু পাওয়া যায়নি। শীলমোহরে অঙ্কিত দেব-দেবীর কল্পিতরূপ এবং আচার-অনুষ্ঠান রূপায়িত হয়েছে যে-সব শীলমোহরে সেগুলো থেকে তৎকালের মানুষের ধর্মকর্মের আভাস পাওয়া যায়। দেবদেবীর উপাসনা, বৃক্ষ ও প্রতীক চিহ্নের বন্দনা, দেবস্থান পশুবলি— এরূপ ঘটনার ইঙ্গিত মেলে শীল-মোহরগুলোতে। জগন্মাতার বহু ছোট ছোট মূর্তি পাওয়া গেছে, এ থেকে অনুমান হয় ঘরে ঘরে মাতৃপূজার প্রচলন ছিল। সিন্ধুসভ্যতা লুপ্ত হওয়ার পরে ভারতে নতুন সভ্যতার পত্তন করল আর্যগণ।

আর্যদের ধর্মানুষ্ঠানের আলোচনায় আমরা দেখেছি, প্রথম দিকে সিন্ধুসভ্যতা আমলের ধর্মবিধি এদের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। না পারাই স্বাভাবিক, কারণ পরাজিত অনার্য শত্রুর কোন ভাব বা চিন্তাধারা গ্রহণ হয়ত এদের কাছে অবমাননাকর মনে হতে পারে। শত্রুর কাছ থেকে শিক্ষা করা বা তার ঋণ-স্বীকার বিজয়ীর দম্ভে বাধে। কিন্তু কাল-ক্রমে জয়-বিজয়ের তিক্ততা ম্লান হয়ে গেলে, দেশে বসতি বিস্তার করতে আদিবাসীদের সহায়তা নিতে হয়েছে। ক্রমে তাদের আর্য সমাজেও স্থান দিতে হয়েছে যদিও তা উচ্চপর্যায়ে নয়। এই অবস্থা বহুকাল ধরে চলতে থাকায় বিজিত ও বিজেতা, স্থানীয় বাসিন্দা ও আগন্তুকদের মধ্যে ভাবচিন্তা কর্ম ও আচরণের আদান প্রদান ঘটেছে। অনার্য রীতিনীতি, খাদ্য, ধর্মীয় ভাব ও সংস্কার আর্য সমাজেও মিশ্রিত হয়েছে।

তোমাদের মনে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে—আর্যদের নিজস্ব ধর্ম-অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় চিন্তাভাবনা ছিল যদি ধরে নিই, আর্যদের হাতে সিন্ধুসভ্যতার সময়কার জীবনপ্রবাহ বিলুপ্ত হয়েছিল এবং তাদের ধর্মচিন্তাও সেই সঙ্গে অবলুপ্ত হয়, তবে আর্যদের প্রবর্তিত ধর্ম আচরণের পরিবর্তন ঘটার কারণ কি? আর্যরা যে ধর্মজীবন গড়ে তুলেছিল তা ত অন্য কোন আক্রমণ-কারীর হাতে বিলুপ্ত হয়নি, তবে নতুন করে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব হল কেন? প্রচলিত ধর্মমতের সঙ্গে এ ধর্ম-মতের পার্থক্য কি? পুরাতনের স্থানে নতুন যখন কোন কিছুর উদ্ভব ঘটে তার নিশ্চয়ই কোন অন্তর্নিহিত কারণ থাকে। কারণ ছাড়া জগতে কোন কিছুই ঘটে না।

আমরা এ প্রশ্নের আলোচনা করব এবং বোঝার সুবিধার জন্য প্রশ্নটিকে তিন অংশে ভাগ করে নেব (১) জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্মের উদ্ভবের কারণ কি, অর্থাৎ কিরূপ পটভূমিকায় এই আন্দোলন (২) জৈন ও

১. আন্দোলনের পটভূমিঃ প্রথমেই বলি, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম বিদেশাগত কোন ধর্মমত নয়, আর্যগণ প্রবর্তিত হিন্দু-ধর্মের সংস্কার আন্দোলন, বলতে পার, হিন্দুধর্মের কোন কোন আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে **বিদ্রোহ**। এই বিদ্রোহের কারণ কি এবং বিদ্রোহী নায়ক নতুন কি ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন তা জানলে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জানা যাবে।

প্রথমে আর্যদের ধর্ম ছিল সহজ, সরল। তাঁরা প্রকৃতির দৃশ্যমান বা অনুভবসাধ্য শক্তির উপাসনা করতেন, দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আহুতি দিতেন। মানুষের কল্যাণকারী ও ভীতিপ্রদায়ক প্রাকৃত শক্তিকে আর্যগণ সমীহ করে স্তোত্র রচনা করতেন, তাঁদের কাছে ধনধান্য, পুত্র ও আরোগ্য কামনা করতেন। শত্রুজয় ও জাগতিক সম্পদলাভের বাসনায় পূজা হোম-যজ্ঞ করতেন। সমাজে জাতিভেদ ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে অনার্য সভ্যতার সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে বৈদিকধর্ম ক্রমশ প্রাণহীন বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত হল। যজ্ঞ অনুষ্ঠান ও পূজা প্রণালী জটিল হয়ে উঠল। পশুবলি হল ধর্মানুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ। ভক্তি, পবিত্রতা, সংযম ও আত্মোপলব্ধির পরিবর্তে পশুবলি ও বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়েই পুণ্য অর্জন করা যায় এই ধারণার ফলে সমাজে পুরোহিতদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। কারণ, কেবল যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানই যদি পুণ্যলাভের একমাত্র উপায় হয়, তবে অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের হাতেই পুণ্যের চাবিকাঠি! কাজেই চিন্তাশীল মানুষের কাছে **বৈদিকধর্ম যাগ-যজ্ঞের বাহুল্য ও পশুবলি প্রাণহীন আচার-সর্বস্ব প্রথায় পরিণত হল।**

ধর্মের নামে জীবহিংসা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি সমাজে নিম্নশ্রেণীর প্রতি উচ্চশ্রেণীর ঘৃণা ও ব্রাহ্মণশ্রেণীর প্রাধান্য প্রবল হয়ে ওঠে। হিংসা ও ঘৃণার দ্বারা, কেবল যজ্ঞ-অনুষ্ঠান ও পশুবলি দ্বারা পুণ্য অর্জন সম্ভব কি না এই প্রশ্ন মানব-হিতৈষী বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে আলোড়ন তুলল। বৈদিক ঋষিগণ উপনিষদে যে স্বাধীন ধর্মচিন্তা ও আত্মানুশীলনের ভাব জাগিয়ে তুলেছিলেন তার অনুসরণে পরবর্তীকালে বাহ্যিক অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন দেখা দিল। **ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য, জাতিভেদ-প্রথার কঠোরতা ও মানুষের প্রতি ঘৃণা** ধর্ম-বিদ্রোহীদের আক্রমণের বা সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য হল।

বিদ্রোহীর আবির্ভাবঃ আর্য-সমাজে যখন এই রকম ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান চলেছে তখন পূর্ব-ভারতে কয়েকজন ধর্ম-প্রচারকের আবির্ভাব হয়। রাজনৈতিক জগতের মতই ধর্মজগতেও বিদ্রোহের উৎপত্তি মানুষের ক্ষুব্ধ চিত্তে। সমাজের ক্রিয়াকলাপে ক্ষুব্ধ কয়েকজন মানবপ্রেমিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের ত্রুটিগুলো তুলে ধরে নিজের অনুগামী লোকেদের মধ্যে স্ব স্ব চিন্তাধারা প্রচলন করলেন। এঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের মত জন্মান্তরে ও কর্মবাদে বিশ্বাসী—মানুষ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে এবং পূর্বজন্মের কর্মের ফল এ জন্মে ভোগ করে—এরূপ বিশ্বাস করতেন। কিন্তু বেদ ও ব্রাহ্মণ্যের প্রাধান্য অস্বীকার করেন। পশুবধ অন্যায় বলে ঘোষণা করেন, এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত মানতেন না। তাঁরা প্রচার করলেন —সংস্কার ও কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের উপায় হল যাগযজ্ঞ নয়, অহিংসা ও সৎ আচরণ।

এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী প্রধান ধর্ম-

প্রচারকগণ ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব—একজন জৈনধর্মের প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীর, অন্য জন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ।

২. জৈন ও বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ ঃ প্রথমে আমরা জৈনধর্মের কথা আলোচনা করব।

জৈনদের মতে পর পর ২৪ জন তীর্থঙ্কর অর্থাৎ মুক্তিপথ-নির্মাতার আবির্ভাব হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ জৈনধর্মের প্রবর্তন করেন। তিনি ছিলেন কাশীর রাজপুত্র। পার্শ্বনাথ

পার্শ্বনাথ

যে ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন, সর্বশেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর তার কিঞ্চিৎ পরিবর্ধন সাধন করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। জানা গেল ঃ জৈনদের ২৪ জন তীর্থঙ্কর, পার্শ্বনাথ জৈনধর্মের মূল প্রবর্তক।

তবে সর্বশেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের আমলেই জৈনধর্ম বিশেষ পরিচিতি লাভ করে।

সর্বশেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের জীবন ও বাণী

মহাবীর (প্রকৃত নাম বর্ধমান) বিদেহ বা উত্তর বিহারের কুণ্ডপুর নামক স্থানের জ্ঞাতৃক দলপতির পুত্র। পিতার নাম সিদ্ধার্থ এবং মাতা ত্রিশলা দেবী। মহাবীরের জন্মকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না তবে তিনি খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন।

মহাবীরের সংসারজীবন সম্বন্ধে শুধু এইমাত্র জানা যায়, তিনি যশোদানাম্নী এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং ত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করে পূর্ব-ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। এই সময় তিনি **গোসাল** নামক এক সন্ন্যাসীর শিষ্য হয়ে ছয় বৎসরকাল কঠোর সাধনা করেছিলেন। গোসাল মহাবীরকে পরিত্যাগ করে চলে গেলে তিনি একাকী আরও ছয় বৎসর তপস্যা করেন কিন্তু বার বছরেও দিব্যজ্ঞান লাভ করতে পারলেন না। অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণের ত্রয়োদশ বর্ষে পূর্ব ভারতের ঋজুপালিকা নদীর তীরে সাধনায় রত হন এবং **কেবল-জ্ঞান** অর্থাৎ পরম অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করেন। তিনি হলেন 'কেবলীন' অর্থাৎ সর্বোচ্চ 'জিন' অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় এবং 'মহাবীর' অর্থাৎ শক্তিধর পুরুষ।

মহাবীর নির্গ্রন্থ (অর্থাৎ গ্রন্থিহীন, বন্ধনমুক্ত) নামে ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তাঁর 'জিন' উপাধি অনুসারে এই ধর্ম জৈনধর্ম নামে পরিচিত হয়। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরে তিনি বিভিন্ন-স্থানে ধর্মপ্রচার করে ৭২ বৎসর বয়সে দক্ষিণ বিহারের পাবা নগরীতে দেহত্যাগ করেন।

জৈনধর্মের মূলনীতি ঃ জৈনধর্মের মূল প্রবর্তক পার্শ্বনাথ এই ধর্মের জন্য চারটি

মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন, এগুলোকে বলা হত চতুর্যাম। এগুলো ছিল **অহিংসা, সত্যবাদিতা, অচৌর্য,** (অর্থাৎ চুরি না করা) এবং **অনাসক্তি**। মহাবীর চারটি নীতির সঙ্গে **ব্রহ্মচর্য** নীতি যোগ করেন। চতুর্যাম হল পঞ্চযাম।

মহাবীর সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য সকল পার্থিব পদার্থ এমন কি পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত পরিত্যাগ করে চরম অনাসক্তি প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছিলেন। এ জন্য তাঁর ধর্মমত যারা গ্রহণ করেছিল তারা দিগম্বর (উলঙ্গ) নামে পরিচিত। খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকে জৈনদের মধ্যে শ্বেতাম্বর নামে এক শাখার উদ্ভব হয়। এরা উলঙ্গ না থেকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করত।

জৈনশাস্ত্রগ্রন্থ থেকে জানা যায়, মহাবীর দেশভ্রমণ করতে করতে বাঙলার রাঢ় অঞ্চলে এসেছিলেন। উলঙ্গ থাকার দরুন তাঁকে বিরূপ আপ্যায়ণ লাভ করতে হয়েছিল। কতক লোক 'চু চু' শব্দ করে তাঁর দিকে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের তাতে কোন চিত্তবিকার হয়নি।

দ্বিতীয় বিষয় মহাবীর-অবলম্বনে শিল্পকার্য। বহু ভাস্কর মহাবীরের প্রস্তর-মূর্তি নির্মাণ করেছেন, দিগম্বর ধ্যানীমূর্তি। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং দর্শনীয় ৭০ ফুট ৩ ইঞ্চি উঁচু নগ্ন প্রস্তরমূর্তি। মহীশূর রাজ্যে (বর্তমান কর্ণাটক) হাসান জেলার এক গ্রামে ইন্দ্রবেটা নামে পাহাড়ের ওপর ৪৭০ ফুট উঁচুতে এই মূর্তি ৯৮৩ অব্দে চামুণ্ড রায় কর্তৃক নির্মিত হয়। প্রতি ২৫ বছর অন্তর প্রচুর ঘৃত দ্বারা অভিষেক হয় বলে মূর্তিটি সর্বদা নতুন দেখতে লাগে। গোমতেশ্বর নামে এর পরিচয়। হাজার বছর ধরে এই অপূর্ব মূর্তিটি যেন ভারতের ভাগ্য পরিবর্তনের নীরবসাক্ষী হয়ে রয়েছে।

জৈন ধর্মমত ঃ 'সিদ্ধশিলা' বা নির্বাণ লাভ করে আত্মাকে পুনর্জন্মের কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া জৈন ধর্মের উদ্দেশ্য। সিদ্ধশিলা লাভের তিনটি পন্থা নির্দিষ্ট আছে—সৎ বিশ্বাস, সৎ জ্ঞান এবং সৎ আচরণ। এই তিন পন্থাকে বলা হয় ত্রিরত্ন। জৈনগণ বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়; সমাজে জাতিভেদও তারা মানে না। অহিংসাকে তারা ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে। তাদের মতে শুধু পশুপক্ষীর নয়, গাছপালা, ধাতু, জল প্রভৃতি সকল প্রাকৃতিক দ্রব্যেরও আত্মা আছে। এ জন্য

মহাবীর

সকল কিছুর প্রতিই তারা অহিংস আচরণ নির্দেশ করে।

জৈন ধর্মগ্রন্থ ঃ মহাবীরের মূল উপদেশগুলো ১৪টি প্রাচীন গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছিল। এগুলোকে বলা হত পূর্ব। পরে কয়েকটি ধর্মসভা আহ্বান করে ধর্ম-নীতিগুলো সংকলিত ও লিপিবদ্ধ করা হয়। এই সংকলন 'অঙ্গ', 'উপাঙ্গ' 'মূলসূত্র' প্রভৃতিতে বিভক্ত।

গৌতম বুদ্ধের জীবন ও বাণী

কপিলবস্তুর শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র সিদ্ধার্থ সাধারণ রাজপুত্রের মত ছিলেন না। দয়াবিগলিতচিত্ত রাজকুমার জীবের দুঃখবেদনা নিজের অন্তর দিয়ে উপলব্ধ করে ব্যথায় কাতর হতেন। অনুক্ষণ তাঁর মনে জাগত একটি চিন্তা—কি করে এই সর্বব্যাপী, অনিবার্য রোগ শোক দুঃখযন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করা যায়। শোনা যায়, পুত্রের কোমল মন এবং সংসারের ভোগবিলাসের প্রতি অনাগ্রহ দেখে চিন্তিত পিতা সকলপ্রকার বেদনা-দায়ক দৃশ্য থেকে রাজকুমারকে আড়ালে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে নগরে ভ্রমণের সময় বৃদ্ধ, রুগ্ন, মৃতদেহ এবং গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর দর্শন পান। চিন্তাকুল রাজপুত্র সন্ন্যাসীর শান্ত সৌম্য মূর্তিদর্শনে অনুভব করেন, ত্যাগের ভিতর দিয়ে ঐ মহাশয়ব্যক্তি শান্তির সন্ধান পেয়েছেন। সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করে জীবের দুঃখ থেকে ত্রাণের উপায় সন্ধান করতে সংকল্প করেন এবং পুত্রের জন্মরজনীতেই রাজপুরী ত্যাগ করে মুক্তির সন্ধানে যাত্রা করেন। এই গৃহত্যাগ **মহানিষ্ক্রমণ** নামে খ্যাত হয়েছে। সিদ্ধার্থের বয়স তখন ২৯ বৎসর।

গৌতমের সন্ন্যাসী জীবন ঃ গৃহত্যাগের পর গৌতম জাগতিক দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তির সন্ধানে সন্ন্যাস গ্রহণ করে ৬ বছর ধরে নানা স্থানে পর্যটন করলেন ও শাস্ত্রপাঠ, যোগাভ্যাস ও কঠোরভাবে আত্মপীড়ন করলেন কিন্তু দিব্যজ্ঞান লাভ হল না। অনাহারে থাকতে থাকতে তাঁর দেহ অস্থিচর্মসার হল কিন্তু মুক্তির কোন উপায় খুঁজে পেলেন না। অবশেষে একদিন নৈরঞ্জনা (বর্তমান লীলাজন) নদীতে স্নান করে অনুক্ষণ সংকল্প নিয়ে অর্থাৎ জ্ঞানলাভ না করা পর্যন্ত আসন ত্যাগ করবেন না এই সংকল্প গ্রহণ করে বর্তমান বোধগয়ার এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় ধ্যানে বসলেন। এখানেই তাঁর প্রকৃত জ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ হয়। যে অশ্বত্থমূলে গৌতম দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন সেটি বোধিদ্রুম নামে পরিচিত এবং সে স্থানের নাম বুদ্ধগয়া বা বোধগয়া।

বুদ্ধত্বলাভের পর গৌতম সারনাথের নিকটবর্তী মৃগবনে তাঁর ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। ৩৫ বৎসর বয়সে দিব্যজ্ঞান লাভ করার পর তিনি দীর্ঘ ৪৫ বৎসরকাল বিহার, অযোধ্যা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে তাঁর বাণী প্রচার করেন এবং বৌদ্ধসংঘ গড়ে তোলেন। তৎকালীন মগধরাজ বিম্বিসার, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, কোশলের ধনী বণিক অনাথপিন্ডদ এবং রাজগৃহের সারিপুত্ত ও মোগ্‌গলন তাঁর

বুদ্ধের আধ্যাত্মিক সমন্বয়ের আদর্শ রূপ

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী নৃপতি ও ধনশালী নাগরিকগণ বৌদ্ধমঠ ও বিহার নির্মাণ করে দেন এবং মনোরম উদ্যান দান করেন।

আনুমানিক ৫৬৬ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে গৌতমের জন্ম, ৮০ বৎসর বয়সে কুশীনগর নামক স্থানে দেহত্যাগ। বৈশাখী পূর্ণিমা গৌতমের জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। এক বৈশাখী পূর্ণিমায় জন্ম, এক বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধত্ব লাভ এবং অপর এক বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাপরিনির্বাণ। বৈশাখী পূর্ণিমা 'বুদ্ধপূর্ণিমা' আখ্যা লাভ করেছে।

বুদ্ধের দেহত্যাগের পর অল্পকালের

পায়েস হাতে সুজাতা

মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র প্রচারিত হল। মহারাজ অশোকের ধর্মানুরাগ এবং প্রচেষ্টা একাজে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। বৌদ্ধধর্ম ক্রমে ভারতের বাইরে সিংহল, তিব্বত, চীন, জাপান, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে।

বুদ্ধের ধর্মমত ঃ দিব্যজ্ঞান লাভ করার পর বুদ্ধ সারনাথের নিকট মৃগবন বা মৃগদাব নামক উদ্যানে তাঁর পঞ্চ শিষ্যের কাছে ধর্মের বাণী প্রচার করেন। কি করলে মানুষ জরা, ব্যাধি, দুঃখশোক ও জন্মমৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারে, তার উপায় নির্ধারণের জন্য তিনি কঠোর সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর ধর্মমতের ভিতর দিয়ে তিনি দুঃখের হেতু এবং দুঃখ হতে মুক্তিলাভের উপায় প্রচার করে গেছেন।

বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি কি? চারটি 'আর্য সত্য' বা মহান সত্য (**Noble Truths**) গৌতম বুদ্ধের ধর্মমতের মূল ভিত্তি। এগুলি হল—মানুষের দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখমোচন এবং দুঃখমোচনের উপায়। (১) **দুঃখ ঃ** জগতে দুঃখকষ্ট আছে; মানুষ মাত্রেরই বার্ধক্য, রোগ-শোক প্রভৃতির দরুন দুঃখ ভোগ করতে হয়। এ ব্যাপারে ধনী-নির্ধন, রাজা-ভিক্ষুক, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ কোন ভেদ নেই; দুঃখভোগ মানুষ মাত্রেরই অবশ্যম্ভাবী। (২) **দুঃখের কারণ ঃ** প্রত্যেক দুঃখেরই কোন না কোন কারণ আছে; অজ্ঞতা এবং আসক্তি হল দুঃখকষ্টের মূল কারণ। (৩) **দুঃখ-মোচন ঃ** দুঃখমোচন করার জন্য প্রয়োজন অজ্ঞতা ও আসক্তির বিনাস। (৪) **দুঃখমোচনের উপায় ঃ** অজ্ঞতা ও আসক্তির বিনাশই দুঃখমোচনের উপায়। কিন্তু এ দুটির বিনাশ কিভাবে সম্ভব? সৎকর্মের দ্বারা জ্ঞান অর্জন করলে অজ্ঞতা দূর হয় এবং নির্বাণ বা পুনর্জন্ম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব।

নির্বাণলাভের উপায় কি? নির্বাণ-লাভের উপায় হিসাবে গৌতম বুদ্ধ মধ্যপন্থা প্রদর্শন করেছেন। হিন্দুদের জটিল যাগ-যজ্ঞ, প্রাণহীন পূজা-অর্চনা বা

ভোগবিলাসের ভেতর দিয়ে যেমন নির্মাণলাভ সম্ভবপর নয়, তেমনি জৈনদের মত দেহকে অত্যধিক কষ্ট দিয়েও পরমজ্ঞান লাভ করা যায় না। বুদ্ধ একদিকে যেমন হিন্দুদের যজ্ঞানুষ্ঠান, পশুবলি ও জীবহিংসা সমর্থন করতেন না, অন্যদিকে তেমনি জৈনদের মত গাছ-পাথর, জল-ধাতু সবকিছুর মধ্যেই যে প্রাণ আছে তাও মানতেন না। এই দুই ধর্মের আতিশয্য বর্জন করে বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মমতকে অনেকখানি বাস্তবপন্থী করে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন মধ্যপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ ঃ বুদ্ধের নির্দেশিত মধ্যপন্থা অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত। তোমাদের মনে প্রশ্ন উঠবে—মধ্যপন্থা বুঝতে পারি ; অর্থাৎ কোন বিষয়েই মাত্রাহীন বাড়াবাড়ি কল্যাণকর হয় না। অষ্টাঙ্গিক মার্গ অর্থাৎ আটটি পথ কী ?

অর্থব্যয়ে যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণের শরণ নিয়ে দক্ষিণা প্রদান, বলির পশুসংগ্রহ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাদের কি আত্মকল্যাণের পথ রুদ্ধ হয়ে থাকবে ? মানবদরদী গৌতম নির্দেশ দিলেন—মানুষের নিজের কল্যাণ নিজে করে, ব্রাহ্মণরূপ প্রতিনিধি মারফৎ জ্ঞান ও শান্তিলাভ হতে পারে না। তিনি যে ৮টি পথের নির্দেশ দিলেন তা পালন করার জন্য কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। এই পথ হল—১. **সৎ দৃষ্টি**—সংস্কারের বশে চালিত না হয়ে প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়ার জন্য প্রয়োজন সম্যক দৃষ্টি, তথ্যানুসন্ধান।

২. **সৎ বাসনা**—ভাল কাজে সাফল্য লাভের জন্য শুভ সংকল্প প্রয়োজন। সংকল্পপুষ্ট এবং চালিত না হলে সৎ বাসনা নিরর্থক হয়ে পড়ে।

৩. **সৎ বাক্য**—বাক্য সত্য এবং শুভংকর হওয়া উচিত। বাক্যের মাধ্যমেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে মনোভাব আদান প্রদান করি। বাক্য যদি অসত্য, নিষ্ঠুর, উদ্ধত, অশালীন হয়, তিক্ততা ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। এই প্রসঙ্গে Bible-এর প্রবচন (Proverb) থেকে একটি কথা উদ্ধৃত করি ঃ **A soft answer turneth away wrath, haughty words stir up strife**—শান্ত উত্তর ক্রোধ প্রশমিত করে, গরম কথার উদ্ধত উত্তর বিবাদ বাধিয়ে দেয়।

বুদ্ধদেবের সৎবাক্যের উপদেশ মানুষের বাস্তব জীবনে কার্যকর বলে প্রমাণিত।

৪. **সৎ ব্যবহার**—সৎ আচরণে অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু মানুষ সমাজে বহুজনের সংস্পর্শে আসে, সৎ আচরণ ব্যক্তি ও ব্যষ্টি সকলের পক্ষেই আবশ্যক। মানুষ যদি একাকী পরনির্ভর না হয়ে বাস করত, তার আচরণের কোন প্রশ্ন উঠত না।

৫. **সৎ জীবন**—সৎভাবে জীবন যাপন করা উচিত। মানুষ ব্যবহারিক জীবনে দেখতে পায়, অসৎ জীবন সাময়িকভাবে ফলদায়ক হলেও পরিণামে কখনই শুভ হয় না।

৬. **সৎ চেষ্টা**—সংকল্পকে কাজে পরিণত করার জন্য সৎ চেষ্টা আবশ্যক। চেষ্টা আন্তরিক হলে তা কখনই সম্পূর্ণ বিফল হয় না।

৭. **সৎ স্মৃতি**—মন নির্মল রাখার জন্য সৎ বিষয়ের চিন্তা করা উচিত।

৮. **সম্যক সমাধি**—সৎ বিষয়ে মনোনিবেশ।

নিষ্ঠাবান বৌদ্ধের কাছে অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রতিটি নির্দেশ সম্বন্ধে গভীর দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু সাধারণ মানুষের কর্ম ও ব্যবহারিক

জীবনেও যে এগুলো পরম কল্যাণকর তাতে কোন সংশয় নেই। অষ্টাঙ্গিক মার্গ ছাড়াও বুদ্ধদেব কতকগুলো 'শীল' বা নীতি অনুসরণের উপদেশ দিয়েছেন। এগুলো হল—অহিংসা, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য পালন। মিথ্যা না বলা, অপরের কুৎসা না করা ইত্যাদি।

বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশের যে অংশমাত্র তোমরা শুনলে তা থেকেই বুঝতে পারছ, ধর্ম অর্জনের জন্য তিনি মানুষকে লোক দেখানর মত কিছু করতে বলেননি। সৎ পবিত্র জীবন, অপরের প্রতি করুণা, অপরের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ও সৎচিন্তার

শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত বুদ্ধদেব

ভিতর দিয়েই মানুষ জীবনের সার্থকতা লাভ করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ অতি সংক্ষেপে বুদ্ধদেবের জীবনসাধনার স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন—'বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র পড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তিলাভ করা যায়। এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল, তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ করে, সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে তবেই মুক্তি হয় কোন স্থানে গেলে বা জলে স্নান করলে, বা অগ্নিতে আহুতি দিলে, বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুত্রকে রাজ্য ত্যাগ করে বনে বনে, পথে পথে, ফিরতে হয়েছে।'

বুদ্ধজন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কবিতার কথা ও সুর তোমরা অনেকেই শুনেছ। সেই সংগীতে বর্তমানযুগের এক মহাকবি প্রাচীন ভারতের এক মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন—

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোরকুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্মলাগি কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম
চিরমধুনিষ্যন্দ
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর
কলঙ্কশূন্য।

বৌদ্ধ সংঘ ঃ বুদ্ধের শিষ্যগণ প্রথম দিকে অনেকে সংসার ত্যাগ করে বনে বা পাহাড়ে-পর্বতের গুহায় বাস করত, ভিক্ষা করে জীবনধারণ করত। অন্যের পরিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্র কুড়িয়ে পরিধান করত। বুদ্ধদেব দেহকে কঠোরভাবে নিপীড়ণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কাজেই তিনি শিষ্যদের তাদের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত গৃহে বসবাস করতে, অন্যে প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ

করতে এবং চিকিৎসকের নির্দেশমত ঔষধ গ্রহণ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন।

প্রথমে বৌদ্ধসংঘ ও বিহারগুলো ভিক্ষুদের বাসস্থান এবং ধ্যানধারণার স্থান হিসাবে নির্মিত হয়েছিল। পরে এগুলো বিদ্যাচর্চা, ধর্ম ও দর্শন আলোচনা এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য উপযুক্ত মানুষ তৈরি করার প্রতিষ্ঠানরূপে সমাজে এক বিশেষ স্থান গ্রহণ করে।

বৌদ্ধসঙ্গীত কী? এর প্রয়োজনই বা কি? এ প্রশ্নের আলোচনা করা চলে। বুদ্ধদেব তাঁর সময়কার কথ্যভাষা পালিতে শিষ্য ও জনসাধারণকে মৌখিক উপদেশ দিতেন। তাঁর জীবিতকালে ধর্মনীতিগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়নি। বুদ্ধের দেহত্যাগের পর তাঁর শিষ্যগণ বৌদ্ধধর্মের নীতি ও বুদ্ধের উপদেশাবলী সংকলনের জন্য রাজগৃহে এক ধর্মসভার অনুষ্ঠান করেন। এই সভা প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতি (Buddhist Council) নামে পরিচিত। দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় বৈশালীতে; মৌর্য-সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে তৃতীয় সঙ্গীতি এবং খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে কণিষ্কের সময়ে কাশ্মীরে কিংবা জলন্ধরে চতুর্থ সভার অধিবেশন হয়েছিল। বুদ্ধের ধর্মনীতিগুলো তিনটি পিটক (Basket)-এ ভাগ করা হয়েছিল, তাই এর নাম ত্রিপিটক।

ধম্মপদ: বুদ্ধ সাধারণ মানুষের ও তাঁর সংসারত্যাগী শিষ্যদের যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার সংকলন ধম্মপদ, পালিতে লেখা অমূল্য রত্ন-আকর। পালি থেকে এর উপর ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে কবিতায়। এখানে ভগবান বুদ্ধদেব প্রিয় শিষ্য সারিপুত্তকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তার কয়েক অংশের ইংরেজি ও তার বাঙলা অনুবাদ শোনানর লোভ সামলাতে পাচ্ছি নে। কথাগুলো থেকে সংসারত্যাগী শিষ্যের প্রতি সর্বদর্শী ধর্মগুরুর স্নেহনির্দেশ জানতে পারবে:

Like lion fearful not of sound,
Like wind not caught within a net,
Like lotus by water unsoiled,
Fare lonely as rhinoceros.

শব্দে অ-ভীত সিংহের মত,
জালে অনাবদ্ধ বায়ুর মত,
জলে অমলিন পদ্মের মত,
নিঃসঙ্গ গণ্ডারের মত জীবনযাপন কর।

Free everywhere, at odds with none,
And well content with this and that,
Enduring dangers undismayed,
Fare lovely as rhinoceros.

মুক্ত সর্বত্র, দ্বন্দ্ববিহীন,
যেন তেন কিছুতেই তৃপ্ত,
বিপদে নির্ভীক, সহনশীল,
নিঃসঙ্গ গণ্ডারের মত জীবনযাপন কর।

Folk serve and follow with an aim,
Friend who seek not are scarce today,
Men wise in selfish aims, are foul;
Fare lonely as rhinoceros.

মানুষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সেবা ও অনুসরণ করে,
কোন কিছু কামনা করে না, এমন বন্ধু জগতে বিরল,
নিজ স্বার্থলক্ষ্যে তৎপর মানুষ অবাঞ্ছিত
নিঃসঙ্গ গণ্ডারের মত জীবনযাপন কর॥

তুলনা: আলোচনার শুরুতেই আমরা বলেছি, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম নতুন ধর্ম নয়,

হিন্দুধর্মের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ। কাজেই হিন্দুধর্মের সঙ্গে নতুন ধর্মমতের তুলনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

তিন ধর্মের পার্থক্য কিরূপ? হিন্দুধর্ম জাতিভেদ মানে কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ নেই। হিন্দুধর্ম বেদভিত্তিক অর্থাৎ বেদ ভগবানের বাণী বলে মানে এবং ভগবানে বিশ্বাস ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করে কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধধর্ম ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্যও মানে না কিন্তু পুনর্জন্মবাদ স্বীকার করে।

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের তুলনা : জৈন ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেই মোক্ষ বা নির্বাণ লাভই পরম কাম্য বলে বিবেচিত। জৈনগণ মনে করেন, এর জন্য কঠোর তপস্যা ও ইন্দ্রিয় জয় আবশ্যক। সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করে অনাসক্তি লাভ করার জন্য জৈনগণ পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত ত্যাগ করার পক্ষপাতী। প্রাণীহিংসা জৈনধর্মে সম্পূর্ণ বারণ। গাছ, পাথর, জল, বায়ু সব-কিছুরই আত্মা আছে বলে এঁরা বিশ্বাস করেন। বৌদ্ধগণ এ বিষয়ে মধ্য-পন্থা অবলম্বন করেন। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি বা আতিশয্য তাঁরা অনুমোদন করেন না। নির্বাণলাভের জন্য অত্যধিক আত্মপীড়ন, আসক্তিহীন হওয়ার জন্য বস্ত্রত্যাগ এবং অচেতন পদার্থে আত্মার অস্তিত্ব বৌদ্ধধর্মে স্বীকৃত হয়নি। পক্ষান্তরে, জৈন ও বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্মের কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী।

বৌদ্ধধর্মে দেবদেবীর কোন স্থান নেই। কিন্তু জৈনগণ লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি হিন্দু দেবতার অর্চনা করে থাকেন। সংঘ বৌদ্ধ-ধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ কিন্তু জৈনধর্মে সংঘের কোন স্থান নেই।

হিন্দুধর্মের সঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অনেক বিষয়েই পার্থক্য আছে; তবু এ দুই-এর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের চেয়ে জৈনধর্মের সঙ্গেই হিন্দুধর্মের সাদৃশ্য কিছুটা বেশি।

বৌদ্ধধর্মের পরিণতি কি হল? ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম বিলোপ হল কেন? এ প্রশ্ন ইতিহাসের ছাত্রের মনে স্বাভাবিকভাবেই ওঠে। সত্যিই ত, ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি। এখানকার জনসমাজে এক সময়ে তার সানুরাগ বিস্তার ঘটেছিল, যার প্রমাণ অসংখ্য বৌদ্ধস্তূপ, প্রস্তরমূর্তি চিত্র ভাস্কর্য সাহিত্যের মধ্যে অজস্র উৎসারিত ভক্তিশ্রদ্ধার অর্ঘ। শুধু ভারতেই নয়, ভারতের বাইরে জনহৃদয় আকৃষ্ট করেছিল গৌতম বুদ্ধের ধর্মমত। মূলভূমি ভারত অপেক্ষা ভারতের বাইরেকার দেশেই এখন এর প্রসার বেশি। কারণ অনুসন্ধানযোগ্য।

বুদ্ধদেবের জীবিতকালে বৌদ্ধধর্ম সারা ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়নি মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে এর প্রসারের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করেন। যতদিন বৌদ্ধধর্ম রাজানুগ্রহ পেয়েছিল ততদিন ভারতে এর গৌরব ছিল অক্ষুণ্ণ। গুপ্তসম্রাটগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁদের আনুকূল্য পেয়ে হিন্দুধর্ম ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠে, পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই বলা যায় বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা হ্রাসের **প্রথম কারণ**—রাজানুগ্রহের অভাব।

দ্বিতীয় কারণ—বৌদ্ধধর্মে মূর্তি-পূজার প্রচলন। বুদ্ধদেব দেবদেবীর পূজা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু কুষাণযুগে বৌদ্ধগণ হীনযান ও মহাযান দুই ভাগ হয়। হীনযানভুক্ত বৌদ্ধগণ মূর্তি পূজার বিরোধী রইলেন; মহাযানী বৌদ্ধগণ বুদ্ধদেবের মূর্তিপূজা ও নানা অনুষ্ঠান প্রচলন করলেন। এর ফলে হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মৌলিক পার্থক্য অনেক কমে গেল।

বৌদ্ধধর্ম তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ম্লান হয়ে পড়ল।

তৃতীয় কারণ—তান্ত্রিক আচার ও দুর্নীতি। কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তান্ত্রিক ধর্মাচার প্রবেশ করায় ধর্মনীতি ক্রমশঃ সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর এবং দুর্নীতিপূর্ণ হয়ে উঠল। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘের অনাচারও বৌদ্ধধর্মের মহিমা অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করে দেয়।

চতুর্থ কারণ—হিন্দু ধর্মের সংস্কার। এই সময় শঙ্করাচার্য, কুমারিল ভট্ট প্রমুখ সংস্কারকগণ হিন্দুধর্মের গ্লানি দূর করে এর মধ্যে নতুন তেজ সঞ্চার করেন। হিন্দু ধর্ম ক্রমে বুদ্ধকে হিন্দু দশ অবতারের এক অবতাররূপে গণ্য করে বৌদ্ধধর্মকে গ্রাস করে নিল। ঝড়ের দাপটে সমুদ্রের ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠলেও তা যেমন সমুদ্রবক্ষেই লীন হয়, তেমনি যে বৌদ্ধধর্ম একদা হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে দেখা দিয়েছিল, আবার তা প্রধানত হিন্দু ধর্মের মধ্যেই মিশে গেল।

পঞ্চম কারণ—মুসলমান আক্রমণ। ইসলামের পৌত্তলিকতাবিরোধী অভিযানে অহিংস বৌদ্ধগণ আত্মরক্ষা করতে পারেনি। বৌদ্ধবিহার ছিল বৌদ্ধ ধর্ম সংগঠনের একটি অঙ্গ। এই সকল শিক্ষা ও প্রচার কেন্দ্র বিনষ্ট হওয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে অবলম্বনশূন্য হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বুদ্ধজন্মের ফল ঃ একজন মহামানব বিশ্বসংসারে কতখানি পুণ্যপ্রভাব বিস্তার করতে পারে, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, চিত্রকলার অভূতপূর্ব স্ফুরণ ও বিকাশ ঘটিয়ে জ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে কিরূপ উজ্জল অলোকরূপে প্রতিভাত হতে পারে, গৌতম বুদ্ধের জীবন তার ভাস্বর দৃষ্টান্ত। বুদ্ধের উপদেশ ও জীবনকথা নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাঁর পূর্বজীবনের কাহিনী **জাতক কাহিনী**রূপে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও আনন্দের উৎস হয়ে আছে বুদ্ধের পূত অস্থি ও স্মারক রক্ষার জন্য নির্মিত হয়েছে বৌদ্ধস্তূপ ও মন্দির। সাঁচী ও ভারতের স্তূপ ও সিংহলের দন্তমন্দির বুদ্ধের পূতাস্থি ধারণ করে রেখেছে। নানাস্থানে পাথরে বুদ্ধের জীবনকথা শিল্পী রূপায়িত করেছেন।

বুদ্ধের জীবনকথা অবলম্বনে অনুপম চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল অজন্তা পাহাড়ের গুহা-প্রাচীরে। বিষয় বৈচিত্র্যে, বর্ণের সুষমায়, নিখুঁত অঙ্কনে অজন্তা চিত্রাবলী বিশ্বে সমাদৃত। অজন্তার অনুকরণে চীনের তুন্‌হুয়াঙ্ গুহাচিত্র অঙ্কিত হয়েছিল।

শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরে নানা দেশে—তিব্বত, চীন, জাপান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, কম্বোজ, যবদ্বীপ প্রভৃতিতে বুদ্ধের ধাতু ও প্রস্তরনির্মিত মূর্তি, মন্দির, প্রস্তরচিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের ভক্তি ও কর্মপ্রচেষ্টা উৎসারিত হয়ে উঠেছে। ইউরোপের সাহিত্যিক ঐতিহাসিকের কাছে বুদ্ধদেব 'এশিয়ার আলো' (Light of Asia), বিশ্বের মহত্তম মানব। সাধারণ মানুষের কাছে তিনি দরদী, সৎজীবনের পথ প্রদর্শক।

বর্তমান বিশ্বে বৌদ্ধ ধর্মের স্থান কোথায়? এ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা কত? এ প্রশ্নের উত্তর দেব ব্রিটানিকা ইয়ারবুকের ১৯৭২ সনের পরিসংখ্যান থেকে ঃ—

ক্রিশ্চান	— ৯৮,৫৩,৬৩,৪০০
হিন্দু	— ৪৭,২৩,৫৮,৫০০
মুসলিম	— ৪৭,১৩,৩৮,৭০০
বৌদ্ধ	— ৩০,১৪,৩৬,০৩০

নারায়ণচন্দ্র চন্দ

ভারত ও ভারতবাসী
[ভূগোল]

আগের পাঠে পশ্চিম হিমালয়ের ভৌগোলিক পরিবেশ কি ধরনের বলেছি। আজ তোমাদের মধ্য ও পূর্ব হিমালয়ের কথা বলব।

মধ্য হিমালয় বা নেপাল হিমালয়

হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের যে অংশ স্বাধীন নেপাল রাষ্ট্রের অন্তর্গত তারই নাম—**মধ্য হিমালয়। এই অঞ্চলটি ভারতের বাইরে।** সুতরাং মধ্য হিমালয় সম্পর্কে শুধু কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় জেনে নিলেই হবে। এস, ওগুলো জেনে নাও—

১. পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু **এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গ** (৮৮৪৮ মিটার) এই অংশের হিমাদ্রি পর্বতশ্রেণীতে অবস্থিত। এছাড়া ধবলগিরি, অন্নপূর্ণা, মাকালু প্রভৃতি সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গও এখানে আছে।

২. এইসব গিরিশৃঙ্গ সর্বদা বরফে ঢাকা থাকে, তাই বহু হিমবাহ এখানে সৃষ্টি হয়েছে।

৩. বিভিন্ন পর্বতশ্রেণীর মাঝে একটি বিখ্যাত উপত্যকা আছে—তার নাম **কাঠমাণ্ডু উপত্যকা।**

৪. এই অঞ্চলের প্রধান তিনটি নদী হল— কর্ণালী, গণ্ডক ও কুশী।

৫. বিভিন্ন উপত্যকা ও পাহাড়ের গায়ে ধান, গম, যব ইত্যাদি চাষ করা হয়। এছাড়া বহু লোক পশুপালন করে।

৬. কাঠমাণ্ডু—এই অঞ্চলের সর্বপ্রধান শহর ও নেপালের রাজধানী।

পূর্ব হিমালয়

প্রথমে বুঝে নাও পূর্ব হিমালয় বলতে কি বোঝায়। হিমালয়ের যে অংশ নেপালের পূর্ব সীমানা থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত তারই নাম—**পূর্ব হিমালয়।** পশ্চিম হিমালয়ের মত এই অঞ্চলটির অধিকাংশ স্থান ভারতের মধ্যে অবস্থিত। তবে পশ্চিম হিমালয় সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেলেও পূর্ব হিমালয় সম্পর্কে খুব কম তথ্যই পাওয়া গেছে।

পশ্চিম হিমালয়ের মত **পূর্ব হিমালয়কেও** কয়েকটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে ভাগ করা হয়—

পূর্ব হিমালয়

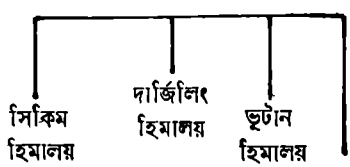

এই ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলো নিয়ে আলোচনার আগে সমগ্র পূর্ব হিমালয় সম্পর্কে আরও একটু ধারণা করে নাও—

১. ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলো দেখে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে সিকিম, পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলা, ভূটান ও অরুণাচল

প্রদেশ—পূর্ব হিমালয়ের অন্তর্গত। তবে ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলোর আলোচনার মধ্যে ভূটানকে কিন্তু অন্তর্ভুক্ত করা হবে না, কারণ **ভূটান ভারতের বাইরে** এবং একটি পৃথক রাষ্ট্র।

২. হিমালয়ের সর্ব দক্ষিণে দুটি পর্বতশ্রেণী – শিবালিক ও হিমাচল, একমাত্র অরুণাচল প্রদেশ ছাড়া পূর্ব হিমালয়ের আর কোথাও স্পষ্ট নয়।

৩. তবে **হিমাদ্রি বা প্রধান হিমালয়** পশ্চিমে সিকিম থেকে একেবারে পূর্বে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

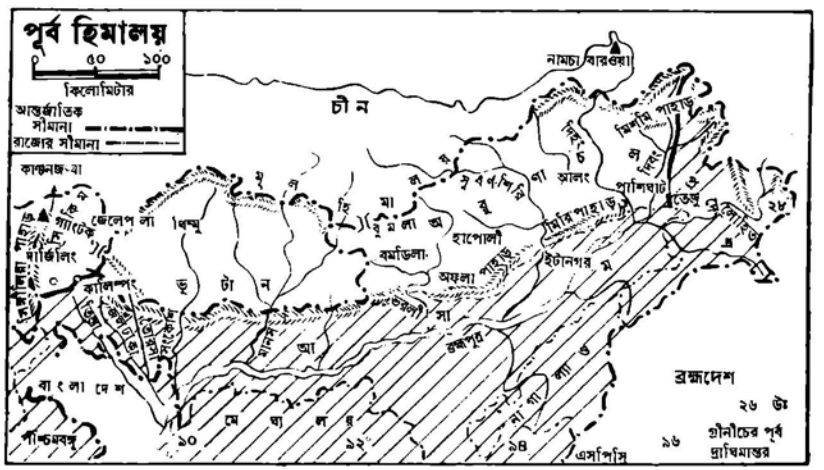

৪. **পশ্চিম হিমালয়ের সঙ্গে পূর্ব** হিমালয়ের কতকগুলো **পার্থক্য আছে।** পার্থক্যগুলো কি দেখ—

ক. পূর্ব হিমালয়ে দক্ষিণের সমভূমি অঞ্চল থেকে পর্বতমালা অনেক খাড়াভাবে ওপরে উঠেছে।

খ. পূর্ব হিমালয়ে বর্ষাকালে ধ্বস নামে বেশি।

গ. পূর্ব হিমালয়ের জলবায়ু আর্দ্র। এখানে বেশি বৃষ্টি হয়, কিন্তু তুষারপাত কম।

ঘ. এখানকার অধিকাংশ স্থান অরণ্যে ঢাকা।

ঙ. বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে পূর্ব হিমালয় অপেক্ষাকৃত কম উন্নত।

এবার এস, দেখা যাক পূর্ব হিমালয়ের কোথায় কি আছে—

সিকিম হিমালয়

অবস্থান ও আয়তন ঃ সিকিম রাজ্যে হিমালয়ের যে অংশটি বিস্তৃত তাকে **সিকিম হিমালয় বলে। এই অঞ্চলটির** মোট ভূমির পরিমাণ প্রায় ৭২৯৯ বর্গ কিলোমিটার।

ভূপ্রকৃতি ঃ শিবালিক, হিমাচল, হিমাদ্রি ও টেথিস হিমালয়—পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হিমালয়ের এই চারটি পর্বতশ্রেণীর কথা তোমরা জেনেছ। এর মধ্যে কেবলমাত্র হিমাদ্রি পর্বতশ্রেণীকেই সিকিমে দেখা যায়।

উত্তরাংশে তিব্বত-সিকিম সীমান্তে **এই** হিমাদ্রি পর্বতশ্রেণী বিরাজমান **আর এর** দুটি শাখা—**সিঙ্গলীলা ও ডংকিয়া**

দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল

শ্রেণী এই অঞ্চলের উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত হয়েছে। সিঙ্গলীলা শ্রেণী সিকিমের পশ্চিম সীমানা এবং ডংকিয়া শ্রেণী পূর্ব সীমানা ধরে দক্ষিণে চলে গেছে।

সিকিমের পশ্চিম সীমানায় বিখ্যাত **কাঞ্চনজঙ্ঘা** গিরিশৃঙ্গ (৮৫৯৮ মিটার) অবস্থিত এবং পূর্বের ডংকিয়া শ্রেণীতে নাথুলা ও জিলাপ-লা নামে দুটি গিরিপথ আছে।

সিদ্ধান্ত ঃ তাহলে সিকিমের সম্পর্কে জানলে যে ১. এর উত্তরে হিমাদ্রি পর্বত-শ্রেণী, ২. পশ্চিমে হিমাদ্রির একটি শাখা সিঙ্গলীলা শ্রেণী এবং ৩. পূর্বে অপর শাখা ডংকিয়া শ্রেণী আছে।

দার্জিলিং হিমালয়

অবস্থান ও আয়তন ঃ সিকিমের দক্ষিণে আছে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলা। দক্ষিণাংশের শিলিগুড়ি মহকুমা বাদে এই জেলার সমগ্রস্থানই পার্বত্যময়। দার্জিলিং জেলায় হিমালয় পর্বতমালার এই অংশটুকুর নাম দার্জিলিং হিমালয়। এর ভূমির পরিমাণ প্রায় ৩০৭৫ বর্গ কিলোমিটার।

ভূ-প্রকৃতি ঃ এবার দেখা যাক এখানের ভূ-প্রকৃতি কি ধরনের—প্রধানত **সিঙ্গলীলা** ও **দার্জিলিং পর্বতশ্রেণী** নিয়ে দার্জিলিং হিমালয় গঠিত। এই দুটি পর্বতশ্রেণী ভাল করে জেনে নাও।

তোমরা সিকিমের পশ্চিম সীমানায় যে সিঙ্গলীলা পর্বতশ্রেণীর নাম জানলে ঐ পর্বতশ্রেণীটিই দার্জিলিং জেলার পশ্চিম সীমানা বরাবর দক্ষিণে চলে গেছে। এখানে এই পর্বতশ্রেণীর তিনটি উঁচু শৃঙ্গ আছে—**সন্দাকফু** (৩৬৩০ মিটার), **ফালুট** (৩৫৯৬ মিটার) ও **সবরগ্রাম** (৩৫৪৩ মিটার)।

অপর পর্বতশ্রেণী অর্থাৎ দার্জিলিং শ্রেণী দক্ষিণে তরাই অঞ্চল থেকে খাড়াভাবে ওপরে উঠে গেছে। **তরাই অঞ্চল** কাকে বলে জান? আচ্ছা বলে দিচ্ছি ঃ 'তরাই' একটি ফরাসী শব্দ, এর অর্থ স্যাঁতসেঁতে ও ভিজে জমি। হিমালয় পর্বতশ্রেণীর পাদদেশের নিচু জায়গাগুলো জলের প্রাচুর্যের জন্য গভীর বনে ঢাকা ও স্যাঁতসেঁতে। অরণ্যঢাকা এই ভিজে জায়গাগুলোর নাম তরাই অঞ্চল।

এই দার্জিলিং পর্বতশ্রেণীর ওপর দিয়ে বিখ্যাত দার্জিলিং হিমালয় ছোট রেলপথ এঁকেবেঁকে দার্জিলিং শহর পর্যন্ত গেছে। এই ছোট রেলপথের মাঝখানে 'ঘুম'-নামে

একটি স্টেশন পড়বে। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু রেল স্টেশন, এর উচ্চতা ২২৪৭ মিটার। দার্জিলিং শহরটিও একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত।

দার্জিলিং-এর দক্ষিণে **টাইগার হিল** (২৫৭৬ মিটার)। এখান থেকে কয়েকটি পর্বত বিস্তৃত হয়েছে, যেমন পূর্বে তাকদা শ্রেণী, পশ্চিমে ঘুম পাহাড়, উত্তরে দার্জিলিং শ্রেণী এবং দক্ষিণে ডাউহিল। এই ডাউহিলের ওপর কার্শিয়াং শহরটি অবস্থিত। আবহাওয়া ভাল থাকলে টাইগার হিল থেকে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়।

সিদ্ধান্ত ঃ দার্জিলিং সম্পর্কে জানা গেল যে এখানে প্রধানত দুটি পর্বতশ্রেণী আছে—সিঙ্গলীলা শ্রেণী ও দার্জিলিং শ্রেণী। এছাড়া দক্ষিণে টাইগার হিল থেকে কয়েকটি ছোট পর্বতশ্রেণী চারদিকে বিস্তৃত হয়েছে।

সিকিম ও দার্জিলিং অঞ্চলের নদনদী ঃ অনেক খরস্রোতা নদী এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে, যেমন—**তিস্তা, রঙ্গিত, মেচি, তোরসা, বালাসন, জলঢাকা** প্রভৃতি।

এইসব নদীর মধ্যে তিস্তা সবচেয়ে বড়। তাই এই নদীটি সম্পর্কে আরও একটু জেনে নাও—কাঞ্চনজঙ্ঘার পূর্বাংশের জেমু হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে তিস্তা নদী প্রথমে, সিকিম ও পরে দার্জিলিং-এর ওপর দিয়ে দক্ষিণের সমভূমিতে চলে গেছে। এই নদীর উপত্যকাটি বেশ বড় এবং এখানে কৃষিকাজ করা হয়।

অরুণাচল হিমালয়

অবস্থান ও আয়তন ঃ সমগ্র হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের একেবারে পূর্বাংশে এই ক্ষুদ্র অঞ্চলটি অবস্থিত। এর মোট ভূমির পরিমাণ প্রায় ৮৩,৫৭৮ বর্গ কিলোমিটার। এক সময় অরুণাচল প্রদেশ আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে এই অংশটি আসাম হিমালয় নামেও পরিচিত।

ভূ-প্রকৃতি ঃ তোমাদের আগেই বলেছি যে পূর্ব হিমালয়ের একমাত্র অরুণাচলেই শিবালিক, হিমাচল ও হিমাদ্রি

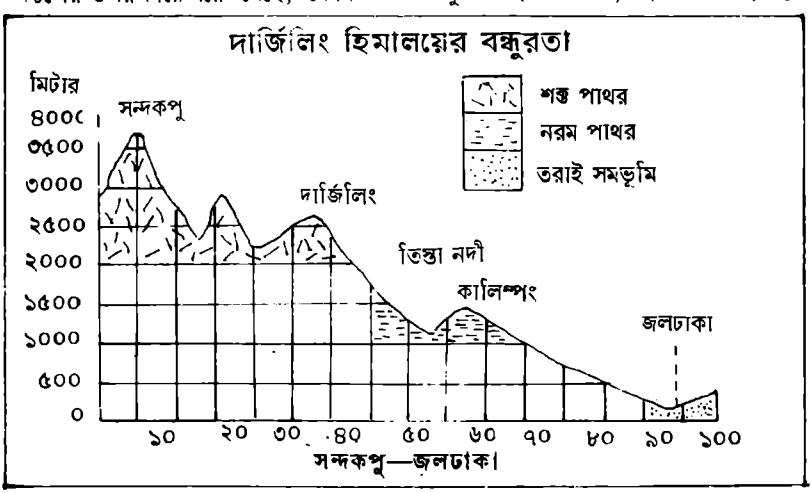

দার্জিলিং হিমালয়ের সবচেয়ে উঁচু সন্দাকফু শৃঙ্গ থেকে পূর্বে জলঢাকা নদী পর্যন্ত—দূরত্ব ও উচ্চতার পার্থক্য

পর্বতশ্রেণীকে স্পষ্ট দেখা যায়। এখন এস আমরা দেখি এই পর্বতশ্রেণীগুলো ওখানে কি ভাবে বিস্তৃত হয়েছে :

১. সর্বদক্ষিণে শিবালিক পর্বতমালা হঠাৎ খাড়াভাবে ওপরে উঠে গেছে—এর গড় উচ্চতা প্রায় ৮০০ মিটার। তবে শিবালিক এখানে একটানা বিস্তৃত হতে পারেনি—মাঝে মাঝে উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত নদীর জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

২. এর উত্তরে হিমাচল পর্বতশ্রেণী পূর্বে-পশ্চিমে বিস্তৃত। শিবালিকের মত হিমাচলও সুসংবদ্ধ নয়—বিভিন্ন নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন।

৩. সবার উত্তরে মূল হিমালয় বা হিমাদ্রি পর্বতশ্রেণীর অধিকাংশই বরফে ঢাকা। এখানে অনেক শৃঙ্গ আছে যেগুলোর উচ্চতা ৬০০০ মিটারেরও বেশি। এই পর্বতশ্রেণীটি পশ্চিম থেকে পূর্বে বিস্তৃত হয়ে উত্তরে তিব্বত সীমান্তের কাছে **নামচা বারোয়া শৃঙ্গে** (৭৭৫৬ মিটার) শেষ হয়েছে।

৪. উত্তর-পশ্চিম দিকে তিব্বত-অরুণাচল সীমান্তে বুম-লা নামে একটি গিরিপথ আছে। এই প্রসঙ্গে মনে রেখ ১৯৬২ সালে চীনা সৈন্যরা এই পথ দিয়ে এসে ভারত আক্রমণ করে।

সিদ্ধান্ত : অরুণাচল প্রদেশে শিবালিক ও হিমাচল পর্বতশ্রেণী আছে, তবে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন। আর উত্তরে হিমাদ্রি পর্বতশ্রেণী খুব উঁচু—এর অনেক শৃঙ্গই বরফে ঢাকা।

নদনদী : ব্রহ্মপুত্র এই অঞ্চলের প্রধান নদী। এখানে ব্রহ্মপুত্রের নাম **ডিহং**। অরুণাচলের অন্যান্য নদী যেমন—ভরালী, সুবনসিরি, দিবং প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্র বা ডিহং-এ এসে মিশেছে।

সিকিম-দার্জিলিং ও অরুণাচল হিমালয়ের ভূ-প্রকৃতি ও নদনদী আলাদা করে আলোচনা করা হল। এরপর এইসব অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো কিরকম তোমাদের জানতে হবে। তবে তার আগে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর তৈরি করে নাও—

প্রশ্ন

ক. মধ্য হিমালয় কোন্ স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ?

খ. পূর্ব হিমালয় কটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিভক্ত ? বিভাগগুলোর নাম কি ?

গ. পশ্চিম হিমালয়ের সঙ্গে পূর্ব হিমালয়ের ভূ-প্রকৃতির কি পার্থক্য আছে ?

ঘ. সিকিম ও দার্জিলিং হিমালয়ের ভূ-প্রকৃতি কিরূপ ?

ঙ. অরুণাচলের ভূ-প্রকৃতি ও নদনদীর পরিচয় দাও।

চ. সিকিম-দার্জিলিং-এর নদনদীর নাম কি ?

সিকিম-দার্জিলিং ও অরুণাচল হিমালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

জলবায়ু : এই অঞ্চলের জলবায়ুর কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। এস আমরা এখন দেখি এই বৈশিষ্ট্যগুলো কি—

১. দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে এসে সরাসরি পূর্ব হিমালয়ে ধাক্কা খায় বলে দার্জিলিং থেকে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টি হয়—গড়ে ৩০০ থেকে ৪০০ সেণ্টি-মিটার। তবে ক্রমশ উত্তরের দিকে বৃষ্টি কমে যায়।

২. গ্রীষ্মকালে গড় তাপমাত্রা হয় ২০ সেণ্টিগ্রেডেরও বেশি এবং শীতকালে হয় ৪° সেণ্টিগ্রেড।

৩. শীতকালে কোন কোন দিন তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নেমে যায়।

এই অঞ্চলের শীত-গ্রীষ্মের তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পশ্চিম হিমালয়ের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলো একবার মনে করে নাও। কোন পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছ? দেখত, এইগুলো কিনা—

পূর্ব হিমালয়ের তুলনায় পশ্চিম হিমালয়ে— ১. বৃষ্টিপাত অনেক কম। ২. গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের গড় তাপমাত্রা কম। ৩. শীতকালে প্রায় সমগ্র পশ্চিম হিমালয়ে ব্যাপকভাবে তুষারপাত হয়।

স্বাভাবিক উদ্ভিদ: তোমরা জান যে বেশি বৃষ্টি ও বেশি উত্তাপে বড় বড় গাছ জন্মায়। সিকিম-দার্জিলিং ও অরুণাচলের জলবায়ুতে তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রা বেশি। তাই এখানে ঘন অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে অরুণাচলে অরণ্যের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি।

পর্বতের পাদদেশে দাঁড়িয়ে তোমরা যদি ওপরদিকে তাকাও, তাহলে এই অরণ্যে পরপর কি কি গাছ দেখবে—

১. পর্বতের নিচের দিকে শাল, সেগুন, জারুল, গর্জন, বাঁশ, বেত ইত্যাদি গাছ।

২. এর ওপর ওক, চেস্টনাট, ম্যাপল, বার্চ ইত্যাদি চিরহরিৎ গাছ।

৩. আরও উঁচুতে বিভিন্ন সরলবর্গীয় গাছ যেমন পাইন, ফার ইত্যাদি। এই গাছগুলো দেখতে অনেকটা মোচা বা মন্দিরের মত।

৪. এর ওপর সাধারণত তৃণ ও গুল্ম।

যে গাছগুলোর পরিচয় পেলে, এগুলো ছাড়াও অরণ্যে নানা ধরনের মূল্যবান ভেষজ গাছ, লতা ইত্যাদি আছে।

মৃত্তিকা: এখানকার মাটি প্রধানত চার ধরনের—

১. পর্বতের পাদদেশে তরাই অঞ্চলে পাথর, নুড়ি ইত্যাদি মেশান তরাই মাটি আছে।

২. পর্বতের গায়ে মাটি বেশিদিন জমে থাকতে পারে না—ধুয়ে যায়। তাই ওসব স্থানে পাতলা ও অনুর্বর ক্ষয়জাত মাটি দেখা যায়।

৩. গভীর অরণ্য অঞ্চলের মাটিতে পাতা, লতা ইত্যাদি পচে মিশে যায়। তাই ঐ মাটি অতিরিক্ত হিউমাসযুক্ত।

৪. তিস্তা, তোরসা, জলঢাকা, ডিহং প্রভৃতি নদী উপত্যকাগুলোতে কাদা ও বালি মেশান পলি মাটি আছে।

খনিজ সম্পদ: তোমাদের আগেই বলেছি হিমালয়ের যে কোন অংশেই খনিজ সম্পদ পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তবে গভীর অরণ্য, বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি, যাতায়াতের দারুণ অসুবিধা ইত্যাদির জন্য ভাল করে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—কোথায় কি খনিজ দ্রব্য লুকিয়ে আছে।

যাইহোক এই প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও কিছু খনিজ উত্তোলিত হয়, তবে পরিমাণ খুবই সামান্য। যেমন দার্জিলিং ও সিকিমে কয়লা, তামা, সীসা, দস্তা, চুনাপাথর ইত্যাদি পাওয়া যায়। এর মধ্যে কয়লা ছাড়া অন্যগুলোর উৎপাদন খুব কম।

জীবজন্তু: বন্য জীবজন্তু কোথায় বেশি থাকে এবং কেন? —এই প্রশ্নের উত্তরে তোমরা নিশ্চয় বলবে—'এটা বলা খুবই সোজা—ওরা গভীর বনে বেশি থাকে, কারণ ওখানে নিরাপদে ঘোরাফেরা করতে পারে।'

আচ্ছা, তাই যদি হয় তবে পূর্ব হিমালয়ের কোথায় জীবজন্তু আছে, তুমি আগেই জেনে ফেলেছ। কারণ স্বাভাবিক উদ্ভিদ পড়ার সময় দেখেছ—এই অঞ্চলের কোথায় কোথায় গভীর বন আছে।

তাহলে এখন জেনে নাও ঐসব গভীর বনে কি কি জীবজন্তু আছে—বাঘ, চিতাবাঘ

ভল্লুক, গণ্ডার, হাতি, হরিণ, খরগোস প্রভৃতি অনেক আছে। এ ছাড়াও রয়েছে গর্তে নানা ধরনের বিষাক্ত সাপ, গাছে গাছে বানর ও রঙ-বেরঙের কত পাখি।

বিশেষ সিদ্ধান্ত ঃ তাহলে সিকিম-দার্জিলিং ও অরুণাচল হিমালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশে দেখা গেল যে, এখানকার অধিকাংশ স্থান বন্ধুর, নদীবহুল ও গভীর অরণ্যে ঢাকা। এই অঞ্চলের জলবায়ু আর্দ্র এবং মাটি বেশিরভাগ স্থানেই অনুর্বর। ভূ-গর্ভ থেকে খনিজ কম পাওয়া যায় তবে গভীর অরণ্যে অনেক জীবজন্তু আছে।

প্রশ্ন

ক. পূর্ব ও পশ্চিম হিমালয়ের জলবায়ুর মূল পার্থক্যগুলো কি ?

খ. সিকিম-দার্জিলিং ও অরুণাচলের অরণ্যে কি কি গাছ আছে ?

গ. এখানকার মাটি কি ধরনের ?

ঘ. এখানকার অরণ্যে কি কি জীব-জন্তু দেখা যায় ?

সিকিম-দার্জিলিং ও অরুণাচল হিমালয়ে—মানুষের অর্থ-নৈতিক ক্রিয়াকলাপ

কৃষিকাজ ঃ ভাল কৃষিকাজের জন্য দরকার সমতলভূমি, উর্বর মাটি, পরিমিত বৃষ্টিপাত ও উত্তাপ। এইসব উপাদান এই অঞ্চলের কৃষিকাজকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করে দেখ—

এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের আলোচনায় জেনেছ ঃ

ক. কতকগুলো সংকীর্ণ নদী উপত্যকা ছাড়া সমতলভূমি নেই বললেই চলে

খ. বেশিরভাগ স্থানেই মৃত্তিকার স্তর পাতলা ও অনুর্বর ;

গ. প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টিপাত বেশি, তাই অনেক স্থানে গভীর অরণ্য সৃষ্টি হয়েছে ;

ঘ. পর্বতের নিচের দিকে উত্তাপ কৃষিকাজের উপযোগী হলেও ওপরের দিকে ঠাণ্ডা বেশি এবং বরফ জমে থাকে।

তাহলে বুঝতে পারছ এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নত কৃষিকাজের সহায়ক নয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ সহায়ক না হলেও সিকিম-দার্জিলিং ও অরুণাচল প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসী জীবনধারনের জন্য কৃষিকাজের ওপর নির্ভর করে। তাই উৎপাদন হয় কম এবং বিভিন্ন ধরনের ফসলও বিশেষ চাষ করা যায় না। এবার এস দেখি এই অঞ্চলের অধিবাসীরা কি ভাবে কৃষি কাজ করে।

স্থানীয় পরিবেশের পার্থক্য ও অধিবাসীদের চাহিদা অনুসারে এখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রথায় চাষ করা হয়, যেমন—

ক. তিস্তা, তোরসা, জলঢাকা, ডিহং, সুবনসিরি প্রভৃতি নদীর ধারে সমভূমি ও উর্বর মাটি থাকার জন্য ধান, গম, যব, ভুট্টা, নানাধরনের সব্জি ও দানাশস্যের চাষ করা হয়।

খ. পাহাড়ের ঢালে ধাপ কেটে **সোপান চাষ** বেশি করা হয় সিকিম ও দার্জিলিং-এ। এইসব ধাপে ধান, আলু, আদা, চা, বড় এলাচ, কমলালেবু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় অর্ধেক জমিতে ধান চাষ করা হয়। এরপর বেশি চাষ চা-এর। এই চা খুব উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধপূর্ণ।

চা, সিঙ্কোনা, বড় এলাচ ও কমলালেবু **বাগিচা ফসল** হিসাবে সিকিম ও দার্জিলিং-এ চাষ করা হয় এবং

উৎপন্ন ফসল শুধু দেশের বিভিন্ন স্থানেই নয় বিদেশেও রপ্তানী করা হয়।

গ. অরুণাচল প্রদেশে **ঝুম প্রথায়** চাষ বেশি প্রচলিত। (ঝুম প্রথায় কি ভাবে চাষ করা হয়—তোমাদের মনে আছে? যদি মনে না থাকে তৃতীয় পাঠ খুলে একবার দেখে নাও) এখানকার প্রায় ৮০ শতাংশ স্থান অরণ্যে ঢাকা বলে ডাফলা, মনপা, মিশমি, মিরি, আবর প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা অরণ্য পরিষ্কার করে ঝুম প্রথায় চাষ করে এবং ধান, ভুট্টা, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতি ফলায়।

আজকাল অরুণাচল প্রদেশে সোপান চাষ ক্রমশ বাড়ছে। আর একটা লক্ষ্যণীয় জিনিস—যদি অরুণাচলের পশ্চিম থেকে পূর্বে ক্রমশ চলে যাও—ভিন্ন ধরনের ফসলের চাষ দেখতে পাবে। যেমন, পশ্চিমের কামেং জেলায় যব, গম, ভুট্টা; এর পূর্বে সুবানসিরি জেলায় ধান ও ভুট্টা; আরও পূর্বে সিয়াং জেলায় সরিষা ও ধান; এবং একেবারে পূর্বে লোহিত জেলায় গম, যব ও ধান ইত্যাদি।

খ. **পশুপালন:** পশ্চিম হিমালয় আলোচনার সময় তোমাদের বলেছি যে পশুপালন ঐ অঞ্চলের একটি প্রধান উপজীবিকা। কারণ পশ্চিম হিমালয়ের অল্প বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা জলবায়ু একদিকে যেমন তৃণভূমি গড়ে তুলতে সাহায্য করে অপরদিকে এই পরিবেশে মেষ, গরু, ছাগল ইত্যাদি সহজে পালন করা যায় এবং পশুগুলোও হয় সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

এখানে পশুপালনের অসুবিধা: কিন্তু তোমরা পূর্ব হিমালয় সম্পর্কে জেনেছ যে এখানের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র। এই পরিবেশে তৃণের বদলে বড় বড় গাছ জন্মায়, আর গরু, ছাগল ইত্যাদি পশুগুলি নানারকম রোগে আক্রান্ত হয়। এছাড়া এটা ত জানই যে ঠাণ্ডার জন্য মেষের গায়ে

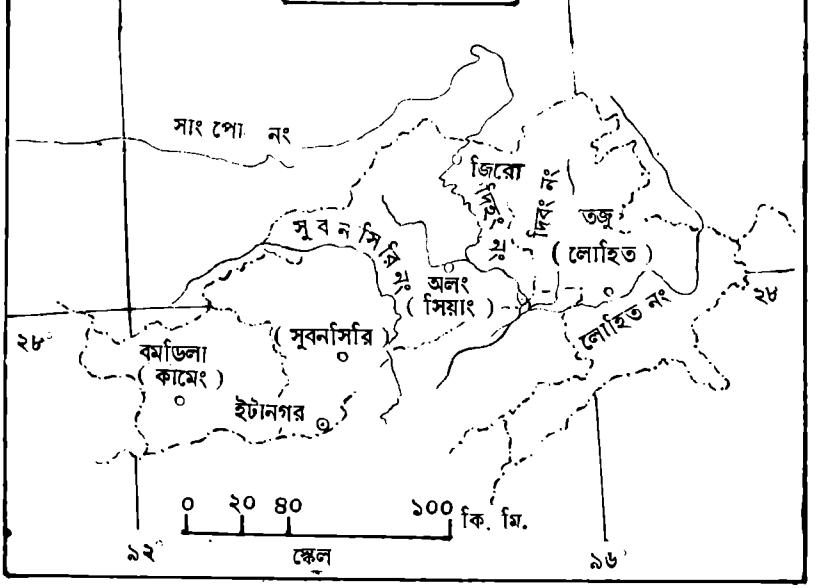

লোম বা পশম হয়। তাই উষ্ণ জলবায়ুতে এইসব পশু সহজে পালন করা যায় না।

তবে পর্বতের বেশ উঁচু'তে জলবায়ু যেখানে ঠাণ্ডা—বিশেষত দার্জিলিং ও সিকিম অঞ্চলে কিছু কিছু গরু, মেষ, ইয়াক প্রভৃতি আজকাল পালন করা হচ্ছে।

গ. **শিল্প**ঃ এখানে বড় শিল্প বিশেষ কিছু নেই। এর প্রধান কারণগুলো জেনে নাও—

১. বড় শিল্পের প্রয়োজনমত কাঁচামাল পাওয়া যায় না।

২. যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত নয়।

৩. চাহিদামত বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না।

৪. লোকবসতি কম তাই দক্ষ শ্রমিকের যথেষ্ট অভাব আছে।

এবার দেখা যাক এখানে কি কি শিল্প আছে—

১. দার্জিলিং অঞ্চলে অনেকগুলো **চা তৈরির কারখানা** আছে। এই অঞ্চলের উৎপাদিত চা পাতা থেকে এই চা তৈরি করা হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রেখ যে চা তৈরির কারখানা চা বাগিচার কাছেই গড়ে ওঠে। কারণ গাছ থেকে পাতা তোলার পর দূরের কারখানায় পাঠাতে অনেক সময় লাগে। এতে পাতা শুকিয়ে যায় এবং সুগন্ধও নষ্ট হয়।

২. সিকিমে বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন আপেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এইসব **ফলের** ওপর ভিত্তি করে কতকগুলো শিল্প গড়ে উঠেছে—যেমন ফল সংরক্ষণ, ফলের জেলি প্রস্তুত, ফলের রস থেকে মদ্য শিল্প ইত্যাদি। **রংফু** এই শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।

৩. **বাঁশ ও বেত** দিয়ে প্রায় সমগ্র অঞ্চলেই নানাধরনের হাতের কাজ করা হয়।

৪. এছাড়া কাঠের কাজ, সূতা কাটা ও কাপড় বোনা, পশম বস্ত্র বোনা, হাতব্যাগ তৈরি করা, দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরি করা ইত্যাদি **কুটীর শিল্প** এখানে আছে।

৫. পশ্চিম হিমালয়ের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে পর্যটন শিল্পের যেমন বিশেষ গুরুত্ব আছে—এখানে কিন্তু ততটা নয়। কারণ প্রধানত অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং থাকা-খাওয়ার জন্য হোটেল **টুরিস্টলজ** ইত্যাদির অভাব, তবে এরই মধ্যে কতকগুলো কেন্দ্র কিন্তু **পর্যটন শিল্পে** বেশ উন্নত যেমন—**দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং গ্যাংটক** প্রভৃতি।

ঘ. **জলবিদ্যুৎ**—তোমরা জেনেছ যে সমগ্র হিমালয় অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, শুধু উৎপাদন হয় কম। পূর্ব হিমালয়ে এর ব্যতিক্রম হতে পারে না।

এই অঞ্চলের ডিহং, তিস্তা, জলঢাকা, তোরসা প্রভৃতি নদীগুলো থেকে প্রচুর পরিমানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবে উৎপাদন হয় খুব সামান্য। বর্তমানে কার্সিয়াং-এর কাছে **পাগলাঝোরা নদী প্রকল্প**, সিকিমের **লাগিয়াপ্ প্রকল্প** প্রভৃতি এই ধরনের দু-চারটি কেন্দ্র আছে—সেখানে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। খরস্রোতা তিস্তা নদী থেকে আগামী কিছু দিনের মধ্যে জলবিদ্যুৎ তৈরি করা হবে।

ঙ. **যোগাযোগ ব্যবস্থা**—এখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা বেশ মুশকিল।

বাধা— পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি, খরস্রোতা নদী, গভীর অরণ্য, বর্ষাকালে ধ্বস ইত্যাদির জন্য এখানে রাস্তাঘাট বিশেষ তৈরী হয়নি।

কি আছে—এর মধ্যে দার্জিলিং-এর যাতায়াত ব্যবস্থা সিকিম ও অরুণাচলের তুলনায় কিছুটা উন্নত। শিলিগুড়ি থেকে

দার্জিলিং পর্যন্ত একটি ছোট রেলপথ আছে। এছাড়াও অনেক পাকা রাস্তা দার্জিলিং-এ আছে। নিচের চিত্রদুটিতে দার্জিলিং ও সিকিমের যাতায়াত ব্যবস্থা কেমন দেখে নাও—

সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশে কোনও রেলপথ নেই, তবে কিছু কিছু পাকা রাস্তা আছে। এই দুটি অঞ্চলের বেশিরভাগ রাস্তাই কাঁচা—এর মধ্যে কয়েকটি জীপ গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত।

চ. জনবসতি—এতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ব হিমালয়ের প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে যে আলোচনা করা হল, তা থেকে তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ যে জীবন ধারনের উপযোগী পরিবেশ পূর্ব হিমালয়ের খুব কম জায়গাতেই রয়েছে। সত্যিই তাই—সমগ্র হিমালয় অঞ্চলের মধ্যে এই পূর্ব অংশটি সর্বাপেক্ষা জনবিরল। নিচের পরিসংখ্যানগুলো দেখ, সহজেই বুঝতে পারবে—কত কম লোক বাস করে।

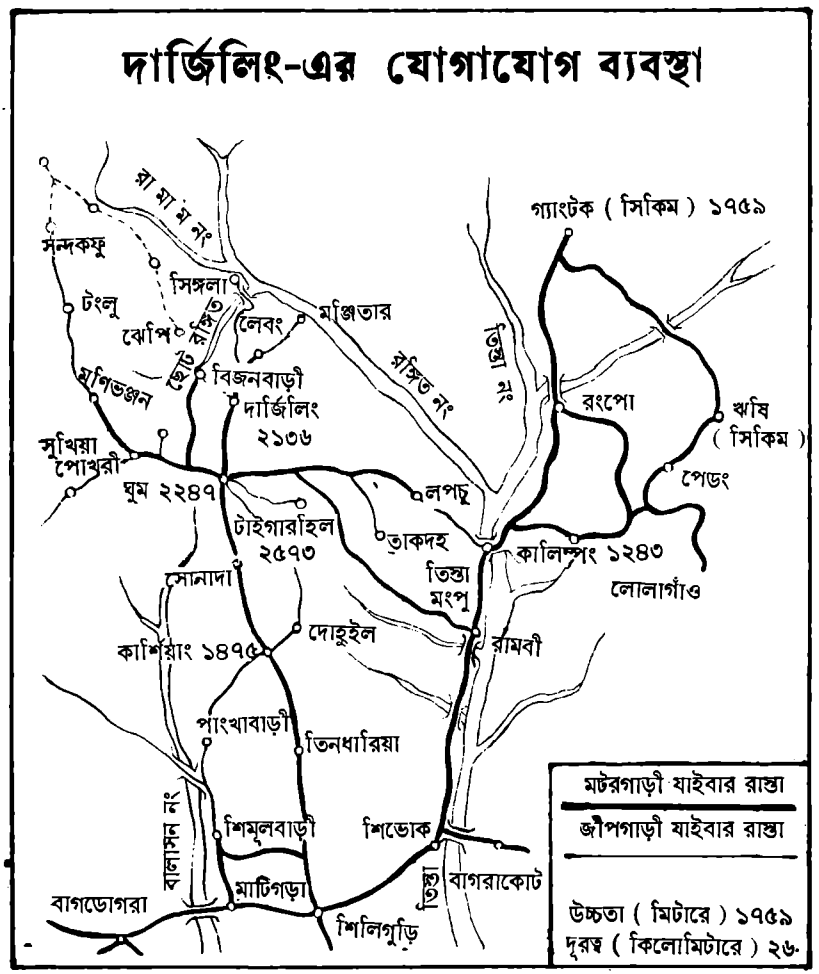

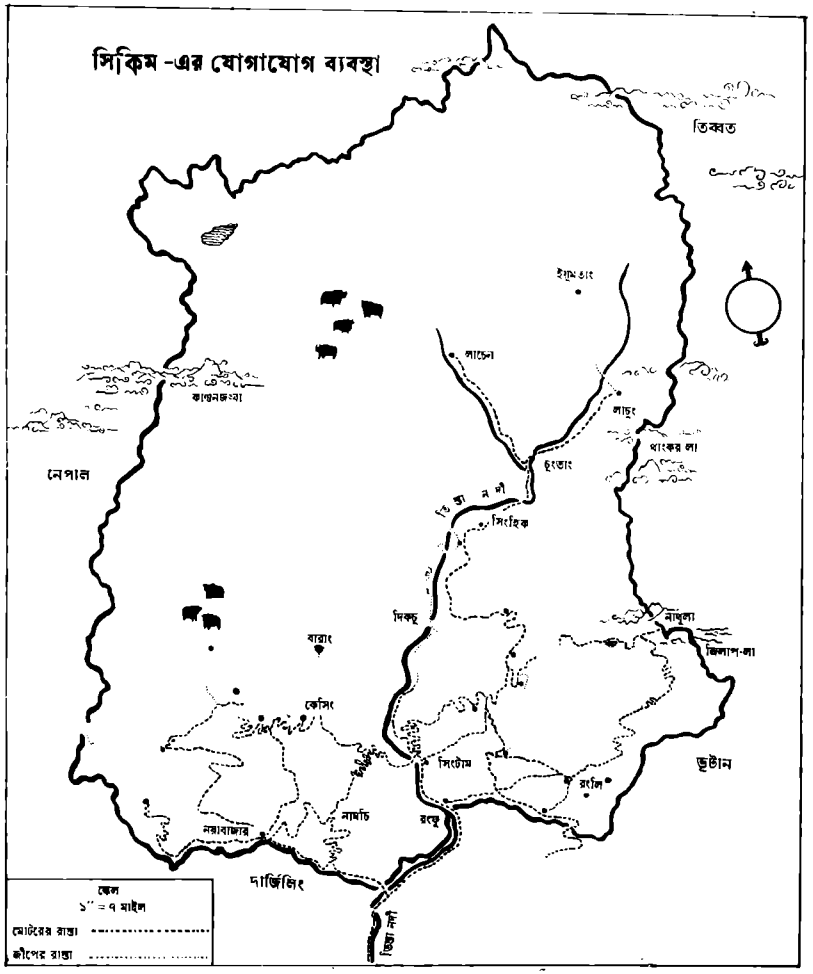

এছাড়া এই পরিসংখ্যান থেকে দার্জিলিং, সিকিম ও অরুণাচল প্রদেশের জনবসতির পার্থক্য তুলনা করে নাও—

নাম	আয়তন (বর্গ কি. মি.)	লোকসংখ্যা (১৯৭১)	লোকসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি. মি.)
দার্জিলিং	৩,০৭৫	৭,৮১,৭৭৭	২৫৪
সিকিম	৭,২৯৯	২,০৯,৮৪৩	২৯
অরুণাচল প্রদেশ	৮৩,৫৭৮	৪,৬৭,৫১১	৬

লক্ষ্য করে দেখ, দার্জিলিং অঞ্চলের লোকবসতি সিকিম ও অরুণাচলের তুলনায় বেশি। এর কারণগুলো জেনে নেওয়া যাক—

দার্জিলিং-এ বেশি কেন—দার্জিলিং-এর চা বাগান, পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে এর গুরুত্ব, মোটামুটি উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি অর্থাৎ জীবিকা নির্বাহের কিছুটা সুবিধা এখানে আছে, তাই লোকবসতি বেশি।

সিকিম ও অরুণাচলে কম কেন--অপর দিকে সিকিম ও অরুণাচলে পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি, গভীর অরণ্য, অনুন্নত কৃষিকাজ রাস্তাঘাটের অভাব এবং জীবিকা নির্বাহের অসুবিধার জন্য লোক খুব কম থাকে। বিশেষত অরুণাচলে লোকবসতি খুব কম—প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৬ জন মাত্র।

গ্রাম—সমগ্র পূর্ব হিমালয়ের অধিবাসীদের মধ্যে বেশিরভাগই গ্রামে থাকে। পর্বত ও গভীর অরণ্যের জন্য এক একটি গ্রাম অনেক দূরে দূরে গড়ে উঠেছে এবং গ্রামের মধ্যে বাড়িগুলোও বিচ্ছিন্ন।

গভীর অরণ্য লোকবসতি বিস্তারে বাধাস্বরূপ হলেও বাড়ি তৈরিতে কিন্তু সাহায্য করে, কারণ অরণ্যের কাঠ দিয়েই অধিকাংশ বাড়ি তৈরি হয়। এছাড়া বাড়ি তৈরিতে পাথর ও মাটি ব্যবহার করা হয়।

শহর—এখানে শহরের সংখ্যা খুব কম, দার্জিলিং অঞ্চলের—**দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, সিকিমের গ্যাংটক,** অরুণাচলের **বোমডিলা, ইটানগর** প্রভৃতি এখানকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শহর। এর মধ্যে অধিকাংশ শহরের জন্ম হয়েছে পর্যটন কেন্দ্র বা প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে।

দার্জিলিং-এর কথা একটু আলাদা করে জেনে নাও: প্রায় ২৩০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত দার্জিলিং পূর্ব হিমালয়ের সবচেয়ে বড় শহর। এর লোকসংখ্যা প্রায় ৪৩,০০০। দার্জিলিং - এর প্রাকৃতিক পরিবেশ খুব মনোরম। তাই প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ পর্যটক এখানে বেড়াতে আসেন। পরিষ্কার দিনে এখান থেকে বরফে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা খুব সুন্দর দেখা যায়।

সিদ্ধান্ত: পূর্ব হিমালয়ের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ খুব অনুন্নত। তবে সিকিম ও অরুণাচলের তুলনায় দার্জিলিং-এ কৃষিকাজ উন্নত এবং শিল্প রাস্তাঘাট ও লোকবসতি বেশি আছে।

প্রশ্ন

ক. পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে কৃষিকাজের পরিচয় দাও।

খ. অরুণাচল প্রদেশে কৃষিকাজ কি কি ভাবে করা হয়?

গ. পূর্ব হিমালয়ের প্রধান শিল্পগুলোর নাম কি?

ঘ. দার্জিলিং-এর পরিবহন ব্যবস্থা কিরূপ?

ঙ. সিকিম ও অরুণাচলে জনবসতি খুব কম কেন?

চ. দার্জিলিং, সিকিম ও অরুণাচলের প্রধান শহরগুলোর নাম কি?

সমগ্র হিমালয় অঞ্চলের ভৌগোলিক আলোচনা শেষ হল। এখন এস, হিমালয়ের আর একটা পরিচয় জেনে নেওয়া যাক—। উত্তর দিকে প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে থেকে হিমালয় পর্বতমালা ভারতের কি উপকার করে?

এটা ঠিক যে হিমালয় অঞ্চল নিজে অনুন্নত। কিন্তু তোমাদের যদি বলি ভারতের বাকি প্রায় সব অঞ্চলের উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ এই হিমালয়—বিশ্বাস করবে কি? আচ্ছা, তাহলে দেখ—

হিমালয়ের উপকারিতা:

১. দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু হিমালয়ে বাধা পায় বলে প্রায় সারা ভারতে বৃষ্টি হয়।

এই বৃষ্টি না হলে শুধু ধান, পাট, চা, তুলা, আখ ইত্যাদি চাষ করা যেত না তাই নয়, ভারতের অধিকাংশ স্থান বৃষ্টির অভাবে মরুভূমি হয়ে যেত।

২. শীতকালে উত্তরের সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে আসা কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস হিমালয়ে বাধা পায় বলে সমগ্র উত্তর ভারত প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পায়।

৩. হিমালয়ের বরফগলা জল পায় বলে উত্তর ভারতের নদীগুলোতে সারাবছর জল থাকে। এতে চাষ-আবাদ, যাতায়াত ও ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হয়।

৪. সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং এদের বিভিন্ন উপনদী হিমালয় অঞ্চল থেকে প্রচুর পরিমাণে পলি বয়ে এনে উত্তর ভারতের বিরাট উর্বর সমভূমি অঞ্চল গড়ে তুলেছে। এই সমভূমিতে ভারতের সবচেয়ে বেশি ফসল উৎপন্ন হয়।

৫. পার্বত্য অঞ্চলের খরস্রোতা নদীগুলো জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সাহায্য করে।

৬. মূল্যবান নরম কাঠ পাওয়া যায়।

৭. প্রচুর পরিমাণে চা ও বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হয়।

৮. উত্তর দিকে প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে থেকে ভারতকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

৯. হিমালয়ের প্রাকৃতিক শোভা দেখতে বিদেশ থেকে বহু পর্যটক আসে—ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়।

এগুলো প্রধান, এছাড়া আরও নানাভাবে হিমালয় আমাদের উপকার করে।

গৌতম মল্লিক

ভারতের প্রভাব গুয়াতেমালায়

সুদূর গুয়াতেমালায় পাওয়া গেছে পাথরের নৃসিংহ, বিষ্ণু ও কূর্মাবতারের মূর্তি। এছাড়া কানাড়া তেলেগু লিপিতে খোদাই শিলালিপি। এই তথ্যের ভিত্তিতে ভারতীয় ইতিহাস পুনর্লেখন প্রতিষ্ঠানের আজীবন সদস্য ড.এফ. বেনুগোপালাচারী দাবি করেছেন প্রাক স্পেনীয় আমেরিকা বৃহত্তর ভারতেরই অংশ ছিল। দীর্ঘ অনুসন্ধানে তিনি জেনেছেন সেখানকার তৎকালীন বাসিন্দাদের আচার-ব্যবহার থেকে শুরু করে পোশাক-পরিচ্ছদও ছিল ভারতীয়দের মত। মহিলারা মাথার চুলে দীর্ঘ বিনুনি করতেন। শাড়ি পরতেন। ভারতীয় রীতি অনুযায়ী নিজেদের অলঙ্কারে সজ্জিত করতেন।

কর্নাটকের গ্রামে প্রসবান্তে মা ও শিশুকে বাষ্পস্নান করান হয়, এবং মা একমাস গোলমরিচের নির্যাস পানীয়ের সঙ্গে সেবন করেন। গুয়াতেমালায়ও তেমন প্রথা চালু ছিল। এছাড়া নিরামিষাশী মেক্সিকানরা এখনও প্রতি বছর ১ নভেম্বর দীপাবলী পালন করে থাকেন। শ্রীবেনুগোপালাচারী তাঁর গবেষণার একটি তালিকা তৈরি করেছেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন প্রাক-স্পেনিয় শাসকরা তেলেগু ও সংস্কৃতে ১০০টি শব্দ ব্যবহার করতেন।

গণিত

পাটিগণিত

গত সংখ্যায় আমরা আলোচনা করেছি যে দুই জাতীয় পরিবর্তনশীল রাশির মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে এবং তার থেকে নানারকম প্রশ্ন সমাধান করা যায়। এবারে দেখা যাক, একটি পরিবর্তনশীল রাশি যদি একাধিক পরিবর্তনশীল রাশির ওপর নির্ভর করে তাহলে কিভাবে সমস্যাগুলো সমাধান করা যায়।

ধর, একটি বাড়ি তৈরির জন্য কিছু রাজমিস্ত্রি নিযুক্ত করা হল। প্রত্যেক রাজমিস্ত্রি যত বেশি দিন কাজ করবে তত বেশি উপার্জন করবে। আবার দৈনিক যত বেশি সময় কাজ করবে তত বেশি উপার্জন করবে। তাহলে একজন রাজমিস্ত্রির উপার্জনের পরিমাণ নির্ভর করছে সে (1) কতদিন কাজ করবে ও (2) দৈনিক কত সময় ধরে কাজ করবে—এই দুই জাতীয় রাশির ওপর। এই ধরনের সম্পর্ককে যৌগিক ভেদ বলে।

● দুই বা ততোধিক পরিবর্তনশীল রাশির মধ্যে সাধারণ সম্পর্ক। ●

একটি পরিবর্তনশীল রাশি যখন একাধিক পরিবর্তনশীল রাশির সঙ্গে যৌগিক ভেদ সম্পর্কযুক্ত হয়, তখন প্রথম রাশিটি ঐ একাধিক রাশির গুণফলের সঙ্গে সমানুপাতী হয়।

উপরের উদাহরণে উপার্জনের পরিমাণ (1) কতদিন কাজ করবে সেই দিনের সংখ্যার সমানুপাতী এবং (2) দৈনিক কত সময় ধরে কাজ করবে তার সমানুপাতী। অতএব এই তিনটি রাশির মধ্যে সাধারণ সম্পর্ক হল, উপার্জনের পরিমাণ—কতদিন কাজ করবে এবং দৈনিক কত সময় ধরে কাজ করবে এই দুটি রাশির গুণফলের সমানুপাতী। অর্থাৎ,

উপার্জনের পরিমাণ (দিনের সংখ্যা × দৈনিক কাজের সময়)

তৃতীয় সমস্যা ঃ তিন প্রকার রাশির দুটি করে মোট 6টি রাশির মধ্যে 5টি রাশি দেওয়া থাকল আর অবশিষ্টটি নির্ণয় করতে হবে।

পদ্ধতি ঃ অবশিষ্ট রাশিটি x ধরে তিন রকম রাশির জন্য তিনটি কলম তৈরি কর এবং 6টি রাশি দিয়ে তা পূর্ণ কর। এবার এক প্রকার রাশির সঙ্গে অবশিষ্ট দুই প্রকার রাশির কি ধরনের সম্পর্ক পৃথক পৃথক ভাবে দেখে নাও, অর্থাৎ সমানুপাতী না ব্যস্তসমানুপাতী। দুই প্রকার রাশির মধ্যে সম্পর্ক বের করার সময় অবশিষ্ট রাশিটি স্থির অর্থাৎ পরিবর্তিত হয় না ধরে নিতে হবে। ফলে দুটি সমানুপাত পাওয়া যাচ্ছে। এবার যখন তিন প্রকার রাশিই পরিবর্তনশীল হবে, তখন প্রথম রাশিটি অপর দুটি রাশির গুণফলের সমানুপাতী হবে। খেয়াল রাখতে হবে কোন এক প্রকার রাশি ব্যস্তসমানুপাতে থাকলে তৃতীয় ও চতুর্থ রাশির স্থান পরিবর্তন হবে।

1 নম্বর প্রশ্ন ঃ 12 জন লোক দৈনিক 8 ঘণ্টা খেটে 20 দিনে একটি কাজ করতে পারে। 16 জন লোক দৈনিক 5 ঘণ্টা খেটে কত দিনে কাজটি সম্পন্ন করতে পারবে ?

সমাধান ঃ মনে করি 16 জন লোক দৈনিক 5 ঘণ্টা খেটে x দিনে কাজটি সম্পন্ন করবে।

দিনের সংখ্যা	লোকসংখ্যা	দৈনিক কাজের সময়
20	12	8 ঘণ্টা
x	16	5 ঘণ্টা

এখন দৈনিক কাজের সময় না পাল্টালে—লোক বেশি হলে কম দিনে কাজটি সম্পন্ন হবে।

দিনের সংখ্যা, লোকের সংখ্যার ব্যস্তসমানুপাতী

$20 : x = 16 \quad 12 \cdots\cdots\cdots (1)$

আবার লোকের সংখ্যা একই রেখে—দৈনিক কাজের সময় বাড়ালে কম দিনে কাজটি সম্পন্ন হবে।

দিনের সংখ্যা, দৈনিক কাজের সময়ের ব্যস্তসমানুপাতী।

$20 : x = 5$ ঘণ্টা 8 ঘণ্টা $= 5 : 8 \cdots\cdots\cdots\cdots (2)$

দৈনিক কাজের সময় ও লোকসংখ্যা উভয়ই পরিবর্তনশীল হলে যৌগিক ভেদের নিয়ম অনুসারে (1) ও (2) নম্বর থেকে পাওয়া যায়,

$20 \cdot x = (16 \times 5) \quad (12 \times 8) = 80 \quad 96$

$$\frac{20}{x} = \frac{\overset{5}{\cancel{80}}}{\underset{6}{\cancel{96}}} = \frac{5}{6}$$

or, $x5 = 20 \times 6$

$$x = \frac{\overset{4}{\cancel{20}} \times 6}{\cancel{5}} = 24$$

16 জন লোক প্রত্যহ 5 ঘণ্টা খেটে 24 দিনে কাজটি সম্পন্ন করবে।

জটিলতা বৃদ্ধি ঃ যদি ওপরের ঐ প্রশ্নটি সব ঠিক রেখে শেষে একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করা হয়—16 জন লোক প্রত্যহ 5 ঘণ্টা খেটে কতদিনে ঐ কাজটির দ্বিগুণ কাজ সম্পন্ন করতে পারবে ?

সমাধান ঃ আগের মত বের করে নাও প্রথমে—16 জন লোক প্রত্যহ 5 ঘণ্টা খেটে 24 দিনে কাজটি সম্পন্ন করতে পারে। স্বভাবতই দ্বিগুণ পরিমাণ কাজ করতে হলে দিনের সংখ্যা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করতে হবে। অর্থাৎ $2 \times 24 = 48$ দিন লাগবে।

অনুশীলনের জন্য ঃ প্রতিদিন 8 ঘণ্টা কাজ করে 50 জনে একটি কাজ 12 দিনে করতে পারে, প্রত্যহ কত ঘণ্টা খেটে 60 জন লোক 16 দিনে দ্বিগুণ কাজ সম্পন্ন করবে

[10 ঘণ্টা]

চতুর্থ সমস্যা ঃ অনেক সময় একটি অঙ্কের মধ্যে দুটি ভেদের অঙ্ক লুকান থাকে।

2 নম্বর প্রশ্ন ঃ 8 জন পুরুষ বা 15 জন স্ত্রীলোক 30 দিনে 1200 টাকা উপার্জন করে। 20 জন পুরুষ ও 24 জন স্ত্রীলোক 5 দিনে কত উপার্জন করবে।

ব্যাখ্যা ঃ প্রশ্নটিতে প্রথমেই 8 জন পুরুষ বা 15 জন স্ত্রীলোক কথাটি আছে। প্রশ্নটি পড়লে বোঝা যায় যে এতে দুটি অঙ্ক আছে। (1) 8 জন পুরুষ 30 দিনে 1200

টাকা উপার্জন করলে 20 জন পুরুষ 5 দিনে কত টাকা উপার্জন করবে? (2) 15 জন স্ত্রীলোক 30 দিনে 1200 টাকা উপার্জন করলে 24 জন স্ত্রীলোক 5 দিনে কত টাকা উপার্জন করবে? তারপর প্রশ্ন এই দুটি উপার্জনের সমষ্টি বের করতে হবে।

পদ্ধতি ঃ দুটি যৌগিক ভেদ থেকে প্রথমটিতে মোট উপার্জন x টাকা ধরে এবং দ্বিতীয়টিতে y টাকা ধরে x ও y-এর মান বের কর। পরে $x+y=$ কত বের কর।

সমাধান ঃ মনে করি 20 জন পুরুষ 5 দিনে মোট x টাকা উপার্জন করে এবং 24 জন স্ত্রীলোক 5 দিনে মোট y টাকা উপার্জন করে।

	লোকের সংখ্যা	দিনের সংখ্যা	মোট উপার্জন
(1)	8 জন পুরুষ	30	1200 টাকা
	20 "	5	x
(2)	12 জন স্ত্রীলোক	30	1200 টাকা
	24	5	y "

(1) যখন দিনের সংখ্যা স্থির তখন লোকের সংখ্যা বাড়লে মোট উপার্জন বেশি হবে। মোট উপার্জন লোকসংখ্যার সমানুপাতী।

(2) যখন লোকের সংখ্যা স্থির তখন বেশি দিন কাজ করলে মোট উপার্জন বেশি হবে। মোট উপার্জন, দিনের সংখ্যার সমানুপাতী।

তাহলে প্রথম ক্ষেত্র $1200 \quad x = 8 : 20$

এবং $1200 \quad x = 30 : 5$

$1200 : x = (8 \times 30) \quad (20 \times 5) = 240 \quad 100$

$$\frac{1200}{x} = \frac{\overset{12}{\cancel{240}}}{\underset{5}{\cancel{100}}} = \frac{12}{5}$$

or, $12x = 1200 \times 5$

$$x = \frac{\overset{100}{\cancel{1200} \times 5}}{\cancel{12}} = 500$$

20 জন পুরুষ 5 দিনে মোট 500 টাকা উপার্জন করবে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে

$1200 \quad y = 15 \quad 24$

এবং $1200 : y = 30 : 5$

$1200 : y = (15 \times 30) : (24 \times 5) = 450 : 120$

$$\frac{1200}{y} = \frac{450}{120} = \frac{\overset{15}{\cancel{45}}}{\underset{4}{\cancel{12}}} = \frac{15}{4}$$

or $15y = 1200 \times 4$

$$y = \frac{1200 \times 4}{15} = 320$$

24 জন স্ত্রীলোক 5 দিনে মোট 320 টাকা উপার্জন করবে।

এখন $x + y = 500 + 320 = 820$

20 জন পুরুষ ও 24 জন স্ত্রীলোক 5 দিনে মোট 820 টাকা উপার্জন করবে।

অনুশীলনের জন্য ঃ 10 জন পুরুষ অথবা 15 জন স্ত্রীলোক 20 দিনে 1200 টাকা উপার্জন করে। 16 জন পুরুষ ও 22 জন স্ত্রীলোক 12 দিনে কত টাকা উপার্জন করবে।

[2208 টাকা]

জটিলতা বৃদ্ধি ঃ এই ধরনের অঙ্ক যদি সময় ও কার্য দিয়ে থাকে এবং দিনের সংখ্যা বের করতে দেয় তাহলে 1 দিনে কত অংশ কাজ করা হয় তা বের করতে হয়। তারপর সম্পূর্ণ কাজটি কতদিনে হয় তা বের করতে হয়।

3 নম্বর প্রশ্ন ঃ 8টি বলদ বা 6টি ঘোড়া কোন জমির ঘাস 20 দিনে খেতে পারে। ঐ ঘাস 6টি বলদ ও 8টি ঘোড়া কতদিনে খাবে ?

সমাধান ঃ প্রশ্ন অনুসারে

8টি বলদ বা 6টি ঘোড়া 1 দিনে $\frac{1}{20}$ অংশ ঘাস খায়

মনে করি 6টি বলদ 1 দিনে x অংশ ঘাস খায়

এবং 8টি ঘোড়া 1 দিনে y

	ঘোড়া বা বলদের সংখ্যা	দৈনিক ঘাস খাওয়ার পরিমাণ
(1)	8টি বলদ	$\frac{1}{20}$ অংশ
	6টি	x
(2)	6টি ঘোড়া	$\frac{1}{20}$
	8টি	y

এখানে ঘোড়া বা বলদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে বেশি অংশ ঘাস খাবে।

ঘোড়া বা বলদের সংখ্যা, দৈনিক ঘাস খাওয়ার পরিমাণের সমানুপাতী।

প্রথম ক্ষেত্রে $8 : 6 = \frac{1}{20} \quad x$

or $\frac{8}{6} = \frac{1/20}{x} = \frac{1}{20x}$

or $160x = 6 \qquad x = \frac{6}{160} = \frac{3}{80}$ (3, 80 কেটে লেখা)

6টি বলদ 1 দিনে $\frac{3}{80}$ অংশ ঘাস খায়

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে

$$6 : 8 = \frac{1}{20} \quad y$$

or $\frac{6}{8} = \frac{1/20}{y} = \frac{1}{20y}$

or $120y = 8 \qquad y = \frac{8}{120} = \frac{1}{15}$

8টি ঘোড়া 1 দিনে $\frac{1}{15}$ অংশ ঘাস খায়

6টি বলদ ও 8টি ঘোড়া 1 দিনে ঘাস খায় $\left(\frac{3}{80}+\frac{1}{15}\right)$ অংশ

$$= \frac{9+16}{240}$$

$$= \frac{25}{240}$$

$$= \frac{5}{48}$$

6টি বলদ ও 8টি ঘোড়া জমির ঘাসটি খাবে

মোট $\left(1 \div \frac{5}{48}\right)$ দিনে $= 1 \times \frac{48}{5}$ দিনে $= \frac{48}{5}$ দিনে

$= 9\frac{3}{5}$ দিনে

অনুশীলনের জন্য ঃ 10 জন পুরুষ অথবা 15 জন বালক 30 দিনে কোন কাজ করতে পারে। 2 জন পুরুষ ও 7 জন বালক একত্রে ঐ কাজ কতদিনে করতে পারবে [45 দিন]

বীজগণিত

আগের সংখ্যায় আমরা 'মিডল টার্ম'-এর অঙ্ক আরম্ভ করেছিলাম। এবারেও সেই আলোচনা চলবে।

কখনও কখনও দ্বিমাত্রিক রাশিটি x^2+ax+b আকারে সোজাসুজি না দিয়ে $1+ax+bx^2$ আকারে দেওয়া থাকে। তখনও একই পদ্ধতিতে সমাধান করবে।

(1) $1-5x-36x^2$

রাফ গণনা ঃ x^2-এর সহগ 36, x বর্জিত পদ 1.

$-36 \times 1 = -36$. আবার x-এর সহগ -5.

এখন $-36 = -4 \times 9$, $4 \times (-9)$, -12×3, $12 \times (-3)$, -18×2, $18 \times (-2)$, -36×1, $36 \times (-1)$. এর মধ্যে $-9+4 = -5$.

সমাধান ঃ $1-5x-36x^2$

$= 1-9x+4x-36x^2$

$= 1(1-9x)+4x(1-9x)$

$= (1-9x)(1+4x)$.

অনুশীলনের জন্য ঃ $1 + 5x - 36x^2$

উত্তর ঃ $(1 + 9x)(1 - 4x)$.

কখনও কখনও দ্বিমাত্রিক রাশিটি $x^2 + axy + by^2$ আকারে থাকে। তখন x^2-এর সহগ ও y^2-এর সহগ, এই দুটি সহগের গুণফল অনুসারে xy-এর সহগ a-কে ভাঙ্গাতে হবে। পরবর্তী পদক্ষেপ একরূপ।

(2) $x^2 - 10xy - 39y^2$

রাফ গণনা ঃ x^2-এর সহগ 1, y^2--এর সহগ -39. $1 \times (-39) = -39$. আবার xy-এর সহগ -10.

এখন $-39 = -13 \times 3$, $13 \times (-3)$, -39×1, $39 \times (-1)$-এর মধ্যে $-13 + 3 = -10$.

সমাধান ঃ x^2 $10xy$ $39y^2$

$= x^2$ $13xy + 3xy$ $39y^2$

$= x(x - 13y) + 3y(x - 13y)$

$(x - 13y)(x + 3y)$.

অনুশীলনের জন্য ঃ $x^2 - 8xy - 20y^2$, উত্তর ঃ $(x$ $10y)(x + 2y)$

অনেক সময় $x^2 + ax + b$ আকারের রাশির বদলে $x^4 + ax^2 + b$ আকারের রাশি থাকে। কিন্তু x^2 y ধরলে x^4 y^2 হয় এবং তখন রাশিটি $y^2 + ay + b$ আকারে পরিণত হয় অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক রাশির আকার ধারণ করে। কাজেই একইভাবে সমাধান করা যায়।

(3) x^4 $10x^2$ 16

রাফ গণনা ঃ x^4-এর সহগ 1, x বর্জিত পদ 16. $1 \times 16 = 16$. আবার x^2-এর সহগ -10.

এখন $16 = -8 \times 2$, $-8 \times (-2)$, 16×1, $16 \times (-1)$, 4×4, $-4 \times (-4)$, এর মধ্যে $-8 - 2$ 10.

সমাধান ঃ $x^4 - 10x^2 + 16$

$= x^4$ $8x^2$ $2x^2 - 16$

$= x^2(x^2$ $8)$ $2(x^2 - 8)$

$= (x^2$ $8)(x^2$ $2)$

অনুশীলনের জন্য ঃ $x^4 + 2x^2 - 3$ উত্তর ঃ $(x^2 + 3)(x + 1)(x - 1$

আবার অনেক সময় $x^2 + ax + b$ আকারের রাশির বদলে x^6 $ax^3 + b$ আকারের রাশি থাকে। কিন্তু x^3 y ধরলে $x^6 = y^2$ হয় এবং তখন রাশিটি y^2 $ay + b$ আকারে পরিণত হয়। অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক রাশির আকার ধারণ করে। কাজেই একইভাবে সমাধান করা যাবে।

(4) $x^6 - 7x^3 - 12$

রাফ গণনা ঃ x^6-এর সহগ 1, x বর্জিত পদ 12. 1×12 12

x^3-এর সহগ -7.

এখন $12 = 4 \times 3$, $-4 \times (-3)$, 6×2, -6 (-2) 12 1, $(-12) \times (-1)$. এর মধ্যে -4 3 7.

সমাধান ঃ

$$\begin{aligned} & x^6 - 7x^3 + 12 \\ = \; & x^6 - 4x^3 - 3x^3 + 12 \\ = \; & x^3(x^3 - 4) - 3(x^3 - 4) \\ = \; & (x^3 - 4)(x^3 - 3) \end{aligned}$$

অনুশীলনের জন্য ঃ $a^6 - 7a^3 - 60$; উত্তর ঃ $(a^3 - 12)(a^3 + 5)$

অনেক সময় x^2-এর বদলে একটি রাশিগোষ্ঠীর হোলস্কোয়ার বা বর্গ থাকে এবং x-এর বদলে সেই একই রাশিগোষ্ঠী থাকে।

পদ্ধতি ঃ ঐ রাশিগোষ্ঠীকে অন্য কোন একটি অক্ষর (যেমন a, b ইত্যাদি) দ্বারা প্রকাশ কর। তাহলে দ্বিমাত্রিক রাশির আকার ধারণ করবে। তখন আগের মত সমাধান করবে।

(5) $(x^2 + x)^2 + 30(x^2 + x) + 81$

আলোচনা ঃ এখানে $x^2 + x = a$ ধরলে রাশিটি $a^2 + 30a + 81$-তে পরিণত কর।

রাফ গণনা ঃ a^2-এর সহগ 1, a বর্জিত পদ 81. 1×81 a-র সহগ 30.

এখন $81 = 27 \times 3$, $-27 \times (-3)$, 9×9. $-9 \times (-9)$, 81×1, $-81 \times (-1)$ এরমধ্যে $27 + 3 = 30$.

সমাধান ঃ

$$\begin{aligned} & (x^2 + x)^2 + 30(x^2 + x) + 81 \\ = \; & a^2 + 30a + 81 \qquad [\, x^2 + x = a \text{ ধরে }] \\ = \; & a^2 + 27a + 3a + 81 \\ = \; & a(a + 27) + 3(a + 27) \\ = \; & (a + 27)(a + 3) \\ = \; & (x^2 + x + 27)(x^2 + x + 3) \end{aligned}$$

আলোচনা ঃ শেষ লাইনে দেখা গেল দুটি দ্বিমাত্রিক রাশির উৎপাদক। সম্ভব হলে এই দুটি রাশিকে একইভাবে উৎপাদকে পরিণত করতে হবে। অবশ্য এই অঙ্কে এই রাশি দুটিকে অর্থাৎ $x^2 + x + 27$ এবং $x^2 + x + 3$ কে আর উৎপাদকে বিশ্লিষ্ট করা যায় না।

অনুশীলনের জন্য ঃ $(x^2 + 2x) + 12(x^2 + 2x) - 45$

উত্তর ঃ $(x^2 + 2x + 15)(x + 3)(x - 1)$

কখনও কখনও মাঝখানের রাশিটি $a^2 - b^2$ আকারের থাকে। মুড়ো এবং ল্যাজাতে অর্থাৎ প্রথম ও শেষ রাশি দুটি $(a + b)^2$ এবং $(a - b)^2$ আকারের হয়। যেমন—

(6) $(a + 3b)^2 - 6(a^2 - 9b^2) - 7(a - 3b)^2$

পদ্ধতি ঃ $a^2 - b^2$ আকারের পদটিকে $(a + b)(a - b)$ আকারে প্রকাশ করে $a + b$ এবং $a - b$-কে x ও y ধর। ফলে দ্বিমাত্রিক রাশির আকৃতি পাবে। তারপর আগের মত সমাধান করতে হবে।

সমাধান ঃ

$$\begin{aligned} & (a + 3b)^2 - 6(a^2 - 9b^2) \quad 7(a \quad 3b)^2 \\ = \; & (a + 3b)^2 - 6\{a^2 - (3b)^2\} - 7(a - 3b)^2 \\ = \; & (a + 3b)^2 - 6(a + 3b)(a \quad 3b) \quad 7(a - 3b)^2 \end{aligned}$$

$= x^2 - 6xy - 7y^2$ [$a + 3b = x$ এবং $a - 3b = y$ ধরে]
$= x^2 - 7xy + xy - 7y^2$ [$\because 1 \times -7 = -7$ আবার $-7 + 1 = -6$]
$= x(x - 7y) + y(x - 7y)$
$= (x - 7y)(x + y)$
$= \{(a + 3b) - 7(a - 3b)\}\{(a + 3b) + (a - 3b)\}$
$= (a + 3b - 7a + 21b)(a + 3b + a - 3b)$
$= (-6a + 24b)2a$
$= 2a.3(-2a + 8b)$
$= 3.2a(-2a + 8b)$

অনুশীলনের জন্য ঃ

(1) $(x + a)^2 - 7(x^2 - a^2) - 120(x - a)^2$
(2) $(2a - 3b)^2 - (4a^2 - 9b^2) - 2(2a + 3b)^2$

উত্তর ঃ (1) $2 \times 3 \times 3(x + a)(8a - 7x)$ (2) $-2 \times 2a(2a + 9b)$

বিশেষ ধরনের সমস্যা ঃ অনেক সময় চারটি রাশির গুণফলের সঙ্গে একটি সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করা থাকে। যেমন—

(7) $(x + 1)(x + 3)(x + 5)(x + 7) + 15$

আলোচনা ঃ লক্ষ্য হবে রাশিটিকে দ্বিমাত্রিক রাশির আকারে প্রকাশ করে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

ব্যাখ্যা সহকারে পদ্ধতি বর্ণনা ঃ

প্রদত্ত রাশিতে যে $x + 1$, $x + 3$, $x + 5$ এবং $x + 7$ এই চারটি রাশি উৎপাদক আকারে আছে তার মধ্যে দুটি করে রাশি নিয়ে গুণ করতে হবে। গুণফলগুলো এক একটি দ্বিমাত্রিক রাশি হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এই দ্বিমাত্রিক রাশি দুটির x বর্জিত পদ ছাড়া আর যা থাকে তা দুটি ক্ষেত্রেই সমান। কিন্তু সমস্যা হল কোন্ কোন্ রাশি দুটি গুণ করলে এই সর্ত পালিত হবে। সাধারণত সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ছোট রাশি দুটি গুণ করতে হয় এবং বাকি দুটি রাশি গুণ করতে হয়। এক্ষেত্রে $x + 7$ সবচেয়ে বড় এবং $x + 1$ সবচেয়ে ছোট রাশি। অতএব এই দুটি রাশির গুণ করতে হবে। আর বাকি $x + 3$ ও $x + 5$ কে পরস্পর গুণ করতে হবে। দেখ $(x + 7)(x + 1) = x^2 + x + 7x + 7 = x^2 + 8x + 7$ আবার $(x + 3)(x + 5) = x^2 + 5x + 3x + 15 = x^2 + 8x + 15$ দেখ এই দুটি রাশিতে x বর্জিত পদ 7 এবং 15 ছাড়া যা থাকে তা উভয়ক্ষেত্রেই $x^2 + 8x$. এবার $x^2 + 8x = a$ ধরলে রাশিটির আকার হবে $(a + 7)(a + 15) + 15$. এবারে রাশিটিকে সরল করলে একটি দ্বিমাত্রিক রাশির আকার ধারণ করবে। $(a + 7)(a + 15) + 15$

$= a^2 + 15a + 7a + 105 + 15$
$= a^2 + 22a + 120$

এবার আগের আগের মত সমাধান করতে হবে। শেষে আবার a-র মান বসাতে হবে, ফলে দুটি দ্বিমাত্রিক রাশির উৎপাদক আকারে পরিণত হবে। এগুলো যদি সম্ভব হয় তবে আবার উৎপাদকে পরিণত করতে হবে।

রাফ গণনা ঃ a^2-এর সহগ 1, x বর্জিত পদ 120. $1 \times 120 = 120$. আবার a-র সহগ 22.

এখন $120 = 12 \times 10$, $-12 \times (-10)$, 20×6, $-20 \times (-6)$ ইত্যাদি। এরমধ্যে $12 + 10 = 22$.

সমাধান ঃ

$$
\begin{aligned}
& (x+1)(x+3)(x+5)(x+7)+15 \\
&= (x-7)(x+1)(x+3)(x+5)+15 \\
&= (x^2+x+7x+7)(x^2+5x+3x+15)+15 \\
&= (x^2+8x+7)(x^2+8x+15)+15 \\
&= (a+7)(a+15)+15 \qquad [\ x^2+8x=a \text{ ধরে}\ ] \\
&= a^2+15a+7a+105+15 \\
&= a^2+22a+120 \\
&= a^2+12a+10a+120 \\
&= a(a+12)+10(a+12) \\
&= (a+12)(a+10) \\
&= (x^2+8x+12)(x^2+8x+10) \\
&= (x^2+6x+2x+12)(x^2+8x+10) \qquad \begin{bmatrix} 6\times 2=12 \\ 6+2=8 \end{bmatrix} \\
&= \{x(x+6)+2(x+6)\}(x^2+8x+10) \\
&= (x+6)(x+2)(x^2+8x+10)
\end{aligned}
$$

(8) $(x+1)(x+3)(x-4)(x-6)+24$

আলোচনা ঃ কোনটি সবচেয়ে বড় রাশি এবং কোনটি সবচেয়ে ছোট রাশি তা ঠিক করতে তোমরা অনেক সময় ভুল কর। অনেকে মনে কর $x-6$ সবচেয়ে বড় রাশি এবং $x+1$ সবচেয়ে ছোট রাশি। কিন্তু তা ঠিক নয়। x-এর সঙ্গে যত বেশি যোগ করা হবে তত রাশিটি বড় হবে এবং x থেকে যত বেশি বিয়োগ করা হবে তত রাশিটি ছোট হবে। অতএব $x+3$ সবচেয়ে বড় রাশি হবে এবং $x-6$ সবচেয়ে ছোট রাশি হবে। এ ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেলে 10 নম্বরের অঙ্কের মত সমাধান করতে হবে।

সমাধান ঃ

$$
\begin{aligned}
& (x+1)(x+3)(x-4)(x-6)+24 \\
&= (x+3)(x-6)(x+1)(x-4)+24 \\
&= (x^2-6x+3x-18)(x^2-4x+x-4)+24 \\
&= (x^2-3x-18)(x^2-3x-4)+24 \\
&= (a-18)(a-4)+24 \qquad [\ x^2-3x=a \text{ ধরে}\ ] \\
&= a^2-4a-18a+72+24 \\
&= a^2-22a+96 \\
&= a^2-16a-6a+96 \qquad \begin{bmatrix} 1\times 96=96 \\ 96=-16\times(-6) - 16-6=-22 \end{bmatrix} \\
&= a(a-16)-6(a-16) \\
&= (a-16)(a-6) \\
&= (x^2-3x-16)(x^2-3x-6)
\end{aligned}
$$

অনুশীলনের জন্য ঃ **উত্তর ঃ**

(1) $x(x+3)(x+6)(x+9)+56$ $(x+7)(x+2)(x^2+9x+4)$

(2) $(x+3)(x+4)(x+5)(x+6)-120$ ······ $(x+8)(x+1)(x^2+9x+30)$

(3) $(x-1)(x-2)(x+3)(x+4)+4$ ······ $(x^2+2x-7)(x^2+2x-4)$

জ্যামিতি

তোমাদের কিন্তু এর মধ্যে 1 থেকে 5 উপপাদ্য ভাল করে তৈরি করে নেওয়ার কথা। জানি তোমরা নিশ্চয় পড়া তৈরি করেছ। আজ আমরা ওই উপপাদ্যগুলো অবলম্বন করে কিছু অনুশীলন করব, অর্থাৎ আরও কিছু জ্যামিতিক তথ্য প্রমাণ করব। একেই বলে **rider** বা চলতি কথায় **extra** সমাধান করা। উপপাদ্য ত যা আলোচনা করেছি তার বাইরে কিছু নেই। কিন্তু অনুশীলনের শেষ নেই। কাজেই আমরা কিছু কিছু **extra** নিয়ে আলোচনা করব। তোমরা খেয়াল রেখ **extra** গুলো সমাধান করার সময় চিন্তা ভাবনার গতিপ্রকৃতিগুলো কি ধরনের। তাহলেই তোমরা নিজেরাও অনেক **extra** সমাধান করতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ প্রমাণ কর যে একটি সামান্তরিকের যে কোন দুটি বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখা অপর বাহু দুটির সমান্তরাল।

আলোচনার জন্য ঃ মনে আছে ত উপপাদ্য আলোচনার সময় আমরা প্রথমে সূত্রটিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে অর্থ করে ছবি এঁকে ছিলাম। তারপর জ্যামিতিক তথ্যগুলো প্রমাণ করেছি। Extra-তে প্রশ্নটিকে একটি সূত্র হিসাবে ধরে নেবে। তারপর উপপাদ্যের মত এগোও। এক্ষেত্রে আমরা পাচ্ছি

1. একটি সামান্তরিকের দুজোড়া বিপরীত বাহু আছে।

2. একজোড়া বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দু নিতে হবে।

3. সেই মধ্যবিন্দু দুটি একটি সরলরেখা দিয়ে যুক্ত করতে হবে।

4. ঐ সরলরেখাটি সামান্তরিকটির অপর একজোড়া যে বাহু আছে তার সমান্তরাল।

প্রশ্নটি (সূত্রটি) বারবার পড়ে তোমরা এভাবে ভেঙ্গে নিতে পার। তারপর ছবি আঁক। ঐ 4টি বিষয়ের মধ্যে প্রথম তিনটি থাকছে 'স্বীকারে' এবং চতুর্থটি প্রমাণ করতে হবে।

অঙ্কনের জন্য ঃ

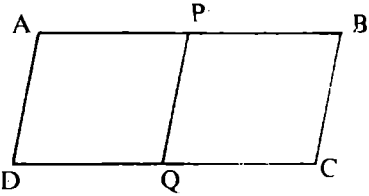

লেখার জন্য ঃ

স্বীকার ঃ ABCD সামান্তরিকের $\overline{AB}$ ও $\overline{DC}$ একজোড়া বিপরীত বাহু। $\overline{AB}$ ও $\overline{DC}$র মধ্যবিন্দু যথাক্রমে P এবং Q প্রমাণ করতে হবে যে $\overline{PQ}$ $\overline{AD}$ এবং $\overline{PQ}$ $\overline{BC}$

আলোচনার জন্য ঃ মূলতঃ স্বীকারে যা পাওয়া গেল তার থেকে প্রয়োজনীয় জ্যামিতিক তথ্যটি প্রমাণ করতে হবে। এখন দেখ স্বীকারে বলা আছে 1. ABCD একটি সামান্তরিক 2. $\overline{AB}$ ও $\overline{DC}$র মধ্যবিন্দু যথাক্রমে P ও Q অর্থাৎ $\overline{AP}=\frac{1}{2}\ \overline{AB}$ এবং $\overline{DQ}=\frac{1}{2}\ \overline{DC}$ 1. নম্বর থেকে আমর উপপাদ্যের তথ্যগুলো কাজে লাগাতে পারি। 2. নম্বর থেকে

একটি বিশেষ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া অষ্টম শ্রেণীতে যে সব স্বতঃসিদ্ধ এবং উপপাদ্য শিখেছ আর এ পর্যন্ত নবম শ্রেণীতে যেসব উপপাদ্য শিখেছ সেগুলো থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তার যে কোনটি কাজে লাগান যায়। এগুলোকে আমরা সাধারণ তথ্য হিসাবে ধরব।

$\overline{PQ}$ $\overline{AD}$ এবং $\overline{PQ}$ $\overline{BC}$ প্রমাণ করার জন্য কোন্ কোন্ সাধারণ তথ্যের প্রয়োজন একবার চিন্তা করে নাও। সেগুলো হল **1.** একান্তর কোণ বা অনুরূপ কোণগুলো সমান হবে **2.** ছেদকের এক-পাশের অন্তঃকোণের সমষ্টি 2 সমকোণ হবে। **3.** সামান্তরিকের যে কোন বিপরীত বাহু পরস্পর সমান্তরাল।

এবার 'স্বীকার' এবং ছবি আবার দেখে নাও। এগুলোর মধ্যে কোন্‌টি কাজে লাগান্ যেতে পারে চিন্তা কর। স্বীকারে কোণ সম্বন্ধে কিছুই বলা নেই। কাজেই **1.** ও **2.** নম্বর তথ্য কাজে লাগছে না। দেখত **3.** নম্বর তথ্যটি কাজে লাগে কি না? ছবি দেখে এবং স্বীকারের তথ্যগুলো দেখে তোমাদের নিশ্চয় মনে হবে তৃতীয় তথ্যটি কাজে লাগতেও পারে। আর কাজে ত লাগতেই হবে, কারণ আর কোন তথ্য ত আপাতত জানা নাই। অর্থাৎ ADQP ও PQCB সামান্তরিক হলেই $\overline{PQ} \parallel \overline{AD}$ এবং $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$ হবে। এখন এদুটিকে সামান্তরিক প্রমাণ করার জন্য স্বীকার প্রদত্ত তথ্য ছাড়া যে কোন সাধারণ তথ্যও কাজে লাগতে পারে।

তাহলে চিন্তাধারাকে এভাবে এগিয়ে নিয়ে যাও।

1. যা প্রমাণ করবে তা বারবার ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

2. স্বীকারে কি কি তথ্য দেওয়া আছে সেগুলো দেখে নাও।

3. এবার প্রয়োজনীয় তথ্যটি প্রমাণের জন্য এক, দুই, তিন···করে কতকগুলো সাধারণ তথ্য চিন্তা করে নাও।

4. এবারে 3. নম্বরে যে সব তথ্য-গুলো চিন্তা করলে সেগুলোর মধ্যে কোনটি স্বীকার থেকে পাওয়া যায় চিন্তা কর।

5. এবার এই তথ্যগুলি কাজে লাগিয়ে প্রমাণ করার দিকে এগোও।

যুক্তিবোধ থাকলে তুমি সফল হবেই। আর দেখ ত একটি **extra** আলোচনা করতে গিয়ে আমরা কেমন চিন্তা-ভাবনার একটা সাধারণ ফরমূলা তৈরি করে ফেললাম। যে কোন **extra** সমাধান করার সময় চিন্তা-ভাবনার এই পাঁচটি ধাপ সব সময় মনে রাখবে।

এবার আমরা মূল প্রশ্নটিতে আবার ফিরে যাই।

লেখার জন্য ঃ

প্রমাণ ঃ P, $\overline{AB}$-র মধ্যবিন্দু

$\overline{AP} = \frac{1}{2}\ \overline{AB}$

এবং Q, $\overline{DC}$-র মধ্যবিন্দু

$\overline{DQ} = \frac{1}{2}\ \overline{DC}$

এখন ABCD একটি সামান্তরিক

$\overline{AB} = \overline{DC}$

$\frac{1}{2}\ \overline{AB} = \frac{1}{2}\ \overline{DC}$

$\overline{AP} = \overline{DQ}$

আবার ABCD একটি সামান্তরিক

$\overline{AB}$ $\overline{DC}$

$\overline{AP}$ $\overline{DQ}$

তাহলে ADQP চতুর্ভুজের

$\overline{AP} = \overline{DQ}$ এবং $\overline{AP} \parallel \overline{DQ}$

ADQP একটি সামান্তরিক।

আলোচনার জন্য ঃ এখানে 4 উপপাদ্যের তথ্য কাজে লাগান হয়েছে।

লেখার জন্য $\overline{PQ} \parallel \overline{AD}$

অনুরূপে প্রমাণ করা যায় PQCB একটি সামান্তরিক

$\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$

অতএব প্রমাণিত হল $\overline{PQ} \parallel \overline{AD}$ এবং $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$

প্রশ্ন ঃ কোন চতুর্ভুজের কর্ণদ্বয় সমান হলে এবং পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করলে প্রমাণ কর যে সেটি একটি বর্গক্ষেত্র হবে।

আলোচনার জন্য ঃ আগের মত প্রশ্নটি (সূত্রটি) ভেঙ্গে অর্থ ঠিক করে নাও। ছবি আঁক। তারপর স্বীকার লেখ। দেখ প্রশ্নটি এভাবে ভাঙ্গা যায়—

1. একটি চতুর্ভুজের দুটি কর্ণ আছে। 2. কর্ণ দুটি সমান। 3. কর্ণ দুটি পরস্পরকে সমান দুভাগে ভাগ করছে। 4. কর্ণ দুটি পরস্পরকে সমকোণে ছেদ করছে। 5. প্রমাণ করতে হবে যে চতুর্ভুজটি একটি বর্গক্ষেত্র। প্রথম চারটি বিষয় স্বীকারে থাকবে এবং শেষোক্তটি প্রমাণ করতে হবে।

অঙ্কনের জন্য ঃ

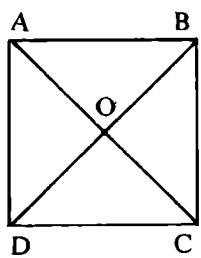

লেখার জন্য ঃ

স্বীকার ঃ ABCD চতুর্ভুজের $\overline{AC}$ $\overline{BD}$ কর্ণ দুটি পরস্পর O বিন্দুতে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত হয় এবং $\overline{AC} = \overline{BD}$ প্রমাণ করতে হবে যে ABCD একটি বর্গক্ষেত্র।

আলোচনার জন্য ঃ প্রথম extraটি সমাধানের সময় আমাদের চিন্তাধারাকে যেভাবে পাঁচটি ধাপে এগিয়ে নিয়েছিলাম এখানেও সেই পাঁচ ধাপে এগিয়ে যাও।

এখানে 'ABCD একটি বর্গক্ষেত্র' প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য হল ABCD চতুর্ভুজের চারটি বাহু সমান এবং যে কোন একটি কোণ সমকোণ। এবার স্বীকারের তথ্য এবং উপযুক্ত সাধারণ তথ্য কাজে লাগাতে হবে। প্রথমে আমরা চারটি বাহু সমান প্রমাণ করার জন্য চিন্তা করি। তারপর যে কোন একটি কোণ সমকোণ প্রমাণ করার জন্য চিন্তা করব।

স্বীকারের একটি তথ্য হল—'কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।' এর সঙ্গে 5 উপপাদ্যের তথ্য মিলিয়ে দেখ। কি, মিল আছে ত? তাহলে স্বীকারের এই তথ্যটি কাজে লাগিয়ে 5 উপপাদ্য থেকে পাওয়া যাচ্ছে ABCD একটি সামান্তরিক। আর তার থেকেই আমরা 1 উপপাদ্য অনুসারে পাচ্ছি দু জোড়া বিপরীত বাহু পরস্পর সমান। অর্থাৎ $\overline{AB} = \overline{DC}$ এবং $\overline{AD} = \overline{BC}$। কিন্তু প্রয়োজন চারটি বাহুই সমান হওয়ার। এখন যদি যে কোন একজোড়া সন্নিহিত বাহু সমান হয় তাহলেই চারটি বাহু সমান হবে। তাহলেই আমাদের কাজ হল $\overline{AD} = \overline{DC}$ (এক জোড়া সন্নিহিত বাহু) প্রমাণ করা। $\overline{AD} = \overline{DC}$ শুধু স্বীকারের তথ্য দিয়ে প্রমাণ করা যায় কিনা দেখ। যাচ্ছে না। সাধারণ তথ্যের চিন্তা কর যার সাহায্যে এটি প্রমাণ করা যায়। দুটি ত্রিভুজ সর্বসম হলে অনুরূপ বাহু এবং কোণগুলো সমান হয়। কাজেই এ তথ্যকে কাজে লাগিয়ে $\overline{AD} = \overline{DC}$ প্রমাণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ $\triangle AOD$ ও $\triangle COD$ সর্বসম হওয়া প্রয়োজন। তাহলে আমরা চেষ্টা করব $\triangle AOD \cong \triangle COD$ প্রমাণ করার।

এবার প্রয়োজন চতুর্ভুজের যে কোন একটি কোণ সমকোণ প্রমাণ করা। স্বীকারের তথ্য থেকে সোজাসুজি এটা প্রমাণ করা যাচ্ছে না। কিন্তু সমকোণ কথাটি কাজে লাগে এমন কোন সাধারণ

তথ্য আছে কিনা দেখ। আছে এবং তা হল—'দুটি সমান্তরাল সরলরেখার ছেদকের একপাশের অন্তঃকোণের সমষ্টি দুই সমকোণ। তাহলে $\angle ADC + \angle BCD$ = দুই সমকোণ।

এখন $\angle ADC = \angle BCD$ হলেই প্রত্যেকে 1 সমকোণ হবে। তাহলে এবার দেখতে হবে স্বীকারের তথ্য থেকে সোজাসুজি তা পাওয়া যাচ্ছে কি না। যাচ্ছে না। আগের মত দুটি ত্রিভুজ সর্বসম হলে তার থেকে দুটি কোণ সমান পাওয়া যায়। এই তথ্য কাজে লাগাও। অর্থাৎ $\triangle ADC \cong \triangle BCD$ প্রমাণ করলেই $\angle ADC = \angle BCD$ হবে।

লেখার জন্য :

প্রমাণ : ABCD চতুর্ভুজের দুটি কর্ণ $\overline{AC}$ ও $\overline{BD}$ পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করছে। ABCD একটি সামান্তরিক।

$\overline{AB} = \overline{DC}$ এবং $\overline{AD} = \overline{BC}$

এখন $\triangle AOD$ ও $\triangle COD$র মধ্যে

$\because$ $\overline{AO} = \overline{CO}$ (স্বীকার)
$\overline{OD}$ সাধারণ বাহু
অন্তঃ $\angle AOD$ = অন্তঃ $\angle COD$ (প্রত্যেকে সমকোণ)

ত্রিভুজ দুটি সর্বসম।

$\overline{AD} = \overline{DC}$

কিন্তু ABCD সামন্তরিকের $\overline{AD} = \overline{BC}$ এবং $\overline{DC} = \overline{AB}$

$\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{DC} = \overline{AD}$

অর্থাৎ ABCD সামন্তরিকের বাহুগুলো সমান···(1)

পুনঃ $\triangle ADC$ ও $\triangle BCD$র মধ্যে

$\because$ $\overline{AD} = \overline{BC}$ ·····(প্রমাণিত)
$\overline{AC} = \overline{BD}$ ·····(স্বীকার)
DC সাধারণ বাহু

ত্রিভুজ দুটি সর্বসম।

$\angle ADC = \angle BCD$

আবার $AD \parallel BC$ $\angle ADC + \angle BCD$ = দুই সমকোণ।

$\angle ADC = \angle BCD$ = 1 সমকোণ।

অনুরূপে প্রমাণ করা যায় $\angle DAB = \angle ABC$ = 1 সমকোণ

ABCD সামন্তরিকের চারটি বাহু সমান এবং একটি কোণ সমকোণ।

ABCD একটি বর্গক্ষেত্র।

অনুশীলনের জন্য :

1. ABCD সামান্তরিকের $\angle A$ ও $\angle C$-এর সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় যথাক্রমে $\overline{DC}$ বাহুর $\overline{P}$ বিন্দুতে ও $\overline{AB}$ বাহুর $\overline{Q}$ বিন্দুতে মিলিত হলে প্রমাণ কর যে, $\overline{AP}$ ও $\overline{CQ}$ সমান ও সমান্তরাল।

2. ABCD ট্র্যাপিজিয়মের $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$. $\angle D$-এর সমদ্বিখণ্ডক $\overline{AB}$ বাহুর E বিন্দুতে এবং $\angle A$-এর সমদ্বিখণ্ডক $\overline{DC}$ বাহুর F বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। প্রমাণ কর যে AEFD একটি রম্বস।

পরিমিতি

পরিমিতি সম্বন্ধে আজ আমরা প্রথম আলোচনা করব। জ্যামিতিরই অন্য এক রূপ পরিমিতি। এখানে জ্যামিতির বিভিন্ন আকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। কোথাও পরিসীমা, ক্ষেত্রফল ইত্যাদির পরিমাপ করা হয়, কোথাওবা ঘনফলের পরিমাপ করা হয়। নবম শ্রেণীতে পরিসীমা ও ক্ষেত্রফল নিয়েই আলোচনা হবে। এখন আমরা আয়তক্ষেত্র এবং বর্গক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করব।

আয়তক্ষেত্র ঃ যে সামান্তরিকের প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ এবং সন্নিহিত বাহুগুলি সমান নয় তাকে আয়তক্ষেত্র বলে।

আর একভাবে বলা যেতে পারে। যে চতুর্ভুজের 1. প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ 2. বিপরীত বাহুগুলি সমান কিন্তু 3. সন্নিহিত বাহুগুলি সমান নয় তাকে আয়তক্ষেত্র বলে।

চিত্র দেখ

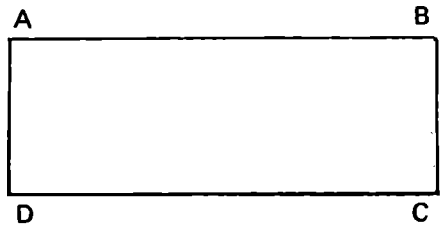

ABCD আয়তক্ষেত্রের

1. $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 1$ সমকোণ
2. $\overline{AB} = \overline{DC}$ এবং $\overline{AD} = \overline{BC}$
3. $\overline{AB}$ বা $\overline{DC}$ কোনটিই $\overline{AD}$ বা $\overline{BC}$-র সমান নয়। দুটি সন্নিহিত বাহুর মধ্যে যেটি বড় সেটিকে দৈর্ঘ্য বলা হয় এবং যেটি ছোট সেটিকে প্রস্থ বলা হয়। এক্ষেত্রে $\overline{AB}$ বা $\overline{DC}$ দৈর্ঘ্য এবং $\overline{AD}$ বা $\overline{BC}$ প্রস্থ।

পরিসীমা ঃ পরিসীমা বলতে একটি ক্ষেত্র যে রেখা দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আছে তাই বোঝায়। ABCD আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা $\overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD} + \overline{DA}$। ধর দৈর্ঘ্য $= a$ একক এবং প্রস্থ $= b$ একং। তাহলে পরিসীমা $= a + b + a + b = 2a + 2b = 2(a + b)$. তাহলে একটি সূত্র তৈরী হল।

1 নম্বর সূত্র ঃ আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা $= 2(a + b)$ যেখানে a এবং b যথাক্রমে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ।

ক্ষেত্রফল ঃ ক্ষেত্রফল বলতে কোন ক্ষেত্রের তলের পরিমাপ বোঝায়। আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল, দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের গুণফলের সমান।

2 নম্বর সূত্র ঃ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $=$ দৈর্ঘ্য $\times$ প্রস্থ $= ab$.

এই সূত্র থেকে আরও দুটি সূত্র পাওয়া যায়।

3 নম্বর সূত্র ঃ আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য $= \frac{\text{ক্ষেত্রফল}}{\text{প্রস্থ}}$

4 নম্বর সূত্র ঃ আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ $= \frac{\text{ক্ষেত্রফল}}{\text{দৈর্ঘ্য}}$

বর্গক্ষেত্র ঃ আয়তক্ষেত্রের বাহুগুলি সমান হলেই তাকে বর্গক্ষেত্র বলে। অর্থাৎ যে চতুর্ভুজের প্রতিটি কোণ সমকোণ এবং চারটি বাহুই সমান তাকে বর্গক্ষেত্র বলে। চিত্র দেখ,

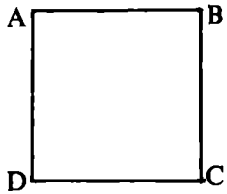

ABCD একটি বর্গক্ষেত্র। এর 1. $\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 1$ সমকোণ এবং $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD} = \overline{DA}$. ধর বর্গক্ষেত্রটির প্রতিটি বাহু a একক।

$$\text{পরিসীমা} = \overline{AB} + \overline{BC} + \overline{CD} + \overline{DA} = a + a + a + a$$
$$= 4a$$
$$= 4 \times \text{বাহু}$$

5 নম্বর সূত্র ঃ বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা $= 4 \times$ বাহু
$= 4a.$

6 নম্বর সূত্র ঃ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= (\text{বাহু})^2 = a^2$ এর থেকে পাওয়া যায়।

7 নম্বর সূত্র ঃ বর্গক্ষেত্রের বাহু $= \sqrt{\text{ক্ষেত্রফল}}$ সূত্রগুলি খাতায় লিখে মুখস্থ করবে।

একক ঃ

পরিসীমা ঃ যেহেতু পরিমাপ, কোন ক্ষেত্র যে রেখা দ্বারা বেষ্টিত তার পরিমাপ এবং রেখার পরিমাপ দৈর্ঘ্য দিয়ে হয় অতএব পরিসীমা এবং দৈর্ঘ্যের একক একই হবে। অর্থাৎ পরিসীমার একক সেণ্টিমিটার, ফুট ইত্যাদি।

ক্ষেত্রফল ঃ x-এর বর্গ বলতে বুঝি $x.x$ অর্থাৎ একটি সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফল সংখ্যাটির বর্গ হবে। সেই রকম একই এককে সেই একক দিয়ে গুণ করলে সেটি তার বর্গ একক হবে।

যেমন একটি আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 9 মিটার এবং প্রস্থ 5 মিটার। তাহলে ক্ষেত্রফল
$= 9 \text{ মিটার} \times 5 \text{ মিটার}$
$= 9 \times 5 \text{ (মিটার} \times \text{মিটার)}$
$= 45$ বর্গমিটার।

এক্ষেত্রে 2 বার মিটার গুণ হল বলে ক্ষেত্রফলের একক বর্গমিটার হল। এইভাবে ক্ষেত্রফলের একক বর্গ সেণ্টিমিটার, বর্গফুট ইত্যাদি হবে।

ক্ষেত্রফলের এককের রূপান্তর ঃ

সেণ্টিমিটারকে মিলিমিটারে পরিণত করতে হলে 10 দিয়ে গুণ করতে হয়, কারণ 1 সে.মি. $=$ 10 মি.মি. কিন্তু বর্গ সেণ্টিমিটারকে বর্গ মিলিমিটারে পরিণত করতে হলে $10 \times 10 = 100$ দিয়ে গুণ করতে হয়।

কারণ ঃ বর্গ সেণ্টিমিটার
$=$ সেণ্টিমিটার $\times$ সেণ্টিমিটার
$=$ 10 মি. মি. $\times$ 10 মি. মি.
$=$ 100 মি. মি. $\times$ মি. মি.
$=$ 100 বর্গ মি. মি

এইভাবে

100 বর্গ মি. মি = 1 বর্গ সে.মি.
100 বর্গ সে.মি. = 1 বর্গ ডেসি.মি.
100 বর্গ ডেসি মি. = 1 বর্গ মিটার
100 বর্গ মি. = 1 বর্গ ডেকা.মি.
10000 বর্গ ডেকামি. = 1 বর্গ কি.মি.

মেট্রিক পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফল মাপার আর একটি এককের নাম এয়র। 1 এয়র = 100 বর্গমিটার বা 1 বর্গ ডেকা. মিটার।

এইভাবে

1 ফুট = 12 ইঞ্চি

কিন্তু 1 বর্গফুট = 1 ফুট × 1 ফুট = 12 ইঞ্চি × 12 ইঞ্চি = 144 বর্গইঞ্চি।

1 গজ = 3 ফুট

1 বর্গগজ = 1 গজ × 1 গজ = 3 ফুট × 3 ফুট = 9 বর্গফুট।

অনেক সময় তোমাদের অঙ্কে, ধর, 5 মিটার বর্গ দেওয়া হল। এটা কিন্তু ক্ষেত্রফলের পরিমাপ হল না। যদি বলা হত 5 বর্গমিটার তাহলে ক্ষেত্রফলের পরিমাপই বোঝায়। 5 মিটার বর্গ-এর অর্থ হল এমন একটি বর্গক্ষেত্র যার প্রতিটি বাহু 5 মিটার। তাহলে তার ক্ষেত্রফল হবে $(\text{বাহু})^2 = 5^2$ বর্গমিটার = 25 বর্গমিটার।

তাহলে বুঝতেই পারছ কোথায় 5 বর্গমি. আর কোথায় 5 মি. বর্গ।

আজ কোন সমস্যার মধ্যে যাব না। তোমরা সূত্রগুলো আর এককের রূপান্তরগুলো ভাল করে মুখস্থ করবে। আগামী সংখ্যায় আমরা পরিমিতির অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব।

দীপক সেনশর্মা

বিজ্ঞান যেখানে নিশ্চুপ!

পারস্য সম্রাট জারেকসেস্ গ্রীস জয় করতে গিয়ে প্লেটিয়ার যুদ্ধে নিদারুণভাবে পরাজিত হন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাবার সময় বহু বাক্স ভরতি সোনা-রূপা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী ফেলে যেতে হয়। যুদ্ধের পর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা অনেকে এইসব সম্পদ সংগ্রহ করেছিল; এমন কি সম্ভ্রান্ত পারসিক সৈনিকদের কংকাল থেকেও নানা অলংকার খুলে নিয়েছিল। এই রকম কংকাল থেকে ছিনতাই করার সময় পাওয়া যায় একটি মাথার খুলি যাতে কোন জোড় ছিল না, বেলের মত একটি হাড়ের বাটি যেন; একটি কংকালে ছিল একটানা জোড়ালাগান দাঁতের পাটি, দাঁতগুলি পৃথক পৃথক নয়; একটি কংকাল ছিল সাড়ে সাত ফুট লম্বা।

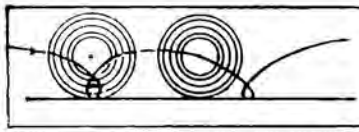

ভৌতবিজ্ঞান

এবার থেকে আমাদের প্রতি পাঠে দুটি করে অংশ থাকবে। প্রথম অংশে থাকবে পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচনা, দ্বিতীয় অংশে রসায়নের। আমাদের এবারকার পাঠে থাকছে ঃ

পদার্থ বিজ্ঞান ঃ 1. স্থিতি ও গতি 2. সরণ 3. দ্রুতি ও বেগ, 4. ত্বরণ ও মন্দন

রসায়ন বিজ্ঞান ঃ 1 পদার্থের ধর্ম, 2 ধর্মের সাহায্যে পদার্থের সনাক্তকরণ।

পদার্থ বিজ্ঞান

তোমরা আগেই জেনেছ যে আমাদের আজকের পদার্থ বিস্তার পাঠ শুরু হবে স্থিতি ও গতির আলোচনা দিয়ে।

পদার্থ বিজ্ঞানের যে শাখায় বস্তুর স্থিতি ও গতি নিয়ে আলোচনা করা হয় তার নাম গতিবিদ্যা (Kinematics)।

গতিবিদ্যার আলোচনায় সাধারণত বস্তুর আয়তনকে (অর্থাৎ বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধকে) হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। **বস্তুকে একটি বস্তুকণা বলে মনে করে নেওয়া হয়।** জ্যামিতির বিন্দুর মতই ধরে নেওয়া হয় যে এই বস্তুকণারও দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ কিছুই নেই আছে শুধু অবস্থান। মনে রেখ, গতিবিদ্যার এই বস্তুকণার সঙ্গে কিন্তু পদার্থের অণু বা পরমাণুর কোনও সম্পর্ক নেই।

কিন্তু কেন এই কল্পনা? বস্তুকণার এই কল্পনা গতিবিদ্যার আলোচনা ও গণনার কাজ অনেক সহজ করে। যেমন দেখ, বস্তুকণার অবস্থান একটি বিন্দু দিয়ে নির্দেশ করা যায়। কিন্তু আয়তন-যুক্ত বস্তুর অবস্থান নির্দেশ করা অত সহজ নয়।

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ সম্পূর্ণ কাল্পনিক এই বস্তুকণাকে ভিত্তি করে যে আলোচনা ও গণনা, তা বাস্তব জগতে আমাদের কোন কাজে লাগবে!

১. গতিপথের তুলনায় বস্তুটি যদি নেহাতই ছোট হয় তা হলে আমরা বস্তুটিকে একটি কণা বলে ধরে নিতে পারি।

২. দূর আকাশে ঐ যে চিলটা বিরাট এক বৃত্তাকার পথে চক্কর কেটে চলেছে, গতিপথের তুলনায় সে ত একটি কণামাত্র।

৩. আবার সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রায় ষাট কোটি মাইল দীর্ঘ প্রদক্ষিণ পথে আমাদের এই পৃথিবী, যার ব্যাসার্ধ মাত্র আট হাজার মাইল, সে একটি বস্তুকণামাত্র বৈ ত নয়।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। গতিবিদ্যায় বস্তুকণাকে, বস্তুকণা না বলে শুধু বস্তু বলেই উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন

১. গতিবিদ্যা বিজ্ঞানের কোন বিভাগের অন্তর্গত ? গতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় কি ?

২. গতিবিদ্যায় বস্তুকে কেন বস্তুকণারূপে কল্পনা করা হয় ? এমন কাল্পনিক আলোচনা কি বিজ্ঞান-সম্মত ?

৩. গতিবিদ্যায় কাল্পনিক বস্তু-কণার সঙ্গে পদার্থের অনুপরমাণুর সম্পর্ক কি ? এই বস্তুকণাকে উল্লেখ কালে কি বলা হয় ?

অবস্থান, গতি ও স্থিতি

উপরের শব্দ তিনটি তোমাদের সকলেরই পরিচিত। কিন্তু বিজ্ঞানে কোনও কিছুর শুধু পরিচয় জানা থাকলেই চলে না, সব কিছুরই সুস্পষ্ট তাৎপর্য জেনে নিতে হয়। তাই এস, বিশ্লেষণ করে দেখে নিই বস্তুর অবস্থান, স্থিতি ও গতি বলতে ঠিক কি বোঝায়।

বস্তু (অর্থাৎ বস্তুকণা) যখন যে স্থানে (অর্থাৎ বিন্দুতে) থাকে সেই স্থানটিই হল ঐ বস্তুটির তখনকার অবস্থান।

উদাহরণ ও ব্যাখ্যা ঃ মনে কর—তুমি পায়ে হেঁটে স্কুলে চলেছ। তুমি বাড়ি

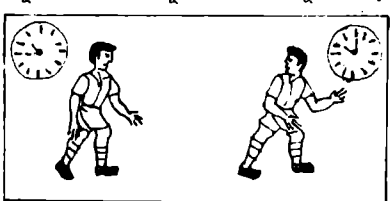

থেকে রওনা হয়েছিলে পৌনে দশটায়। তুমি যখন শ্যামলদের বাড়ির ঠিক দোর-গোড়ায় তখন ওদের দেওয়াল ঘড়িতে দশটা বাজল। এক্ষেত্রে পৌনে দশটার সময়ে তোমার অবস্থান ছিল তোমাদের বাড়ির দরজায় (A)। দশটার সময়ে অবস্থান ছিল শ্যামলদের বাড়ির দোরগোড়ায় (B)।

এবার মনে কর—শ্যামলের জন্যে তোমাকে দশটা থেকে দশটা বেজে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল।

পৌনে দশটা থেকে দশটা পর্যন্ত, পনের মিনিট ধরে, প্রতিক্ষণেই তোমার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেছিল—তুমি চলমান বা গতিশীল ছিলে। কিন্তু দশটা থেকে দশটা পাঁচ পর্যন্ত এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোমার অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয়নি—তুমি ছিলে স্থির বা স্থিতিশীল। অতএব !

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনকে বলা হয় বস্তুর গতি (motion)। **যে বস্তুর গতি আছে তাকে বলা হয় চলমান বা গতিশীল বস্তু** (moving body)।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি কোনও বস্তুর অবস্থানের কোনও পরিবর্তন না হয় তবে ঐ বস্তুকে বলা হয় স্থির বস্তু বা স্থিতিশীল বস্তু (body of rest)। **বস্তুর স্থির অবস্থাকে বলা হয় স্থিতি** (state of rest)।

প্রশ্ন

১. কোন বস্তুর অবস্থান কাকে বলে ? অবস্থান সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে গেলে 'সময়' সম্পর্কে জানা দরকার কেন ? একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝাও।

২. বস্তুর গতি কাকে বলে ? গতিশীল বস্তুই বা কাকে বলে ?

৩. বস্তুর স্থিতি বলতে কি বোঝ ? স্থিতিশীল বস্তুই বা কি ?

৪. বস্তুর স্থিতি ও গতির মধ্যে পার্থক্য একটা উদাহরণ দ্বারা বোঝাও।

এবার আমাদের জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, কোন বস্তুর অবস্থান আমরা কিভাবে বের করতে পারি? তোমাদের বাড়ির

অদূরে যে শিবমন্দিরের পাশের অশ্বত্থ গাছটি—তার অবস্থান জানতে চাইলে তুমি বলবে যে তোমাদের বাড়ি থেকে গাছটা একশ মিটার উত্তরে। বা, ঐ যে লোকটি চলেছে, তারই বা অবস্থান কোথায়? তুমি বলবে, তোমাদের বাড়ি থেকে পঁচিশ মিটার পূর্বে।

তা হলে, **কোন বস্তুর অবস্থান বোঝাতে আমরা কি করি?**

কোন একটা স্থির বস্তুকে মূল ধরে তার সাপেক্ষে নির্ণেয় বস্তুর অবস্থান বোঝাই। গাছ বা মানুষটির অবস্থান বোঝাতে আমরা বাড়িটিকে স্থির বিন্দু ধরেছি।

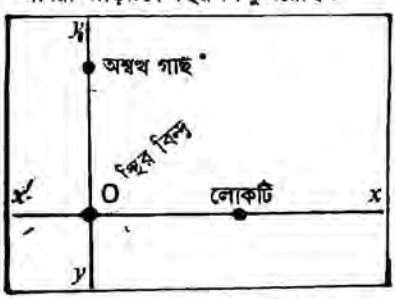

ছক কাগজে (Graph-paper) কোন বিন্দুর অবস্থান কিভাবে বোঝান হয় মনে আছে ত? সেখানেও অক্ষরেখা দুটির ছেদ বিন্দুকে মূল বিন্দু হিসাবে ধরে তারই সাপেক্ষে অন্য বস্তুর অবস্থান বোঝান হয়।

এবার আমরা বিষয়টির আরও গভীরে প্রবেশ করছি। এজন্য আর একটি বিশেষ উদাহরণ নেওয়া যাক।

মনে করা যাক বৃদ্ধ দাদু তাঁর আদরের নাতিটিকে নিয়ে ট্রেনে করে চলেছেন। দাদু শাল মুড়ি দিয়ে চুপ করে বসে আছেন। কিন্তু ছটফটে নাতিটি কেবলই এ-জানলা ও-জানলা করে বেড়াচ্ছে। সহযাত্রীরা কী দেখছে? তারা দেখছে রেল কামরার তুলনায় দাদুর অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না অর্থাৎ দাদু স্থিতিশীল। কিন্তু রেল কামরাটির সাপেক্ষে নাতিটির অবস্থানের কেবলই পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ নাতিটি গতিশীল।

কিন্তু মনে কর, রেল লাইনের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে একটি লোক গাড়ির ভেতরের যাত্রীদের দেখছে। কী দেখবে লোকটি? সে দেখবে ট্রেনটির সঙ্গে সঙ্গে দাদু ও নাতি বিপুল বেগে মাঠ পার হয়ে গেলেন। অর্থাৎ এই লোকটির কাছে দাদু-নাতি-ট্রেন—সবই গতিশীল।

তাহলে, আমরা যখন বলছি এবস্তুটা স্থির কিংবা ও-বস্তুটা গতিশীল আমরা কি তাহলে তখন ভুল বলছি?

না, ভুল আমরা ঠিক বলছি না। **আমরা একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর (frame) সাপেক্ষে বস্তুর স্থিতিশীলতা ও গতিশীলতার বিচার করছি। এরূপ স্থিতি ও গতিকে বলা হয় আপেক্ষিক স্থিতি ও আপেক্ষিক গতি।**

রেল কামরাটির কাঠামো সাপেক্ষে দাদু স্থিতিশীল কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠের কাঠামো সাপেক্ষে দাদু গতিশীল।

পাহাড়ের আর একনাম অচল, কারণ সে চলতে পারে না। পৃথিবীর

কাঠামোতে হিমালয় অচলই বটে। কিন্তু সৌরজগতের কাঠামোতে হিমালয় বেশ সচল। তোমার সাইকেলের স্পোকে একটা লালসুতো বেঁধে সাইকেল চালাও। স্পোকে বসে থাকা একটি কাল্পনিক মাছির চোখে সুতোটা স্থির বলেই মনে হবে। কিন্তু পাশে দাঁড়ান দর্শকের চোখে সুতোর গতিটা কেমন মনে হবে তা নিচের চিত্রে দেখ।

এই বিশ্বে কোনও কিছুই স্থির হয়ে নেই। সূর্য গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকা সব

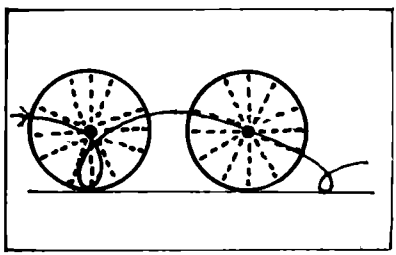

কিছুই নিরন্তর গতিতে মহাশূন্যে ছুটে চলেছে। ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনও কাঠামোই নেই যা প্রকৃত অর্থে স্থির। সুতরাং, **এই বিশ্বে পরম স্থিতি বা পরম গতি বলতে কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই—সমস্ত স্থিতি ও সমস্ত গতিই আপেক্ষিক।**

আমরা যখন স্থিতি ও গতির কথা বলি তখন পৃথিবীর কাঠামো সাপেক্ষে স্থিতি ও গতির কথাই বলে থাকি সাধারণত।

প্রশ্ন

১. কোন বস্তুর অবস্থান বোঝাবার উপায় কি? ছক-কাগজে কিভাবে বস্তুর অবস্থান বোঝান হয়?

২. আপেক্ষিক গতি বা আপেক্ষিক স্থিতি বলতে কি বোঝ? দুটি উদাহরণযোগে বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

৩. পরম-গতি বা পরম-স্থিতির অস্তিত্ব নেই কেন?

৪. বস্তুর স্থিতি ও গতির সংজ্ঞা দাও। স্থিতি ও গতির সামনে আপেক্ষিক শব্দটি কেন ব্যবহার করা হয়?

৫ সাইকেলের স্পোকে একটি সুতো বেঁধে ঘোরালে তাকে কে স্থিতিশীল ও কে গতিশীল দেখবে?

৬. তুমি প্লেনে চেপে চলেছ। তোমাকে স্থিতিশীলও বলা যায়, গতিশীলও বলা যায়। কিভাবে তা ব্যাখ্যা কর।

এবারে আমাদের আলোচ্য বিষয় **সরণ।**

সরণ

সরণ মানে সরা। কোনও বস্তুর সরণের পরিমাপ মানে বস্তুটি কতখানি সরল তার পরিমাপ। মনে কর তোমার ঠাকুরমা রিক্সায় চড়ে সদর রাস্তা ধরে ঠাকুর বাড়ি গেলেন। তুমি গলিঘুঁজি পথে shortcut করে সেখানে গিয়ে পৌঁছলে। ঠাকুরমাকে যতটা পথ অতিক্রম (অবশ্য রিক্সা চড়ে) করতে হল তোমাকে করতে হল তার থেকে অনেক কম। কিন্তু সরণ তোমাদের দুজনের বেলাতেই সমান হয়েছে। তোমাদের বাড়ি থেকে ঠাকুর বাড়ির সোজা দূরত্ব যতখানি—ইংরাজিতে যাকে বলা হয় as the crow flies—তোমাদের দুজনের ক্ষেত্রেই সরণ হয়েছে ততখানিই।

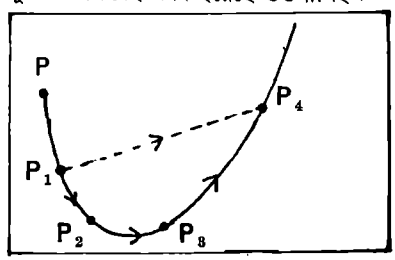

ধরা যাক P একটি গতিশীল বস্তুকণা। T_1 সময়ে তার অবস্থান ছিল P_1 বিন্দুতে। T_2 সময়ে P_2 বিন্দুতে। T_3 সময়ে P_3 বিন্দুতে এবং T_4 সময়ে P_4 বিন্দুতে। T_1 থেকে T_4 সময়ের মধ্যে বস্তুটি কতটা পথ অতিক্রম করেছে? P_1 P_2 P_3 P_4 বক্ররেখাটির দৈর্ঘ্য যতটা, ততটা পথ। কিন্তু বস্তুটির সরণ হয়েছে কতটা? P_1 ও P_4 বিন্দু দুটির সংযোজক সরল রেখাটির দৈর্ঘ্য যতটা বস্তুটির সরণ হয়েছে ততটাই। সরণ হয়েছে কোন দিকে? $\overrightarrow{P_1P_4}$ রশ্মিটি (রেখাটি) যে দিক নির্দেশ করছে বস্তুটির সরণ হয়েছে সেই দিকে।

সুতরাং সরণের সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলতে পারি—

> কোনও গতিশীল বস্তু কোনও নির্দিষ্ট সময়ের শুরুতে ও শেষে যে দুটি অবস্থানে থাকে সেই অবস্থান দুটির সংযোজক সরল রেখাই হল ঐ সময়ের মধ্যে বস্তুটির সরণ। রেখাংশটির দৈর্ঘ্য নির্দেশ করবে সরণের মাপ এবং রেখাংশটির দিক নির্দেশ করবে সরণের দিক।

মনে রাখঃ ১. সরণের মান এবং দিক দুই-ই আছে। অতএব সরণ একটি ভেক্টর রাশি। ২. স্পষ্টতঃই সেণ্টিমিটার, মিটার, ইঞ্চি, ফুট প্রভৃতি দৈর্ঘ্যের এককই হবে সরণের একক।

সরণ সম্পর্কে ধারণাকে স্পষ্টতর করতে আরও একটা উদাহরণ নেওয়া যাক—

দুর্গাপূজাতে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে তোমরা কজন বন্ধু A প্যাণ্ডেল থেকে সোজা দক্ষিণে হাঁটা শুরু করে 3 কি. মি. দূরে B প্যাণ্ডেলে পৌঁছলে। সেখান থেকে সোজা পুবমুখো হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে 4 কি.মি. দূরে C প্যাণ্ডেলে পৌঁছলে। তোমরা

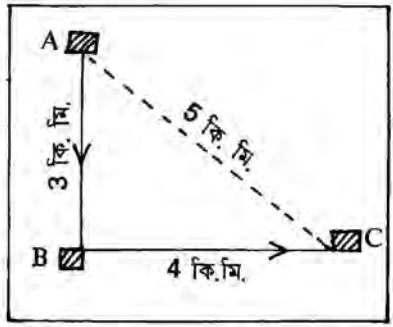

কতটা পথ হাঁটলে? (3 + 4) কি. মি. বা 7 কি. মি. পথ। কিন্তু তোমাদের সরণ ঘটল কতখানি? $\overline{AC}$ রেখাংশটির দৈর্ঘ্য যতখানি, ততখানি। তোমরা জান, (যদি ইতঃমধ্যে না শিখে থাক, তবে পরে জানবে):

$$AC = \sqrt{(AB)^2 + (BC)^2}$$

সুতরাং এক্ষেত্রে সরণ

$$\overline{AC} = \sqrt{3^2 + 4^2} \text{ কি. মি.}$$
$$= \sqrt{25} \text{ কি. মি.}$$
$$= 5 \text{ কি. মি.}$$

$\overrightarrow{AC}$ রশ্মিটির দিকই হল তোমাদের সরণের দিক।

প্রশ্ন

1. সরণের সংজ্ঞা দাও। সরণ কী রকম রাশি—স্কেলার না ভেক্টর?
2. সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় 9·5 কোটি মাইল। সূর্যকে বেষ্টন করে পৃথিবীর পরিক্রমা পথের দৈর্ঘ্য মোটামুটি 60 কোটি মাইল। 6 মাসে পৃথিবী কতখানি পথ অতিক্রম করে? ঐ সময়ে তার সরণ হয় কতটা?
3. তোমাদের বাড়ি থেকে পোস্ট অফিস 2·5 কি.মি.। তুমি পোস্ট অফিসে গিয়ে মণি-অর্ডার করে এলে। তুমি কতটা পথ হাঁটলে?

দ্রুতি (Speed) ও বেগ (Velocity)

সাধারণ কথাবার্তায় দ্রুতি ও বেগ সমার্থক। বিজ্ঞানে কিন্তু শব্দ দুটি কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যে ব্যবহার করা হয়।

কোনও চলমান বস্তু একক সময়ে যতখানি দূরত্ব অতিক্রম করে তাই হল বস্তুটির দ্রুতি।

কোনও চলমান বস্তু একক সময়ে একটি নির্দিষ্ট দিকে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাই হল বস্তুটির বেগ।

অন্য ভাবে বলা যায়, **সময় সাপেক্ষে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে বস্তুর দ্রুতি বলে।**

সময় সাপেক্ষে একটি নির্দিষ্ট দিকে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের হারকে বলে বস্তুর বেগ।

লক্ষ্য কর, দ্রুতির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দূরত্বের কথাই বলা হচ্ছে। কিন্তু বেগের ক্ষেত্রে শুধু দূরত্বই নয়, দূরত্বের দিকের কথাও বলা হচ্ছে। অর্থাৎ দ্রুতি একটি স্কেলার রাশি কিন্তু বেগ ভেক্টর রাশি।

C. G. S. পদ্ধতিতে দ্রুতি ও বেগ উভয়ের ক্ষেত্রেই পরিমাপের একক হবে সে. মি. প্রতি সেকেণ্ড বা সে. মি./সেকেণ্ড, মিটার প্রতি সেকেণ্ড বা মিটার/সেকেণ্ড, কি. মি. প্রতি ঘণ্টা বা কি. মি./ঘণ্টা ইত্যাদি। F. P. S. পদ্ধতিতে হবে ফুট প্রতি সেকেণ্ড বা ফুট/সেকেণ্ড, মাইল প্রতি ঘণ্টা বা মাইল/ঘণ্টা ইত্যাদি।

একটি দৃষ্টান্ত নিলে দ্রুতি ও বেগের পার্থক্যটা পরিষ্কার হবে। P, Q এবং R তিনটি সমুদ্র বন্দর। P থেকে Q 40 কি. মি. পূর্বে আবার Q থেকে R 60 কি. মি. উত্তরে। একটি জাহাজ P থেকে Q বন্দরে পৌঁছাল 2 ঘণ্টায় এবং Q থেকে R বন্দরে পৌঁছাতে সময় নিল 3 ঘণ্টা।

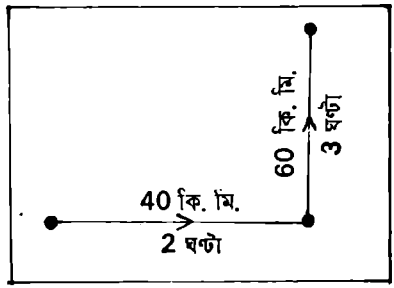

PQ পথে জাহাজটির দ্রুতি $\frac{40 \text{ কি. মি.}}{2 \text{ ঘণ্টা}}$ অর্থাৎ 20 কি. মি./ঘণ্টা। QR পথেও জাহাজটির দ্রুতি 60 কি. মি./3 ঘণ্টা বা 20 কি. মি./ঘণ্টা।

সুতরাং PQ পথে এবং QR পথে জাহাজটির দ্রুতি একই। কিন্তু PQ পথে ও QR জাহাজটির বেগ এক নয়। কেন? কেন না দুটি পথে গতির দিক এক নয়।

একটি ঢিলকে সুতো দিয়ে বেঁধে সেকেণ্ডে একবার করে ঘোরাতে থাকলে ঢিলটির দ্রুতি বরাবর সমানই থাকছে কিন্তু যেহেতু ঢিলটির গতির দিক প্রতি মুহূর্তেই বদলাতে থাকছে সেহেতু ঢিলটির বেগও প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে।

প্রশ্ন

1. দ্রুতি ও বেগের সংজ্ঞা দাও। দুটির মধ্যে মূল পার্থক্যটা কোথায়?
2. পৃথিবী সূর্যকে মোটামুটি সম-দ্রুতিতে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। প্রদক্ষিণ পথে পৃথিবীর বেগও সমান থাকছে কিনা যুক্তিসহকারে বল।
3. দুই প্রান্ত থেকে দুই ব্যাটসম্যান একই সঙ্গে দৌড়াতে আরম্ভ করে একই সঙ্গে দুই বিপরীত প্রান্তে গিয়ে পৌঁছাল। দুজনের বেগ কি সমান?

ত্বরণ (acceleration) ও মন্দন (retardation)

কোনও চলমান বস্তুর দ্রুতি বা বেগ পথের আগাগোড়া যে একই থাকবে এমন কোনও কথা নেই। গতিপথে তার দ্রুতি বা বেগের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটতে পারে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোন চলমান বস্তুর দ্রুতিতে যদি কোনও হ্রাসবৃদ্ধি না ঘটে তাহলে তার সেই দ্রুতিকে সমদ্রুতি বলা হয়। কিন্তু যদি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুটির দ্রুতিতে বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস ঘটতে দেখা যায় তবে তার সেই দ্রুতিকে ক্রমবর্ধমান দ্রুতি কিংবা ক্রমহ্রাসমান দ্রুতি বলা হয়।

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। একটি বৈদ্যুতিক পাখার ব্লেডে একটি ছোট চিহ্ন করা হল। পাখাটি চালান হল। চিহ্নটি ক্রমবর্ধমান দ্রুতিতে ঘুরতে শুরু করল। এক সময়ে দ্রুতির বৃদ্ধি বন্ধ হল। চিহ্নটি সমদ্রুতিতে ঘুরতে থাকল। এবার পাখাটি বন্ধ করা হল। চিহ্নটির দ্রুতি ক্রমশ কমতে লাগল অর্থাৎ চিহ্নটি ক্রমহ্রাসমান দ্রুতিতে ঘুরতে লাগল। কমতে কমতে এক সময়ে দ্রুতি শূন্য হয়ে গেল।

বেগের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ জটিল। বেগের মান এবং দিক দুই-ই আছে। দুটির একটিরও পরিবর্তন হওয়া মানেই বেগের পরিবর্তন হওয়া। সুতরাং **সমবেগ বলতে সেই বেগকেই বোঝাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যার মান কিংবা দিক কোনওটারই কোনও পরিবর্তন ঘটছে না।** কোনও ট্রেন যখন সমান দ্রুতিতে সরলরেখা ধরে চলতে থাকে তখন তার বেগকে সমবেগ বলা যেতে পারে।

সুতোয় বাঁধা ঢিল ঘোরানর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি ঢিলটির বেগ প্রতি মুহূর্তেই বদলাচ্ছে কারণ ঢিলটির গতির দিক প্রতি মুহূর্তেই বদলে যাচ্ছে। এবার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, যেখানে বেগের দিক ঠিকই থাকছে কিন্তু মানের পরিবর্তন হওয়ার ফলে বেগের পরিবর্তন হচ্ছে। একটি ঢিলকে ছাদের আলসে থেকে নিচে ছেড়ে দিলে ঢিলটি সরলরেখা ধরেই নামতে থাকে। কিন্তু ঢিলটির বেগের মান প্রতি মুহূর্তেই বাড়তে থাকে অর্থাৎ ঢিলটি ক্রমবর্ধমান বেগে নিচে নামতে থাকে। ঢিলটিকে নিচে থেকে উঁচুতে ছুঁড়ে দিলে ঢিলটি ক্রমহ্রাস বেগে উপরে উঠতে থাকবে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেগের পরিবর্তনের হারকে (তা যে পরিবর্তন-মানেরই হোক, কিংবা দিকের) ত্বরণ বলা হয়।

আমরা এখানে কেবলমাত্র বেগের মান পরিবর্তনের ফলে যে ত্বরণ হয় তা নিয়েই আলোচনা করব।

মনে কর একটি মোটর গাড়ি 6 মিটার/সেকেণ্ড বেগে সোজা রাস্তা ধরে ছুটছে। Accelerator টিপে তার বেগ সমান ভাবে বাড়াতে বাড়াতে 5 সেকেণ্ডের মধ্যে করা হল 16 মিটার/সেকেণ্ড। গাড়িটির বেগ কতটা বেড়েছে? বেড়েছে (16 − 6) মি./সেকেণ্ড। অর্থাৎ 10 মি./সেকেণ্ড। এই বৃদ্ধি হতে কতটা সময় লেগেছে? সময় লেগেছে 5 সেকেণ্ড। তাহলে সময় সাপেক্ষে বেগ বৃদ্ধির হার কী দাঁড়াচ্ছে? বেগ বৃদ্ধির হার দাঁড়াচ্ছে $\frac{10 \text{ মিটার/সেকেণ্ড}}{5 \text{ সেকেণ্ড}}$ অর্থাৎ 2 মিটার/সেকেণ্ড/সেকেণ্ড।

সুতরাং গাড়িটির ত্বরণ হল 2 মিটার প্রতি সেকেণ্ড প্রতি সেকেণ্ড, কিংবা লেখা যেতে পারে, 2 মিটার/সেকেণ্ড^2।

এবার মনে কর দূরে ভীড় দেখে গাড়িটির brake টেপা হল। গাড়িটি

চলছিল 16 মি./সেকেণ্ড বেগে। সমান ভাবে হ্রাস পেতে পেতে 3 সেকেণ্ডের মধ্যে গাড়িটির বেগ কমে দাঁড়াল 4 মি./সেকেণ্ড।

এক্ষেত্রে বেগের পরিবর্তন হল কত ? (4−16) মি./সেকেণ্ড বা −12 মি./সেকেণ্ড। পরিবর্তন হতে সময় লাগল কত ? 3 সেকেণ্ড। অতএব সময় সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তনের হার, অর্থাৎ ত্বরণ হল $\frac{-12 \text{ মি./সেকেণ্ড}}{3 \text{ সেকেণ্ড}}$ বা −4 মি./সেকেণ্ড^2

ঋণাত্মক ত্বরণকে অনেক সময়ে, ত্বরণ না বলে, বলা হয় মন্দন।

ত্বরণের ও মন্দনের সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলতে পারি—**সময় সাপেক্ষে ক্রমবর্ধমান বেগের বৃদ্ধির হারকে বলে ত্বরণ।** এবং **সময় সাপেক্ষে ক্রমহ্রাসমান বেগের হ্রাসের হারকে বলে মন্দন।**

উপরের দৃষ্টান্ত দুটিতে ত্বরণের ও মন্দনের একক আমরা পেয়েছি, মিটার প্রতি সেকেণ্ড প্রতি সেকেণ্ড বা মিটার/সেকেণ্ড/সেকেণ্ড বা মিটার/সেকেণ্ড^2।

ত্বরণ ও মন্দনের এককে 'প্রতি সেকেণ্ড' কথা দুটির পরপর দুবার ব্যবহার তোমাদের কাছে অদ্ভুত ঠেকতে পারে। একটু লক্ষ্য করলে দেখবে 'প্রতি সেকেণ্ড' কথা দুটি প্রথমবার এসেছে বেগের জন্য—যখন দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। কথা দুটি দ্বিতীয়বার এসেছে যখন সময় সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তনের হার নির্ণয় করতে গিয়ে বেগের পরিবর্তনকে আর একবার সময় দিয়ে ভাগ করা হয়েছে।

দূরত্ব নির্দেশের জন্য যদি লেখা হয় s, সময় নির্দেশের জন্য t, বেগ নির্দেশের জন্য v এবং ত্বরণ নির্দেশের জন্য f তাহলে—

$v = s/t$ আবার $f = v/t$

সুতরাং $f = \frac{s/t}{t} = s/t^2$

অর্থাৎ ত্বরণের একক হল (দূরত্বের একক)/(সময়ের একক)^2।

C.G.S. পদ্ধতিতে ত্বরণের একক হবে সে.মি./(সেকেণ্ড)^2, মিটার/(সেকেণ্ড)^2, কি.মি./(ঘণ্টা)^2 ইত্যাদি।

F P.S. পদ্ধতিতে ত্বরণের একক হবে ফুট/(সেকেণ্ড)^2, মাইল/(ঘণ্টা)^2 ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রশ্ন

1. **ত্বরণ ও মন্দনের সংজ্ঞা দাও।**
2. **ঋণাত্মক ত্বরণকে কি বলা হয় ? ঋণাত্মক ত্বরণের একটি দৃষ্টান্ত দাও।**
3. **ত্বরণের এককে 'প্রতি সেকেণ্ড' শব্দ দুটি পরপর দুবার ব্যবহার করা হয় কেন ?**
4. **একটি বহুতল বাড়ির ছাদ থেকে একটি ঢিলকে ছেড়ে দেওয়া হল। ঠিক 2 সেকেণ্ড পরে দেখা গেল ঢিলটির নিম্নমুখী বেগ তখন 64 ফুট/সেকেণ্ড। অভিকর্ষজ ত্বরণ 'g'-এর মান নির্ণয় কর।**
5. **একটি গাড়ি 5 মিটার/সেকেণ্ড বেগে চলেছিল। accelerator টিপে গাড়িটিতে 2 মিটার/(সেকেণ্ড)^2 ত্বরণ উৎপন্ন করা হল। 4 সেকেণ্ড পরে গাড়িটির বেগ কত হবে ?**
6. **একটি গাড়ি 62 কি.মি./ঘণ্টা বেগে যাচ্ছিল। Brake কষে 3 সেকেণ্ডের মধ্যে বেগ কমিয়ে করা হল 32 কি.মি. ঘণ্টা। গাড়িটির মন্দন নির্ণয় কর। (ইংগিত ঃ এখানে বেগ দেওয়া আছে কি.মি./ঘণ্টা একত্রে। সুতরাং 3 সেকেণ্ডকেও ঘণ্টায় পরিণত করে নিতে হবে। উত্তর আসবে কি.মি./ঘণ্টা এককে।**

পদার্থের ধর্ম
(Properties of matter)

ধর্ম শব্দটি আমরা সাধারণত যে অর্থে ব্যবহার করে থাকি এখানে কিন্তু ঠিক সে অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে. না। পদার্থের ধর্ম বলতে পদার্থের যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য সমূহকে বোঝান হচ্ছে। যেমন মিষ্ট স্বাদ, সাদা বর্ণ, জলে দ্রবীভূত হতে পারা এগুলি হল চিনি নামক পদার্থটির কয়েকটি ধর্ম।

বিভিন্ন পদার্থের ধর্মে বিভিন্নতা থাকাই স্বাভাবিক। যেমন লোহা কঠিন, কিন্তু কেরোসিন তরল আবার হাইড্রোজেন গ্যাসীয় পদার্থ। মিছরী সাদা, গন্ধক হলদে, তুঁতে নীল। স্যাকারীন মিষ্টি, রক্ত নোনতা, ফটকিরি কষা। কাঁচের ঘনত্ব বেশি কাঁচ জলে ডুবে যায়। কাঠির ঘনত্ব কম, কাঠ জলে ভাসে। লবণ জলে দ্রাব্য, কিন্তু গন্ধক দ্রাব্য নয়।

অবশ্য দুটি ভিন্ন পদার্থের এক বা একাধিক ধর্মে মিল থাকা অসম্ভব নয়। তাই বলে কিন্তু একটি পদার্থের যাবতীয় ধর্ম অন্য একটি পদার্থের যাবতীয় ধর্মের সংগে হুবহু মিলে যাওয়া কখনোই সম্ভব নয়। যেমন চিনি ও লবণ দুটি পদার্থই কঠিন, সাদা ও জলে দ্রাব্য কিন্তু প্রথমটির স্বাদ মিষ্টি দ্বিতীয়টির নোনতা।

একটি মানুষের বৈশিষ্ট্য সমূহকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। এক, তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য সমূহ। দুই, তার অন্তরের বৈশিষ্ট্য সমূহ। বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য, যেমন উচ্চতা, দেহের গঠন, গায়ের রং, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি। অন্তরের বৈশিষ্ট্য, যেমন বুদ্ধিমান না বোকা, দয়ালু না নিষ্ঠুর ইত্যাদি।

ঠিক তেমনি পদার্থের বৈশিষ্ট্য সমূহকেও দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

1. ভৌত ধর্ম (Physical Properties)
2. রাসায়নিক ধর্ম (Chemical Properties)

পদার্থের যে সব ধর্মের মাধ্যমে আমরা তার বাহ্যিক অবস্থা ও আচরণ সম্বন্ধে জানতে পারি সেগুলোকে বলা হয় পদার্থের ভৌতধর্ম।

পদার্থের ভৌত ধর্মগুলি সাধারণত আমরা আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহের সাহায্যে উপলব্ধি করতে পারি। এগুলি তার বাহ্যিক ধর্ম।

পদার্থের ভৌত ধর্মসমূহের পর্যালোচনায় প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিচার করে দেখা হয়।

1. পদার্থের অবস্থা। অর্থাৎ পদার্থটি কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়।
2. পদার্থের ঘনত্ব। অর্থাৎ পদার্থটির একক আয়তনের ভর কত।
3. পদার্থের—a. স্পর্শ। মসৃণ, অমসৃণ, পিচ্ছিল ইত্যাদি।
   b. বর্ণ। লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদি।
   c. গন্ধ। কটুগন্ধ, ঝাঁঝাল গন্ধ, দুর্গন্ধ ইত্যাদি।
   d. স্বাদ। ঝাল, মিষ্টি, তেতো, বিস্বাদ ইত্যাদি।
4. পদার্থের দ্রাব্যতা। অর্থাৎ পদার্থটি কোন তরলে দ্রবীভূত হয়। কোন তরলে হয় না।
5. পদার্থের চৌম্বকধর্মিতা। অর্থাৎ পদার্থটি চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় কিনা।
6. পদার্থের তড়িৎ পরিবাহিতা। অর্থাৎ পদার্থটি তড়িতের সুপরিবাহী বা কুপরিবাহী।

7. পদার্থের তাপ পরিবাহিতা। অর্থাৎ পদার্থটি তাপের সুপরিবাহী বা কুপরিবাহী।

পদার্থের যেসব ধর্মের মাধ্যমে আমরা তার আণবিক গঠন সম্বন্ধে এবং তার রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে পারি সেগুলোকে পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম বলা হয়।

পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম হল তার ভেতরের ধর্ম। রাসায়নিক ধর্মগুলোকে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারি না। পদার্থের রাসায়নিক ধর্মগুলি জানা যায় তার বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে।

পদার্থের রাসায়নিক ধর্মসমূহের পর্যালোচনায় প্রধানত যে সমস্ত বিষয় নিয়ে বিচার করে দেখা হয় সেগুলো হল—

1. দাহ্যতা। পদার্থটি নিজে দাহ্য কিনা, অপরের দহনে সহায়তা করে কিনা।
2. পদার্থের ওপর তাপের প্রভাব। অর্থাৎ তাপ প্রয়োগে পদার্থটির কোনও আণবিক পরিবর্তন ঘটে কিনা। ঘটলে পরিবর্তনটি কিরকম।
3. অ্যাসিডের প্রভাব। অর্থাৎ পদার্থটি অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কিনা। করলে বিক্রিয়াটি কিরকম।
4. ক্ষারের প্রভাব। অর্থাৎ পদার্থটি ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কিনা। করলে কিরকম বিক্রিয়া।
5. জলের প্রভাব। অর্থাৎ পদার্থটি জলের সঙ্গে কোনও বিক্রিয়া করে কিনা। করলে কিরকম।
6. বায়ুর প্রভাব। অর্থাৎ পদার্থটি বায়ুর সাথে কোনও বিক্রিয়া করে কিনা। করলে কিরকম।
7. অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে পদার্থটির বিক্রিয়া। যেমন H_2S, CO_2, H_2, S প্রভৃতির সঙ্গে।
8. তড়িৎ প্রবাহের প্রভাব। অর্থাৎ পদার্থটির মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পাঠালে পদার্থটির আণবিক পরিবর্তন ঘটে কিনা।

প্রশ্ন

1. পদার্থের ভৌত ধর্ম ও পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম বলতে কী বোঝ?
2. ভৌত ধর্মের পর্যালোচনায় প্রধানত কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে বিচার করা হয়?
3. রাসায়নিক ধর্মের পর্যালোচনায় প্রধানত কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে বিচার করা হয়?

পদার্থ সনাক্তকরণ (Identification of matter)

খবরের কাগজে তোমরা নিশ্চয়ই অপরাধীকে সনাক্ত করা বা মৃতদেহ সনাক্ত করার কথা পড়ে থাকবে। সনাক্ত করার অর্থ হল নিশ্চিতভাবে চিনতে পারা। মৃতদেহ ও অপরাধীকে সনাক্ত করা হয় তাদের দেহগত বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে, তাদের সাজ-পোষাক, হাবভাব প্রভৃতির সাহায্যে। ঠিক তেমনি পদার্থকে সনাক্ত করা হয় তার ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সমূহের সাহায্যে।

ভৌত ধর্মের সাহায্যে এবং রাসায়নিক ধর্মের সাহায্যে কীভাবে পদার্থকে সনাক্ত করা যায় তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে দেখ।

1. একটা মোড়কে গন্ধক চূর্ণ আছে, আরেকটা মোড়কে আছে কার্বন চূর্ণ। কীভাবে জানবে কোনটা কী?
   ঃ বর্ণের সাহায্যে। গন্ধক চূর্ণের বর্ণ হলদে হবে, কার্বন চূর্ণের বর্ণ কালো।
2. একটা ঠোঙায় ময়দা আছে, অন্যটাতে গুঁড়ো চক। কীভাবে বুঝবে কোন্‌টা কী?
   ঃ স্পর্শের সাহায্যে। যেটা মসৃণ সেটা

ময়দা, যেটা খসখসে সেটা চক গুঁড়ো।

3. একটা কাগজে আছে মিছরি গুঁড়ো, অন্যটাতে গুঁড়ো ফটকিরি। কী করে জানবে কোন্‌টা কী ?

ঃ স্বাদের সাহায্যে। যেটা মিষ্টি সেটা মিছরি, যেটা কষা সেটা ফটকিরি। এখানে একটা বিষয়ে সাবধান করে দেওয়া ভাল। না জেনে কোনও কিছু ঝপ করে মুখে দেওয়া উচিত নয়।

4. একটা গ্যাসজারে অ্যামোনিয়া গ্যাস আছে, অন্যটাতে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস। কী করে চিনবে কোন্‌টা কী ?

ঃ গন্ধের সাহায্যে। যেটার গন্ধ ঝাঁঝালো সেটা অ্যামোনিয়া (NH_3) আর যেটার গন্ধ পচা ডিমের গন্ধের মত সেটা হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস (H_2S)।

5. একটা পাত্রে চকের গুঁড়ো আছে অন্যটাতে গুঁড়ানো লবণ। কী করে জানবে কোন্‌টা কী ?

ঃ দ্রবণীয়তার দ্বারা। যেটা জলে দ্রাব্য সেটা লবণ, যেটা জলে দ্রাব্য নয় সেটা চক।

স্বাদ্যের সাহায্যেও চেনা যেতে পারে।

6. একটা শিশিতে লৌহ চূর্ণ অন্যটাতে অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ আছে। কী উপায়ে বুঝবে কোন্‌টা কী ?

ঃ চৌম্বক ধর্মের সাহায্যে। চুম্বক লৌহ চূর্ণকে আকর্ষণ করবে কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণকে করবে না।

ঘনত্বের সাহায্যেও চেনা যেতে পারে।

উল্লিখিত ছয়টি ক্ষেত্রে সনাক্ত করা হয়েছে ভৌত ধর্মের সাহায্যে। এবার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, যেখানে রাসায়নিক ধর্মের সাহায্যে সনাক্ত করা হচ্ছে।

1. একটা গ্যাসজারে অক্সিজেন গ্যাস আছে অন্যটিতে হাইড্রোজেন। কীভাবে চেনা যাবে কোন্‌টা কী ?

ঃ দাহ্যতার সাহায্যে। যেটা দাহ্য সেটা হাইড্রোজেন গ্যাস (H_2) যেটা নিজে দাহ্য নয় বটে কিন্তু অন্যের দহনে সহায়তা করে সেটা অক্সিজেন (O_2)।

2. একটা গ্যাসজারে অক্সিজেন আছে অন্যটিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। কী উপায়ে চেনা যাবে কোন্‌টা কী গ্যাস।

ঃ রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস (CO_2) চুনের জল [$Ca(OH)_2$] এর সাথে বিক্রিয়া করে অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ($CaCO_3$) গঠন করবে যার ফলে স্বচ্ছ চুনের জলটা ঘোলাটে হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে অক্সিজেনের সাথে চুনের জলের কোনও বিক্রিয়াই হবে না। সুতরাং চুনের জল যেমন স্বচ্ছ ছিল তেমনিই থেকে যাবে।

এবারে আরও একরকম দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

1. মনে কর একটি গ্যাস, বর্ণহীন ও গন্ধহীন, ঈষৎ অম্ল স্বাদযুক্ত, বায়ুর চেয়ে ভারী, জলে বেশ দ্রাব্য। গ্যাসটি নিজেও দাহ্য নয়, দহনেও সহায়তা করে না। স্বচ্ছ চুনের জলকে ঘোলা করে। গ্যাসটি কী ? ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মগুলো বিচার করে গ্যাসটিকে নিঃসন্দেহে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বলে সনাক্ত করা যাচ্ছে।

2. আরেকটি গ্যাস, তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত স্বাদহীন, বর্ণহীন বায়ুর চেয়ে হাল্কা, জলে অত্যন্ত দ্রাব্য। গ্যাসটি ভিজে লাল লিটমাস কাগজকে নীল করে এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (HCl) সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের (NH_4Cl) সাদা ধোঁয়া উৎপন্ন করে। গ্যাসটি, কী গ্যাস ? ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মগুলো বিচারে গ্যাসটি নিঃসন্দেহে অ্যামোনিয়া (NH_3)।

প্রশ্ন

1. গন্ধক, তুঁতে, সিঁদুর ও ময়দা দেওয়া আছে। বর্ণ দেখে বল কোন্‌টা কী ?
2. তিনটি শিশির একটিতে জল, একটিতে স্পিরিট এবং একটিতে কেরোসিন তেল আছে। কীভাবে জানবে কোন্‌টিতে কী আছে ?
3. চৌম্বকধর্মের সাহায্যে কীভাবে বুঝবে কোন্‌টি নিকেল এবং কোন্‌টি টিন ?
4. ঘনত্বের সাহায্যে কীভাবে বুঝবে কোন্‌টি লোহা ও কোন্‌টি অ্যালুমিনিয়াম ?

অমৃতসূ দাস

নিয়মাবলী

যাঁরা লিখতে চান

- আমাদের পত্রিকা একান্তভাবে 'নবম-দশম' শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা-সহায়ক রূপে পরিকল্পিত। এই উদ্দেশ্যের সমানুপাতিক রচনা আমাদের দপ্তরে সাদরে গৃহীত হবে। তবে কবিতা-গল্প আমাদের দপ্তরে পাঠাবেন না।
- শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, আগ্রহ ও কৌতূহল বৃদ্ধি ও মানসিক সজীবতা ও ক্রিয়াশীলতা প্রবর্ধক রচনা দপ্তরে সাগ্রহে গৃহীত হবে।
- সব রচনাই চলিত ভাষায় রচিত হওয়া প্রয়োজন। 'ফুলস্ক্যাপ' কাগজের একপিঠে বাঁদিকে বড় মার্জিন রেখে কালো অথবা কোন গাঢ় কালিতে স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাবেন। কোন লেখাই ষোলশ শব্দের চেয়ে বড় হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সঙ্গে প্রয়োজনীয় ছবি, চার্ট ম্যাপ ইত্যাদি পাঠালে ভাল হয়।
- প্রেরিত রচনা সম্পাদনার অধিকার সম্পাদকীয় দপ্তরের থাকবে। এ বিষয়ে আপত্তি থাকলে স্পষ্ট করে জানাবেন।
- কপি রেখে লেখা পাঠাবেন। আমাদের পক্ষে কোন লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে লেখা মনোনীত হলে সংবাদ দেওয়া হবে। লেখার সঙ্গে ডাকটিকিট পাঠাবার দরকার নেই।
- লেখার সঙ্গে সাদা কাগজে স্পষ্টাক্ষরে নিজ ঠিকানা তিনবার [একবার ইংরাজীতে] লিখে দেবেন। এতে আমাদের কাজের সহায়তা হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা : সম্পাদক, নবম দশম, ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড। ৩৩, বিপ্লবী অনুকূল-চন্দ্র স্ট্রিট। কলকাতা-৭০০ ০৭২।

প্রকাশকদের জন্য

- আমরা কিশোরদের জন্য প্রকাশিত গ্রন্থের সমালোচনা করব। এজন্য সম্প্রতি প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের দু'কপি পাঠাবেন।
- প্রতিমাসে প্রকাশিত কিশোর গ্রন্থের বিশেষ তালিকা দিতে আমরা আগ্রহী। এজন্য প্রকাশকগণ বুলেটিন, বুকলিস্ট পাঠালে আমরা সহযোগিতার নিদর্শণ বলে গ্রহণ করব।
- গ্রন্থের বিজ্ঞাপনের জন্য ইত্যাদি প্রকাশনীর অ্যাডভার্টাইজিং ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জীবন-বিজ্ঞান

আগের দিন আমরা 'শ্বসন' পড়া শেষ করেছি। তারপর শুরু হয়েছে 'শ্বাসকার্য'। জীবকোষের মধ্যে 'শ্বসন' নামক রাসায়নিক প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে বলেই জীবের 'শ্বাসকার্য' করার প্রয়োজন হয়। আজ প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্বাসকার্যের নানান পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব। সেইসঙ্গেই তোমাদের সিলেবাসের 'সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের তাৎপর্য' অধ্যায়টি শেষ হবে।

'শ্বাসকার্য' নিয়ে চতুর্থ পাঠে আলোচনা শুরু করার সময় মোট চার ভাগে পড়াটাকে ভেঙ্গে নিয়েছিলাম। সেগুলো ছিল—

১ শ্বাসকার্যের প্রয়োজনীয়তা এবং শ্বসনের সঙ্গে শ্বাসকার্যের সম্পর্ক।
২. উদ্ভিদের শ্বাসকার্য।
৩ প্রাণীজগতের বিভিন্ন প্রকার শ্বাসকার্য।
৪. মানুষের শ্বাসকার্য।

প্রথম পয়েন্টটা আমাদের পড়া হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পয়েন্টটা থেকে আজকের পড়া শুরু করি।

২. উদ্ভিদের শ্বাসকার্য ঃ

উদ্ভিদ যখন শুধু শ্বসন করে, (যেমন, রাত্রে), তখন অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। কিন্তু শ্বসনের সঙ্গে যদি একই সময়ে সালোকসংশ্লেষও চলতে থাকে (যেমন, আলোকের উপস্থিতিতে), তবে হয় এর উল্টো। এগুলো তুমি জান। পরিবেশের সঙ্গে এই অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আদান-প্রদান উদ্ভিদ কীপদ্ধতিতে করে, তা এবার দেখব।

প্রাণীদের শ্বাসকার্য সম্পর্কে যখন বলব, তখন দেখবে, একেবারে নিম্নস্তরের প্রাণীদের বাদ দিলে, বাকি সকলের দেহেই শ্বাসকার্য করার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু উদ্ভিদের দেহে, সে যত উন্নত উদ্ভিদই হোক না কেন, ব্যাপারটা কেমন যেন জোড়াতালি দেওয়া। **উদ্ভিদের দেহে শ্বাসকার্যের জন্য কোনও নির্দিষ্ট অঙ্গ নেই।** (এই কথাটা মনে রাখবে।) তাহলে শ্বাসকার্য চলে কিভাবে? এক কথায় বলতে গেলে, উদ্ভিদের সমস্ত শরীরেই ছোট ছোট ছিদ্রের ব্যবস্থা আছে—তার মধ্য দিয়েই কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের আদান-প্রদান হয়। এই ছিদ্রগুলো মোটামুটি দুরকম—**১. স্টোমা, ২. লেন্টিসেল।** এবার এদের সম্বন্ধে অল্প অল্প জেনে নাও।

১. **স্টোমা (Stoma) ঃ** স্টোমা সম্বন্ধে দ্বিতীয় পাঠের ১০১ আর ১০৩ পাতায় যা বলা আছে, সেটুকু জানলেই যথেষ্ট। সেইসঙ্গে ১০৩ পাতায় দেওয়া স্টোমার ছবিটাও আরেকবার দেখে নিও। অবশ্য আরও কিছু যদি জানার ইচ্ছে থাকে, সেজন্য কয়েকটা কথা বলে রাখি। 'স্টোমা' বলতে দুটি রক্ষীকোষসহ পত্ররন্ধ্রটিকে বোঝায়, আবার রক্ষীকোষ ছাড়া শুধু ছিদ্রটিকেও স্টোমা বলে। (স্টোমা কথাটির অর্থ - মুখ বা mouth)। উদ্ভিদের শুধু সবুজ অংশগুলিতেই স্টোমা থাকে, অর্থাৎ মূলে স্টোমা থাকে না। বুঝতেই পারছ, স্টোমা সবচেয়ে বেশি থাকে উদ্ভিদের পাতায়। সমাঙ্কপৃষ্ঠ পত্রের দুই পিঠেই স্টোমা থাকে, কিন্তু বিষমপৃষ্ঠ পাতার ওপরের পিঠে যে প্রায়

থাকেই না, সে কথাত জানই। এই ফাঁকে বলে রাখি, উদ্ভিদের পাতায় প্রতি বর্গ মিলিমিটার স্থানে মোটামুটি ১০০ থেকে ৩০০টি স্টোমা থাকে। আরেকটা কথা খেয়াল রেখ, যেসব পাতা জলের ওপর ভেসে থাকে, যেমন শালুক বা পদ্মপাতা, তাদের শুধু ওপরের পিঠেই স্টোমা দেখতে পাওয়া যায় ; যে পিঠটা জলের সংস্পর্শে থাকে, সেখানে স্টোমা থাকে না। আর যেসব উদ্ভিদের সমস্ত পাতাটাই জলের নিচে, তাদের পাতাতে ত' স্টোমা থাকেই না।

২. লেন্টিসেল (Lenticel) ঃ একটু আগেই বললাম স্টোমা থাকে শুধু উদ্ভিদের সবুজ অংশগুলিতে। তাহলেই বুঝতে পারছ, উদ্ভিদের দেহের বাকি অংশে অন্য যে ছিদ্রগুলি আছে, তাদেরই নাম লেন্টিসেল। ছবিটা দেখ। লেন্টিসেল আসলে ছিদ্র নয়, তবে কাজের দিক থেকে অনেকটা ছিদ্রের মত। এমনিতে উদ্ভিদ

লেন্টিসেলের ছিদ্রের ঠিক নিচে থাকে আলগাভাবে সজ্জিত কিছু কোষ

দেহের বাইরের দিকে যে কোষগুলি থাকে, তারা থাকে ঘনসন্নিবদ্ধভাবে—যেন পরপর ইট সাজিয়ে তৈরি বাড়ির দেওয়াল। একেই বলে বহিস্ত্বক। এই বহিস্ত্বকের মধ্য দিয়ে গ্যাসের আদানপ্রদান ত সম্ভব নয়, তাই এই বহিস্ত্বকে কিছুদূর অন্তর একটু অন্যরকম পরিবর্তন দেখা যায়। সেই স্থানগুলোতে অনেকগুলো কোষ একসঙ্গে জমা হয়, বাইরে থেকে মনে হয়, সেখানটা যেন একটু উঁচু হয়ে আছে, আর যেন একটু চিড় খেয়ে গেছে বা ফুটো হয়ে গেছে। আসলে ঐ কোষগুলো খুব আলগা আলগা ভাবে থাকে, তার ফলে তাদের পরস্পরের মাঝখানে অনেকটা করে জায়গা থাকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা অক্সিজেন ঢোকার আর বেরোনর জন্য। অনেক সময়েই দেখা যায় শীতকালে লেন্টিসেলগুলো বন্ধ হয়ে যায়, আবার শীত চলে গেলেই নতুন করে তৈরি হয়।

জলজ উদ্ভিদের শ্বাসকার্য ঃ জলজ উদ্ভিদের গায়ে স্টোমা বা লেন্টিসেল থাকে না। কিন্তু সমস্ত শরীরেই ব্যাপন প্রক্রিয়ায় জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন বা কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রবেশ করে, আবার একই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদদেহ থেকে জলে মিশে যায়। খেয়াল রেখ, জলের নিচে চোট আঘাতের সম্ভাবনা প্রায় নেই বলে জলজ উদ্ভিদের দেহে কোনও বল্কল (বাকল) থাকে না। দেহের উপর অভেদ্য বল্কলের আবরণ থাকলে কিন্তু ব্যাপন সম্ভব হত না। ব্যাপন বলতে কী বোঝায়, একটু পরেই সংক্ষেপে বলব।

এবার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দাওঃ

১. **উদ্ভিদদেহে শ্বাসকার্যের জন্য দুরকম ছিদ্র আছে। তাদের নাম কী ?**

২. **স্টোমা উদ্ভিদের কোথায় কোথায় থাকে ?**

৩. **উদ্ভিদের মূলে গ্যাসের আদান প্রদান হয় কীভাবে ? (উত্তর ভেবে ঠিক কর।)**

৪. **স্থলজ আর জলজ উদ্ভিদের শ্বাসকার্যের পার্থক্য কী ?**

৩. প্রাণীজগতের বিভিন্ন প্রকার শ্বাসকার্য ঃ

প্রাণী জগতের শ্বাসকার্য সম্পর্কে জানার আগে তোমাদের কয়েকটা কথা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। পৃথিবীতে যেমন

অসংখ্য ধরনের উদ্ভিদ আছে, তেমনি অসংখ্য ধরনের প্রাণীও আছে। কিন্তু শ্বাসকার্যের পদ্ধতি সব উদ্ভিদেরই যে মোটামুটি এক—সে ত দেখলেই। প্রাণীদের বেলায় কিন্তু তা নয়। নিচের ক্লাসে জীবন বিজ্ঞানে পড়েছ, প্রাণীরাজ্যকে নিচু থেকে উঁচু শ্রেণীতে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা হয়ে থাকে। তেমনি শ্বাসকার্যের পদ্ধতিতেও এদের বিরাট রকমফের দেখা যায়। সেগুলো কেমন, তোমাকে জানতে হবে। সে ব্যাপারে বলার আগে অন্য তিনটে বিষয় সম্পর্কে তোমাকে কিছু বলব।

কলা, অঙ্গ ও তন্ত্র ঃ প্রাণী জগতের বিভিন্ন প্রকার শ্বাসকার্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে গেলে তোমাকে কলা, অঙ্গ আর তন্ত্র, এই তিনটে শব্দের অর্থ জেনে রাখতে হবে। জীবদেহ সৃষ্টি হয় কোষ দিয়ে। এককোষী জীবের দেহে কোষ একটিই, কিন্তু বহুকোষী জীবের দেহে কোষের সংখ্যা অনেক বেশি—প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অসংখ্য। এককোষী জীবের ঐ একটি কোষই নিজ দেহের যাবতীয় কাজকর্ম চালায়। কিন্তু বহুকোষী জীবের দেহে এক এক ধরনের কোষ এক এক রকম কাজে নিযুক্ত থাকে। একদলের ওপর থাকে শ্বাসকার্যের ভার, একদল করে রক্ত সংবহন, আবার একদল খাদ্য পরিপাকে ব্যস্ত থাকে। এমনি আরও অনেক রকম। এবার মন দিয়ে দেখ। জীবদেহে **একাধিক কোষ সম্মিলিত হয়ে যদি একই উদ্দেশ্যে কাজ করে, তবে তাকে বলা হয় 'কলা'।** যেমন, পাকস্থলীর ভিতরের দেওয়ালে যে অসংখ্য কোষ আছে, তাদের কিছু কোষ পাচকরস নির্গত করে খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে। এরা এক ধরনের 'গ্রন্থিকলা'। আবার **একাধিক ধরনের কলা সম্মিলিত হয়ে যদি একই উদ্দেশ্যে কাজ করে, তবে তাকে বলে 'অঙ্গ'।** যেমন, পাকস্থলীর এক ধরনের কলা পাচক রস নিঃসৃত করে। এক ধরনের কলা সেই পাচকরসে পাকস্থলী নিজেই যাতে হজম না হয়ে যায়, তার ব্যবস্থা করে। (শুনতে বেশ অদ্ভুত, না?) আবার এক ধরনের কলা পাকস্থলীকে সঙ্কুচিত প্রসারিত করে খাদ্য চূর্ণবিচূর্ণ করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে অপর একটি কলা অতি সামান্য কিছু পরিপাক হওয়া খাদ্য শোষণ করে। অর্থাৎ, বেশ কয়েক রকম কলা মিলে একটি অঙ্গ তৈরি করে, যে অঙ্গের উদ্দেশ্য খাদ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করে পাচকরসের সঙ্গে মিশিয়ে পরিপাকের প্রথম ধাপ শুরু করা, আর সেই সঙ্গে সামান্য কিছু পাচিত খাদ্য শোষণ করা। এই অঙ্গই পাকস্থলী। এইরকম **একাধিক অঙ্গ সম্মিলিত হয়ে যদি একই উদ্দেশ্যে কাজ করে, তবে তাকে বলে 'তন্ত্র'।** যেমন, জিভ খাদ্য নাড়াচাড়া করে গিলতে সাহায্য করে, পাকস্থলী খাদ্য বিচূর্ণ করে ও পরিপাক শুরু করে, ক্ষুদ্রান্ত পরিপাক ও খাদ্যের শোষণ ঘটায়, বৃহদন্ত্র পাচিত খাদ্যের শোষণ সম্পূর্ণ করে। মলাশয় অপাচ্য খাদ্যকে মলরূপে জমা রাখে। কিন্তু এই সবকটি অঙ্গেরই মূল উদ্দেশ্য একটাই, যে বস্তুকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হচ্ছে, তাকে পরিপাক করে দেহের প্রয়োজনীয় অংশটুকু শোষণ করা। তাই এদের সবাইকে নিয়ে তৈরি হয় একটি তন্ত্র, যার নাম **'পোষ্টিকতন্ত্র'।** তোমার পাঠ্য অংশে 'বিভিন্ন প্রাণীর শ্বাস অঙ্গ' সম্পর্কে বিশেষভাবে জোর দেওয়া আছে, তাই, সেটা পড়ার আগে 'অঙ্গ' বলতে আসলে কী বোঝায়, সেটা খেয়াল রেখ।

প্রাণী জগতের সংক্ষিপ্ত শ্রেণী বিভাগ ঃ এ সম্বন্ধে আগের ক্লাসগুলোতে পড়েছ। কিন্তু একটু পরেই দেখতে পাবে, প্রাণী জগতের উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে

শ্বাস অঙ্গ এবং শ্বাসতন্ত্রেরও উন্নতি ঘটেছে কেমনভাবে। তাই, বিভিন্ন প্রাণীর শ্বাসকার্যের প্রকারভেদটা সহজে মাথায় ঢুকিয়ে নিতে গেলে প্রাণী জগতে শ্রেণী-বিভাগটাও অল্পকথায় মনের মধ্যে ধরে রাখা চাই। প্রত্যেকের সম্বন্ধে একটা দুটো করে কথা বলছি, আপাতত সেটাই যথেষ্ট। ছবি দেখে উদাহরণগুলো মনের মধ্যে গেঁথে নাও।

প্রাণী জগতের প্রধান ভাগ দুটো—ক. মেরুদণ্ডী. খ. অমেরুদণ্ডী। যাদের মেরুদণ্ড আছে, যেমন, মানুষ, তাদের বলে মেরুদণ্ডী। যাদের নেই, তারা অমেরুদণ্ডী।

ক. মেরুদণ্ডী ঃ এদের পাঁচটি ভাগ, ভাগগুলোকে বলে শ্রেণী (class)। নিচু থেকে উঁচুতে ওঠার সিঁড়ি অনুযায়ী এরা হল ঃ ১. মৎস্য (রুই, কাতলা). ২. উভচর (ব্যাঙ). ৩. সরীসৃপ (সাপ), ৪. পক্ষী (টিয়া). ৫. স্তন্যপায়ী (গিনিপিগ, মানুষ)। ব্র্যাকেটে উদাহরণগুলো দিলাম, যদিও সবকটাই জান। এটা নিশ্চয়ই বুঝেছ, মেরুদণ্ডী প্রাণীরা অমেরুদণ্ডীদের চেয়ে উন্নত।

খ. অমেরুদণ্ডী ঃ এদের মোটামুটি ন'য়টি ভাগ। ভাগগুলোকে বলে পর্ব (phylum)। এরা হল ঃ

১. প্রোটোজোয়া (Protozoa) বা আদ্য প্রাণী ঃ এরা এককোষী। যেমন, অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম।

২. পরিফেরা (Porifera) বা ছিদ্রাল প্রাণী ঃ এরা বহুকোষী। কিন্তু এদের দেহে কোনও অঙ্গ বা তন্ত্র নেই। যেমন, স্পঞ্জ। প্রোটোজোয়া বাদে সকলেই বহুকোষী।

৩. সিলেনটারেটা (Coelenterata) বা একনালীদেহী প্রাণী ঃ এদের দেহে অঙ্গ এবং তন্ত্রের প্রথম আবির্ভাব ঘটে, কিন্তু কোনটাই তেমন নিখুঁত নয়। এদের দেহে প্রতিসাম্য দেখা যায়। যেমন, হাইড্রা।

৪. প্ল্যাটিহেলমিনথেস (Platyhelminthes) বা চ্যাপ্টা কৃমি ঃ এদের দেহ চ্যাপ্টা। এদের পৌষ্টিকতন্ত্র অসম্পূর্ণ, কারণ এদের পায়ুছিদ্র থাকে না। যেমন, ফিতাকৃমি, যকৃৎকৃমি।

৫. নিমাটহেলমিনথেস (Nemathelminthes) বা গোলকৃমি—এদের দেহ চ্যাপ্টা নয়, গোল। সেই সঙ্গে এদের পায়ুছিদ্র থাকায় পৌষ্টিকতন্ত্রও সম্পূর্ণ। যেমন—হুকওয়ার্ম, অ্যাসকারিস ইত্যাদি।

৬. অ্যানিলিডা (Annelida) বা অঙ্গুরী-মাল প্রাণী—এদের দেহ আংটির মত কয়েকটি খণ্ড দিয়ে গঠিত। এদের দেহে রক্ত থাকে। যেমন—কেঁচো, জোঁক।

৭. আরথ্রোপোডা (Arthropoda) বা সন্ধিপদ প্রাণী—এদের নাম শুনেই বোঝা যায় যে এদের পা থাকে, আর সেগুলো যেন কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত। আরশোলা, মাকড়সা, চিংড়ি—এদের পায়ের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে।

৮. মোলাস্কা (Mollusca) বা কাম্বোজ প্রাণী—এদের দেহ একতাল নরম মাংস দিয়ে তৈরি, আর সেটা সাধারণত ঢাকা থাকে শক্ত খোলস দিয়ে। যেমন, শামুক। খোলস না থাকা একটি মোলাস্কা হল অক্টোপাস।

৯. একাইনোডার্মাটা (Echinodermata) বা কণ্টকত্বক প্রাণী—এদের দেখতে তারার মত পাঁচকোণাচে। প্রায় সকলের গায়েই কাঁটা থাকে, আর থাকে চলবার জন্য 'টিউবফীট' (tube-feet) নামে একরকম অঙ্গ। এরা সকলেই সমুদ্রবাসী। উদাহরণ—তারা মাছ।

পরপর যেমন ভাবে সাজান আছে, তেমনি ভাবেই সবসময় বলা হয়, কারণ বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় পরের পর্বগুলো আগের পর্বগুলোর চেয়ে বেশি উন্নত।

প্রাণীজগতের এই সংক্ষিপ্ত শ্রেণী-বিভাগটা মোটামুটি খেয়াল রেখ, কারণ প্রাণীবিদ্যার এটা একেবারেই অ আ ক খ।

ব্যাপন প্রক্রিয়া (Diffusion) ঃ শ্বাসকার্যের পদ্ধতির ব্যাপারে প্রায়ই ব্যাপন প্রক্রিয়ার কথা আসবে। তাই এ সম্বন্ধে জেনে রাখ।

দোলের দিন কী কর বলত? এক বালতি জলে এক চামচ রঙ ফেলে দাও প্রথমে। তারপর সেই রঙটা সারা বালতির জলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। অবশেষে সমস্ত জলটাই রঙীন হয়ে যায়। এটা ব্যাপনের একটা উদাহরণ। ঘটনাটা কী ঘটে বলি। জলের যে স্থানটিতে ঐ এক চামচ রঙ পড়ে, সেখানে রঙের আধিক্য, আর জলের অন্য স্থানে রঙ নেই, বা খুবই কম। তখন ঐ রঙের কণাগুলো জলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে ছোটাছুটি করতে শুরু করে, আর এইভাবে সমস্ত জলেই রঙটা সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে পড়ার নামই 'ব্যাপন'। ('ব্যাপন' কথাটা তোমার কাছে নতুন হলেও 'ব্যাপ্তি' কথাটা ত চেনা।) আর একটা কথা বলার আছে। ঐ যে বালতিতে রঙ দিয়েছ, ধর, সেই বালতির ঠিক মাঝখানে একটা পর্দা দিয়ে বালতির জলটাকে দুপাশে দুভাগে ভাগ করা আছে। এখন, এই পর্দাটা এমন, যে, এর মধ্য দিয়ে দ্রবীভূত রঙের কণাগুলো ইচ্ছেমত বাধাহীনভাবে যাতায়াত করতে পারে। তাহলে, যদি ঐ বালতির জলের যে কোন একপাশে রঙটা দেওয়া হয়, তাহলে পর্দাটা থাকা সত্ত্বেও পর্দার অন্য দিকের বর্ণহীন জলও রঙীন হয়ে উঠবে। এই ক্ষেত্রে আমরা বলি, ঐ পর্দাটি **ভেদ্য (permeable)** পর্দা, এবং **ঐ পর্দার মধ্য দিয়ে রঙীন কণাগুলোর ব্যাপন ঘটছে।** এই ব্যাপন প্রক্রিয়ারই উদাহরণ প্রতি মুহূর্তে পাবে প্রাণীদের শ্বাসকার্যের পদ্ধতিতে।

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ভেবে নাও—

১. **'কলা' কাকে বলে?**

২. **'অঙ্গ' কাকে বলে?**

৩. **একটি তন্ত্র কীভাবে গঠিত হয়? একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।**

৪. **প্রাণীজগৎকে প্রধান দুভাগে ভাগ**

করা যায়। সে ভাগ দুটি কী কী ?

৫. মেরুদণ্ডী প্রাণীদের যে পাঁচটি শ্রেণী আছে, তাদের নাম বল।

৬. অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের নয়টি পর্বের একটি করে উদাহরণ দাও।

৭. অন্য লোকের মাখা সেন্টের গন্ধ তোমার নাকে পৌঁছায় কোন্ প্রক্রিয়ায় বলত ? (বলে দিই, সেন্টের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা ক্রমাগতই বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে ; এবার বল।)

এবার কিছুক্ষণ গল্প

প্রাণীদের বিভিন্ন ধরনের শ্বাসকার্য আর তাদের শ্বাসঅঙ্গগুলোর বিবরণ যদি মুখস্থ করতে যাও, তাহলে দেখবে কয়েকদিন পরই আবার সব ভুলে গেছ। তাই, সেগুলো পড়ার আগে কয়েকটা কথা বলে নিই, যাতে তুমি নিজেই যুক্তি দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা মনে রাখতে পার। তার আগে জানিয়ে রাখি, এই অংশটা হঠাৎ পড়তে গেলে কঠিন লাগে, কিন্তু এই গল্পটুকুর পর একটুও কঠিন লাগবে না ; তাছাড়া এখান থেকে অজস্র বস্তুমুখী (objective) প্রশ্ন হতে পারে, যেগুলো উত্তর দিয়ে নম্বর তোলা খুবই সহজ। এখান থেকে বিশেষ বড় প্রশ্ন আসে না। শুধু আসে, 'অমুক প্রাণী কীভাবে শ্বাসকার্য করে'—এই ধরনের এক কথার প্রশ্ন।

সমস্যাটা কী, আর তার সমাধানটাই বা কেমন ? জীবদেহের প্রতিটি জীবিত কোষেই প্রতি মুহূর্তে শ্বসন চলে। সেই শ্বসন চালাতে প্রয়োজন অক্সিজেন। আবার, শ্বসনের ফলে উৎপন্ন হয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড, তাকেও দেহ থেকে বার করে না দিতে পারলে তার বিষক্রিয়ায় কোষের মৃত্যু ঘটে। তাই যে কোন জীবদেহেই, (সে এককোষী আর বহুকোষী, যাই হোক না কেন), এমন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যে প্রত্যেকটি কোষ যেন সহজেই অক্সিজেন পায় ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করতে পারে। এই ব্যবস্থা কীভাবে করা যায়, সেটাই হল আসল **সমস্যা**।

এবার আমরা দেখি, এই সমস্যার **সমাধান** করতে কতরকম ব্যবস্থার কথা ভাবা যেতে পারে। (আমরা প্রাণীদেহের শ্বাসকার্যের কথা আলোচনা করছি বলে এখন 'জীবদেহ' না বলে 'প্রাণীদেহ' বলব।)

ক. যারা এককোষী প্রাণী তাদের তেমন সমস্যা নেই ; কারণ দেহের ভিতর

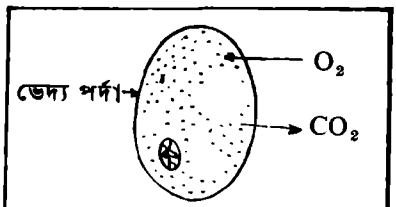

সরাসরি ব্যাপনের সাহায্যে শ্বাসকার্য

কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেশি হলে তা **ব্যাপন প্রক্রিয়ায়** কোষের বাইরে বেরিয়ে পরিবেশে (বাতাসে বা জলে) মিশে যেতে পারে, আর অক্সিজেনের অভাব ঘটলে পরিবেশ থেকে অক্সিজেন সরাসরি ব্যাপন প্রক্রিয়ায় একইভাবে কোষে ঢুকতে পারে। তবে এসবের জন্য **কোষ-প্রাচীরটি ভেদ্য হওয়া চাই।**

কিন্তু বহুকোষী প্রাণীর বেলায় এই ব্যবস্থা যথেষ্ট না হতে পারে। খুব ছোট ছোট বহুকোষী প্রাণীদের বাদ দিলে, বাকিদের দেহের খুব কম সংখ্যক কোষই থাকে দেহের বাইরের স্তরে, অর্থাৎ, পরিবেশের সংস্পর্শে। সুতরাং পরিবেশ থেকে সরাসরি ব্যাপন হয়ে বাইরের দিকের কোষগুলোর প্রয়োজন মিটলেও, আরেকটু ভিতরের দিকে যে কোষগুলো আছে, তাদের বেলায় অন্য ব্যবস্থা দরকার হবে। সোজা কথায়, এমন কিছু করতে হবে,

যাতে বাইরের থেকে অক্সিজেন প্রতিটি কোষের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে, আর সেই কোষগুলোর থেকে বেরিয়ে আসা কার্বন-ডাই-অক্সাইড একই পথ ধরে পরিবেশে ফিরে আসতে পারে। সেটা কী কী ভাবে করা যায়, দেখা যাক।

খ. একটা উপায় হতে পারে, বহুকোষী প্রাণীর দেহে যদি **কয়েকটি নালী বা পাইপের** ব্যবস্থা করা যায়, যা দিয়ে

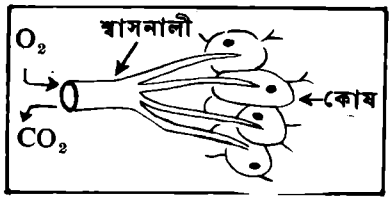

শ্বাসনালীর সাহায্যে শ্বাসকার্য

বাতাস যাওয়া-আসা করতে পারে। শরীরের বাইরের দিকের নালীগুলো হবে মোটা মোটা, আর যত ভিতরের দিকে যাওয়া যাবে, ততই তারা বারে বারে বিভক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত অসংখ্য সরু সরু নালীরূপে সমস্ত কোষের কাছে পৌঁছে যাবে। কিন্তু, এই ব্যবস্থায় মুস্কিলটা এই যে, কোষের চাহিদা ঠিকমত মেটাতে গেলে এক্ষেত্রে ঐ নালীগুলোর মধ্য দিয়ে যথেষ্ট বেশি পরিমাণে বাতাস যাওয়া আসা করা প্রয়োজন। (না হলে নতুন করে অক্সিজেন পাওয়া যাবে কী করে?) তাই, বাতাস ঘনঘন চলাচলের একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে, যেটা করা প্রকৃতপক্ষে মুস্কিল।

গ. এই মুস্কিল আসান করা যায় একভাবে। ঐ নালীগুলো যদি একেবারে ফাঁকা না হয়ে কোনও তরল পদার্থ (যেমন, রক্ত) দিয়ে ভর্তি থাকে, তাহলে একটা সুবিধা হয়। ঐ তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয়ে অক্সিজেন পৌঁছে যাবে কোষে, আবার কোষ থেকে বেরিয়ে আসা কার্বন-ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত হয়ে ফিরে আসবে দেহের বাইরের দিকে। এই ব্যবস্থার **সুবিধে হচ্ছে, ঐ** নালীগুলোর কোথাও একটা **পাম্প** (হৃৎপিণ্ড) বসিয়ে দিলে সেই তরল পদার্থটিকে সহজেই ঐ নালীগুলোর মধ্য দিয়ে বারে বারে পরিচালিত করা যাবে। তার ফলে ঐ তরল পদার্থটি দ্রুত অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যেতে পারবে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা সম্ভব করতে দুটি জিনিসের প্রয়োজন। ১. এর আগে যে

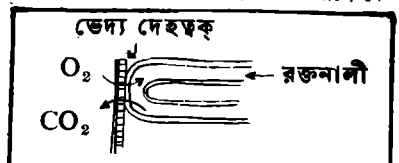

ভেদ্য দেহত্বক ও রক্তনালীর সাহায্যে শ্বাসকার্য

ফাঁকা নালীর কথা বলেছি, সেখানে বাতাস সরাসরি ঢুকতে বা বেরোতে পারে; কিন্তু তরলপূর্ণ নালীতে সে ব্যবস্থা সম্ভব নয়। তাহলে বাতাস ঢোকার সময় তরল পদার্থটি দেহের বাইরে বেরিয়ে যাবে। তাই, এই ক্ষেত্রে ঐ তরলের সঙ্গে গ্যাসের আদান-প্রদান ঘটতে হবে ব্যাপন প্রক্রিয়ায়। ২. তরল পদার্থের মাধ্যমে যদি অক্সিজেন বা কার্বন-ডাই-অক্সাইড বহন করতে হয়, তবে ঐ তরলের মধ্যে এমন কোন পদার্থ থাকা প্রয়োজন যা বেশি মাত্রায় গ্যাস পরিবহণের ক্ষমতা রাখে। কারণ, এমনিতে তরলে দ্রবীভূত অক্সিজেন বা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এতই সামান্য যে তা শ্বাসকার্যের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাহলে, কোনও **বিশেষ তরল পদার্থের সাহায্যে ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নালীপথে** গ্যাসের সংবহন সম্ভব।

ঘ. এখন পর্যন্ত আমরা যে উপায়গুলোর কথা ভাবলাম, তার চেয়েও সুষ্ঠু আরেকটা ব্যবস্থা করা সম্ভব। সেটা করা যায় (খ) আর (গ)-কে মিলিয়ে। তার

ফলে গ্যাসের পরিবহণ আরও অনেক দ্রুত করা সম্ভব, যেটা যে কোনও অপেক্ষাকৃত জটিল দেহবিশিষ্ট প্রাণীর শ্বাসকার্যের জন্য জরুরী। ব্যাপারটা কেমন করা যেতে পারে দেখ। ধর, (খ) এর মতন একটি নালী দিয়ে বাতাস এসে একটা হাপরের মত থলিতে প্রবেশ করল। সেই থলিটা (যেমন, ফুসফুস) এমন যে, ক্রমাগত সঙ্কুচিত প্রসারিত হয়ে ঘনঘন বাতাসের আদান-প্রদান ঘটাতে পারে। এখন (গ) এর মত যদি আর একদল তরলপূর্ণ নালী থাকে, যারা একদিকে ঐ বায়ুপূর্ণ থলির সঙ্গে এবং অন্যদিকে অসংখ্য কোষের সঙ্গে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসের আদান-প্রদান চালাতে থাকবে, তাহলেই ব্যবস্থা মোটামুটি নিখুঁত হয়। নিখুঁত বলছি কেন, দেখ।

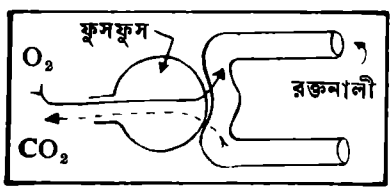

ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য

১. হাপরের মত ফুসফুসের মাধ্যমে দ্রুত বাতাস যাওয়া আসা করতে পারবে। ২. হৃৎপিণ্ডের সাহায্যে রক্তনালীর মধ্য দিয়ে রক্ত বারেবারে দ্রুত সংবাহিত হয়ে কোষে ও ফুসফুসে গ্যাসের আদান-প্রদান ঘটাবে। ৩. প্রাণীর সমগ্র ত্বক বা দেহের আবরণটি দিয়ে শ্বাসকার্য করার অসুবিধা দূর হবে। এতক্ষণ যে ব্যবস্থাটির বিবরণ দিলাম, এটিই মানুষ ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রাণীর শ্বাসকার্যের পদ্ধতি।

এবার সংক্ষেপে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর বিভিন্ন রকম শ্বাসকার্যের কথা পড়ার মত করে পড়ব। প্রত্যেকটি বিবরণের সঙ্গে আমাদের এতক্ষণ বলা ব্যবস্থাগুলোর একটা না একটার মিল থাকবেই। সেটা খেয়াল করবে। মনে রেখ, এতক্ষণ যেটাকে 'গল্প' বলেছি, সেটা কিন্তু মোটেই গল্প নয়।

আবার পড়া শুরু ঃ শ্বাস-কার্যের বিভিন্ন পদ্ধতি ও শ্বাস অঙ্গের বিবরণ

প্রাণীরা শ্বাসকার্য করে থাকে পাঁচ ভাবে। সেগুলো একে একে দেখে নাও।

১. সরাসরি ব্যাপনের সাহায্যে (Simple duffusion) ঃ এটির কথা **'সমাধান (ক)'**-তে বলেছি **এইভাবে শ্বাসকার্য করে আদ্য প্রাণী, ছিদ্রাল প্রাণী, একনালীদেহী প্রাণী, চ্যাপ্টা কৃমি ও গোলকৃমি।**

১. আদ্য প্রাণীর একটি মাত্র কোষে গঠিত দেহের কোষ প্রাচীরটি ভেদ্য। তার মধ্য দিয়েই শ্বাসকার্য চলে।

২. বাকি যে বহুকোষী প্রাণীগুলোর কথা বললাম, তাদের গঠন খুবই সরল, আকারও ক্ষুদ্র। তাই তাদের দেহের

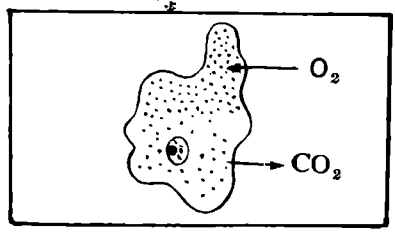

অ্যামিবা সরাসরি ব্যাপনের সাহায্যে শ্বাসকার্য করে।

বাইরের দিকে কোষগুলো প্রথমে ব্যাপনের সাহায্যে গ্যাসের আদানপ্রদান করে। এরপর, তাদের সঙ্গে অন্যান্য কোষগুলোর গ্যাসের প্রয়োজনীয় দেওয়া নেওয়া ঘটে। এইভাবে এদের শ্বাসকার্য সংঘটিত হয়।

এই সকল প্রাণীদের কিছু স্থলবাসী,

কিছু জলবাসী, আবার কিছু থাকে অন্য প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে পরজীবী হয়ে। জলে বা অন্য প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে তরলে ডুবে থাকা প্রাণী জলে বা তরলে দ্রবীভূত গ্যাস দেওয়া নেওয়া করে।

২. **শ্বাসনালীর সাহায্যে (Trachea) ঃ** এটি হল **'সমাধান (খ)'**। **সন্ধিপদ প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত সকল কীটপতঙ্গ (যেমন মশা, মাছি, আরশোলা), আর কেন্নো প্রভৃতি অপর কিছু সন্ধিপদ প্রাণীর দেহে এই ব্যবস্থা দেখা যায়।** এদের শরীরে বড় বড় **শ্বাসনালী** (Trachea) শুরু হয় দেহের পরিধিতে, সেখান থেকে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে **ক্ষুদ্র শ্বাসনালীগুলো** (Tracheole) কোষের কাছাকাছি ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রে এই

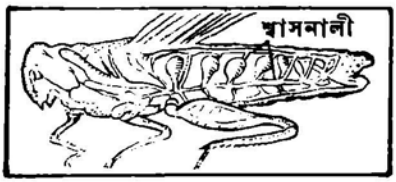

পতঙ্গের শ্বাসকার্যের জন্য আছে শ্বাসনালীর ব্যবস্থা

শ্বাসনালীগুলোর একেবারে শেষ প্রান্তে থাকে এক ধরনের তরল পদার্থ। এরফলে কোষের সঙ্গে গ্যাসের আদান প্রদানে সুবিধা হয়। এই প্রাণীগুলোর চলাফেরার সময় বক্ষ ও উদরের খণ্ডকগুলোর নড়াচড়া করে। তাতে ঐ শ্বাসনালীগুলোর মধ্য দিয়ে বায়ু যাতায়াতের সুবিধা হয়। সেই সঙ্গে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় শ্বাসনালীগুলো শুরু হওয়ার মুখে এক ধরনের দরজা থাকে, তার নাম **স্পাইরাকল** (spiracle)। এগুলোর সাহায্যে ইচ্ছামত বায়ু চলাচল বন্ধ করা যায়। শ্বাসনালীর থেকে মোটামুটি দ্রুত দেহের অভ্যন্তরে অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড আদান প্রদান ঘটার ফলে, এবং এই জাতীয় প্রাণীগুলোর আকার ছোটখাটো হওয়ার ফলে শ্বাসনালীর সাহায্যেই এদের শ্বাস-কার্যের প্রয়োজন মেটে।

৩. **দেহত্বকে ব্যাপনের পর রক্তের মাধ্যমে (Diffusion through body wall to blood) ঃ 'সমাধান (গ)'**-তে এটির কথাই বলেছি। অঙ্গুরী-মাল প্রাণীরা, (যেমন, কেঁচো), এই পদ্ধতিতে শ্বাসকার্য চালায়। এদের দেহে রক্ত থাকে। সেই রক্তে থাকে **হিমোগ্লোবিন** (Hœmoglobin), যা বিশেষভাবে অক্সিজেন বহন করতে সক্ষম। রক্তবাহিত হয় রক্তনালীর মধ্য দিয়ে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তনালী এদের ত্বকের নিচে ছড়িয়ে থাকে। ত্বকের স্যাঁতসেঁতে আবরণের মধ্য দিয়ে

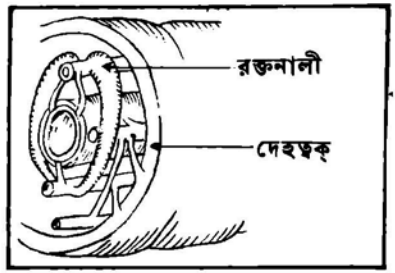

কেঁচোর দেহত্বকের মধ্য দিয়ে ব্যাপনের মাধ্যমে রক্তনালীর সঙ্গে গ্যাসের আদানপ্রদান ঘটে

ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসের দেওয়া নেওয়া ঘটে। ত্বক থেকে সরু রক্তনালীগুলো মিলিত হয়ে বড় রক্তনালী গঠন করে, আবার শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে কোষ সমূহের ফাঁকে ফাঁকে। ব্যাঙও শীতঘুমের সময় এই চর্ম শ্বাসকার্যের মাধ্যমেই নিজের প্রয়োজন মেটায়। সাধারণ অবস্থাতেও ব্যাঙ এই প্রক্রিয়ায় মুখবিবরের ভিতরের দেওয়াল আর দেহের চর্মের দ্বারা

কিছু পরিমাণ শ্বাসকার্য চালায়।

৪. ফুলকার দ্বারা ব্যাপনের পর রক্তের মাধ্যমে (Diffusion through gills to blood) ঃ এটিকে সংক্ষেপে **'ফুলকার দ্বারা'** বলতে পার। (৩) এর ক্ষেত্রে সমস্ত দেহ ত্বকটিই ব্যাপনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ফুলকা নামে একটি বিশেষ অঙ্গতেই শুধু ব্যাপন ঘটে। সেই ব্যাপনের ফলে সংগৃহীত অক্সিজেন রক্তের মাধ্যমে দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এটিও **'সমাধান (গ)'**-এর মধ্যে পড়ে। ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য করে এমন প্রাণীদের মধ্যে আছে **জলজ সন্ধিপদ প্রাণীরা (যেমন, চিংড়ি), জলজ কিছু কাম্বোজ প্রাণী (যেমন, জলজ শামুক),** আর সবাই যে উদাহরণটা জান, অর্থাৎ **মৎস্য শ্রেণী।** ব্যাঙাচি অবস্থায় ব্যাঙও ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। ফুলকার গঠন অনেকটা চিরুনির মতন। একটি লম্বা দণ্ড বা অক্ষের ওপর সরু সরু **ফুলকাসূত্র** থাকে। সব মিলিয়ে অনেকগুলো ভাঁজ করা পাতের মত হয়। ফুলকার বিবরণ জটিল, তোমাদের জানার প্রয়োজন নেই। জানতে হবে যেটুকু, সেটা হল—ফুলকাতে খুব বেশি রক্তজালক (অর্থাৎ সূক্ষ্ম রক্তনালী) থাকে। আর ফুলকা নিজে ভাঁজ করা পাতের মত হয় বলে অনেকটা স্থান জুড়ে জলের সংস্পর্শে আসতে পারে, ফলে, ফুলকার ওপর দিয়ে যখন জল বয়ে যায়, তখন গ্যাসের আদান-প্রদান ঘটে। এখানে বলে রাখি, জলের মধ্যে মাছকে নিশ্চয়ই ক্রমাগত মুখ খুলতে আর বন্ধ করতে দেখেছ। তার কারণ, মাছ হাঁ করে কিছুটা জল মুখের মধ্যে নেয়; তারপরই মুখ বন্ধ করে, তখন সেই জল মুখগহ্বর ও গলবিলের (Pharynx) দেওয়ালে অবস্থিত কয়েকটি ছিদ্র দিয়ে কানকোর নিচ দিয়ে বেরিয়ে আবার বাইরের জলে মিশে যায়। কিন্তু গলবিলের দেওয়ালের বাইরে কানকোর ঠিক নিচেই থাকে ফুলকা। সেই ফুলকার সঙ্গে জলের সংস্পর্শ ঘটার ফাঁকে মাছ তার শ্বাসকার্য সমাধা করে।

আর একটা কথা। মাছের রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে বলে মাছের রক্তের রং লাল, ফুলকার রংও লাল। কিন্তু চিংড়ির রক্তে হিমোগ্লোবিন থাকে না, থাকে হিমোসায়ানিন (Hœmocyanin); এইজন্য চিংড়ির রক্ত বর্ণহীন, সেই সঙ্গে তার ফুলকাও।

৫. ফুসফুসের সাহায্যে (Through Lungs) ঃ এটির কথা বেশ বিস্তৃতভাবেই **'সমাধান-(ঘ)'**-তে বলেছি। ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় **মৎস্য বাদে সকল শ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণী,** এমনকি **জলবাসী সরীসৃপরাও (যেমন, কুমির)।** তাছাড়া অমেরুদণ্ডী হলেও **স্থলজ শামুক (কাম্বোজ পর্ব)** এই প্রক্রিয়ায় শ্বাসকার্য করে।

খুব সংক্ষেপে ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্যের কথা বলছি। 'মানুষের শ্বাসকার্য'

মাছের শ্বাসযন্ত্র ফুলকা

পড়তে গিয়ে এ ব্যাপারে আরেকটু জানবে। ফুসফুস একটি স্পঞ্জের মত অঙ্গ। এর মধ্যে থাকে অসংখ্য বায়পূর্ণ থলি, যাদের নাম অ্যালভিওলাই (alveoli)। একবচন অ্যালভিওলাস (alveolus)। শ্বাস-নালীর মাধ্যমে ফুসফুসের ভিতরে বায়ু যাওয়া আসা করে। অ্যালভিওলাসের গায়ে থাকে অসংখ্য রক্তজালক, যারা ব্যাপনের মাধ্যমে অ্যালভিওলাসগুলিতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রদান করে, আর গ্রহণ করে অক্সিজেন। প্রত্যেক প্রাণীরই কোনও না কোনও উপায়ে ফুসফুস সঙ্কোচন প্রসারণ করার ব্যবস্থা থাকে। তার ফলে শ্বাসকার্য দ্রুত সম্পন্ন হতে পারে।

শ্বাসকার্য, বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসন—এতক্ষণ পাঁচ রকমের শ্বাসকার্যের পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা পড়লাম। এবার এই তিনটি কথার অর্থ স্পষ্ট করে দিই। শ্বাসকার্য (breathing) মানে কী, তুমি জান। বহিঃশ্বসন (external respiration) মানেও তাই। অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে দেহের শ্বাস-অঙ্গ গ্যাসের যে আদান-প্রদান ঘটায়, তাকেই বলে বহিঃশ্বসন। আর দেহকোষের ভিতরে অক্সিজেন প্রবেশ করা আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে আসা—একে বলে অন্তঃশ্বসন (internal respiration)। অর্থাৎ, একমাত্র 'সরাসরি ব্যাপন প্রক্রিয়া' বাদে বাকি সব ধরনের শ্বাসকার্যের ক্ষেত্রেই একদিকে শ্বাসকার্য বা বহিঃশ্বসন ঘটে, অন্যদিকে ঘটতে থাকে অন্তঃশ্বসন। খেয়াল রেখ, 'বহিঃশ্বসন' আর 'অন্তঃশ্বসন'—এ দুটি শব্দের শেষে 'শ্বসন' কথাটা থাকলেও এ দুটি শ্বসনের সমার্থক নয়। বিজ্ঞানের ভাষায় মাঝে মাঝে এ ধরনের গোলমাল থাকে।

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর মনের মধ্যে গেঁথে রাখ ঃ

১. ব্যাপন প্রক্রিয়ার জন্য কোষ-প্রাচীর কেমন হওয়া চাই ?

২. প্রাণীদের পাঁচরকম শ্বাসকার্যের পদ্ধতি আছে। তাদের প্রত্যেকটির নাম বল।

৩. সরাসরি ব্যাপনের সাহায্যে কোন্ কোন্ প্রাণী শ্বাসকার্য করে ?

৪. ফুলকার সাহায্যে কোন্ ধরনের প্রাণীরা শ্বাসকার্য করে ?

৫. একটি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর নাম বল, যে ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।

৬. ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য অন্য চার ধরনের শ্বাসকার্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এর কারণ কী ?

৭. অ্যালভিওলাই কোথায় থাকে ?

৮. শ্বসন, অন্তঃশ্বসন আর বহিঃশ্বসনের পার্থক্য কী ?

৯. 'সরাসরি ব্যাপনের' ক্ষেত্রে বহিঃশ্বসনও যা, অন্তঃশ্বসনও তাই। কেন ?

১০. নিচের প্রাণীগুলোর কোন্‌টি কোন্ প্রক্রিয়ায় শ্বাসকার্য করে বল। সেইসঙ্গে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট শ্বাস-অঙ্গ থাকলে তারও নাম বল ঃ

অ্যামিবা, স্পঞ্জ, হাইড্রা, যকৃৎ-কৃমি, অ্যাসকারিস, কেঁচো, জোঁক, আরশোলা, ফড়িং, চিংড়ি, স্থল-শামুক, জলশামুক, রুই মাছ, জিয়ল মাছ, কুমির, ব্যাঙ, পাখি, গিনিপিগ, মানুষ।

১০ নম্বর প্রশ্নের একটু কঠিন উত্তরগুলো বলে দিই।

১. জিয়ল মাছ—জিয়ল মাছ (যেমন—শিঙি, মাগুর, কৈ) ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য করে। ফুলকার মাধ্যমে তারা জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন

গ্রহণ করে। কিন্তু এই সঙ্গে তাদের **অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র** (accessory respiratory organ) থাকে, যার সাহায্যে তারা বায়ু থেকেও অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। এই কারণেই জল থেকে ডাঙায় তুললেও তারা কিছুক্ষণ বেঁচে থাকে, এইজন্য তাদের জিয়ল মাছ বলে। তবে, এদের ক্ষেত্রে কোনও একটি ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। তাই জলের মধ্যে থাকার সময়েও এরা মাঝে মাঝে ভেসে উঠে বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। এদের জোর করে ডাঙায় তুলে রাখলে, বা শুধু জলে ডুবিয়ে রাখলে, এরা বাঁচে না।

২. ব্যাঙ—পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ তিনরকম শ্বাসকার্য করে। ক. ফুসফুসের সাহায্যে খ. চর্মের সাহায্যে গ. মুখবিবরের সাহায্যে।

শেষ দুই ধরনের শ্বাসকার্য 'দেহত্বকে ব্যাপনের পর রক্তের মাধ্যমে শ্বাসকার্যের' উদাহরণ। অপূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ, অর্থাৎ ব্যাঙাচি, শ্বাসকার্য করে ফুলকার সাহায্যে।

মানুষের শ্বাসকার্য

"ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য"তে এতক্ষণ যা পড়েছ, তাই আরেকটু সাজিয়ে গুছিয়ে বললেই মানুষের শ্বাসকার্য সম্পর্কে তোমার মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা হয়ে যাবে। এর কোনও বিবরণ তোমাদের সিলেবাসে আলাদা করে পড়ার কথা নয়, তাই খুব সংক্ষেপে বলছি। মানুষের **মুখছিদ্র** আর **নাসারন্ধ্র** এই দুইপথে বায়ু দেহে প্রবেশ করে। সেই বায়ু এরপর শ্বাসনালী (trachea) দিয়ে চলে আসে ফুসফুসে। এই আসার পথে শ্বাসনালী প্রথমে বিভক্ত হয় দুটি ক্লোমনালীতে (bronchus)। দুটি ক্লোমনালী অসংখ্যবার বিভক্ত হতে হতে খুব সরু সরু শাখাক্লোমনালীতে (bronchiole) পরিণত হয়। একেকটি শাখাক্লোমনালীর একেবারে শেষপ্রান্ত ফুলে ফুলে উঠে কয়েকটি বায়ুথলি বা অ্যালভিওলাস তৈরি করে। এই অ্যালভিওলাসগুলির প্রাচীর খুব পাতলা, আর তাদের বেষ্টন করে থাকে অসংখ্য রক্ত জালক। এক একটি ফুসফুসে থাকে এমন ৩০ কোটি অ্যালিভিওলাস। সেইজন্যই ফুসফুস স্পঞ্জের মত।

এবার সমগ্র শ্বাসকার্যটি কীভাবে ঘটে দেখ। মানুষের দেহে উদর (পেট) আর বক্ষ (বুক)—এদুটি আসলে দুটি গহ্বর বা ফাঁকা জায়গা। সেগুলি নানান জিনিসে পূর্ণ থাকে। আর এই গহ্বর দুটিকে পরস্পরের থেকে আলাদা করে রাখে **মধ্যচ্ছদা** (diaphragm) নামে একটি পর্দা। মানুষ ইচ্ছা করলেই এই পর্দাকে ওঠাতে বা নামাতে পারে। প্রশ্বাস নেওয়ার সময় মানুষ বক্ষের পেশীগুলোকে সঙ্কুচিত করে বুককে ফুলিয়ে তোলে, আর সেইসঙ্গে মধ্যচ্ছদাকে নিচের দিকে নামিয়ে দেয়।

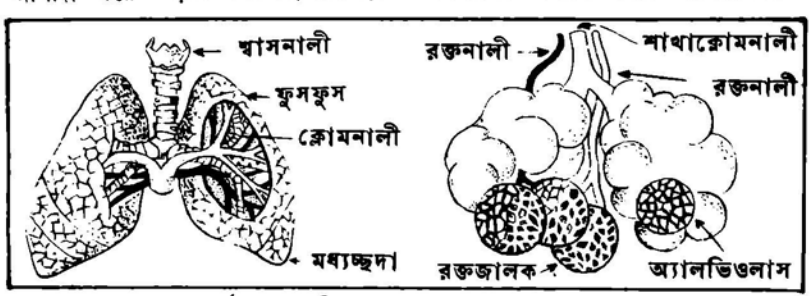

মানুষের ফুসফুসের বাইরের ও ভিতরের ছবি।লেখা বিবরণের সঙ্গে মিলিয়েনাও

তার ফলে ফুসফুস দুটিও ফুলে উঠতে চায়, সেইসঙ্গে বাইরের থেকে বাতাস ফুসফুসে ঢোকে। এর উল্টো পদ্ধতিতে নিঃশ্বাসের সময় ফুসফুসকে সংকুচিত করলে বাতাস বাইরে বেরিয়ে যায়। এরকম ঘটতে থাকে মিনিটে 16-20 বার। কিন্তু ইতোমধ্যে হৃৎপিণ্ড সমস্ত শরীর থেকে সংগ্রহ করা রক্তকে পাঠিয়ে দেয় ফুসফুসে। এই রক্ত সারা শরীরের থেকে সংগ্রহ করা কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যাপন প্রক্রিয়ায় দিয়ে দেয় অ্যালভিওলাসকে আর সেখান থেকে সংগ্রহ করে অক্সিজেন। সেই অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত ফিরে যায় হৃৎপিণ্ডে, তারপর ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে।

দুয়েকটা ভুল ধারণা পাছে থেকে যায়, তাই সেগুলোর কথা বলে আজকের পড়া শেষ করছি।

১. মানুষ শ্বাসকার্যের সময় **নাক দিয়ে** অক্সিজেন নেয় আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে, একথা ঠিক নয়। মানুষ নাক দিয়ে বাতাসই নেয়, বাতাসই ত্যাগ করে। কিন্তু নেওয়ার সময় থাকে প্রায় 20% অক্সিজেন, ছাড়ার সময় প্রায় 16%। তেমনি, নেওয়ার সময় কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে 0·03% মতন, ছাড়ার সময় সেটা প্রায় 4% বেড়ে যায়। বাতাসের বাকিটা নাইট্রোজেন গ্যাস। সে সাতেও নেই পাঁচেও নেই, শুধু যায় আর আসে।

২. আমরা কিন্তু কখনোই **শুধু** নাক দিয়ে শোঁ শোঁ করে বাতাস টেনে নিতে পারি না। আমাদের অলক্ষ্যেই বুকের পেশী বুককে ফুলিয়ে তোলে, মধ্যচ্ছদা নিচে নেমে যায়—তার ফলেই নাক দিয়ে বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে। এ ব্যাপারে নাকের নিজের কোনও ক্ষমতা নেই।

আর একটা কথা। আমাদের শ্বাসনালী (trachea) শুরু হওয়ার মুখেই থাকে দুটি পাশাপাশি পর্দা, এদের নাম স্বরযন্ত্র বা vocal cord। বায়ুর যাওয়া আসা ঘাট এই পর্দা দুটির মাঝখানের রাস্তাটুকু দিয়ে। সেইসময় এই স্বরযন্ত্রকে কম্পিত করে আমরা গলা থেকে আওয়াজ বার করতে পারি, কথা বলতে পারি।

'সালোকসংশ্লেষ ও শ্বসনের তাৎপর্য' অধ্যায় আমরা শেষ করলাম। এর পরের দিন শুরু হবে **'পুষ্টি, বিপাক ও পরিপাক।'**

সব শেষে বলে রাখি—প্রথম পাঁচটি পাঠে আমরা যেটুকু পড়লাম, সে ব্যাপারে তোমাদের কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে তার উত্তর খোঁজার জন্য সবচেয়ে ভাল বই হল উদ্ভিদবিদ্যায় 'Classbook of Botany'—by A. C. Dutta, আর প্রাণীবিদ্যায় 'General Zoology'—by Storer & Usinger তাছাড়া তোমাদের বিশেষ কোনও প্রশ্ন থাকলে লিখে জানাতে পার। আর খেয়াল রেখ, তোমাদের প্রায় সব প্রশ্নই হয় খুব ছোট ছোট। তাই পাঠ্য অংশের প্রতিটি লাইন থেকেই প্রশ্ন আসতে পারে। সুতরাং বিভিন্ন বইয়ে অজস্র প্রশ্ন খুঁজে না বেড়িয়ে নিজের পড়াটুকু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়াটাই বেশি দরকার। সেই সঙ্গে টেস্টপেপার দেখার অভ্যাস রাখাই যথেষ্ট।

দেবাশিস বিশ্বাস

কর্মশিক্ষা

ফাদার এব্রাহামের সঙ্গে প্রথম আলাপ দার্জিলিঙের সেণ্ট রবার্টস স্কুলে। দার্জিলিং জেলার সমস্ত সেকেণ্ডারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তিনদিনের সেমিনারে যোগ দিয়ে নতুন পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে পঠন-পাঠনের সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করছেন। কর্মশিক্ষাকে সফল ক'রে তোলার উপায় সম্পর্কেও চিন্তা চলেছে। সেই আলোচনা-চক্রে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফাদার এব্রাহাম আমাদের অনুরোধ জানালেন, কলকাতা ফেরার পথে কার্সিয়াঙে অল্প সময়ের জন্যে থেমে তাঁর স্কুলটি একবার পরিদর্শন করে যেতে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্তৃপক্ষ রাজি হলেন। আমরাও সকাল দশটা নাগাদ উপস্থিত হলাম সেণ্ট অ্যালফন্সোস স্কুলে।

রাস্তার পাশেই উঁচু টিলা। তার ওপর প্রকাণ্ড স্কুল বাড়ি গড়ে উঠেছে। প্রথমেই সমবেত প্রার্থনা। বাইবেল, গীতা এবং কোরান থেকে অমৃতবাণী পাঠ করলেন ফাদার এব্রাহাম। তারপর ক্লাস বসে গেল। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম সমস্ত স্কুলবাড়িটা। ওয়ার্ক এডুকেশন চালু হয়েছে ১৯৭৪ সালে কিন্তু সেণ্ট অ্যালফন্সোস স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা কর্মশিক্ষার সঙ্গে পরিচিত তারও বহু বছর আগে থেকে। স্কুলের প্রধান ওয়ার্ক প্রজেক্ট হচ্ছে পোলট্রি--হাঁস মুরগি পালন। মুরগির পরিচর্যা, খাঁচা পরিষ্কার রাখা, ডিম সংগ্রহ করে জমা করা, হিসেব রাখা—যাবতীয় কাজ ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় করে চলেছে ছাত্রেরা—যার যেমন দায়িত্ব। সপ্তাহে দু'দিন করে ছাত্রদের দল অটোরিক্সায় ডিম বোঝাই করে চলে যায় দার্জিলিং শহরে—বড় বড় সব হোটেলের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা আছে, সে-ডিম তারা কিনে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দাম মিটিয়ে দেয় সে-দাম ছেলেরা ফিরে এসে স্কুলে জমা দেয়। লাভের পরিমাণ বেশ মোটা রকম থাকে। তা ছাড়া স্কুলের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে পোলট্রি করছে, শিখছে—এর পিছনে যে সেণ্টিমেণ্টাল ব্যাপারটা আছে তাও প্রভাবিত করেছে হোটেলের মালিকদের। কাজের পিছনে আর্থিক লাভের ব্যাপারটা একেবারে উপেক্ষণীয় নয় বলেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা ব্যবসায়িক মনোভাব এবং অভিজ্ঞতাও গড়ে উঠেছে স্বাভাবিক ভাবেই।

স্কুলের পোলট্রি বিভাগের ডিম দিয়ে তৈরি পোচ, অমলেট আর চপ দিয়ে আপ্যায়ন করে ফাদার এব্রাহাম আমাদের জানালেন, বারান্দায় ওই দেখুন বিরাট বোর্ডে লেখা রয়েছে পোলট্রি সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য, মুরগি পালনের নিয়মাবলী, কোন্ সপ্তাহে কত ডিম পাওয়া গেছে, কত টাকার ডিম বিক্রয় হয়েছে, কত টাকা লাভ হয়েছে—সব কিছু। আমাদের বিস্মিত মুগ্ধ দৃষ্টিকে হতচকিত করে ফাদার এরপর জানালেন স্কুলবাড়িটার ইতিহাস। ছোট্ট, সাধারণ ছিল বাড়িটা—গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়ত। ফাদার বহু চেষ্টায় বিদেশী ধর্মসংস্থা থেকে কয়েক লক্ষ টাকা অনুদান জোগাড় করেছিলেন বড় করে বিল্ডিং তৈরি করার জন্যে। উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের আহ্বান জানিয়েছিলেন, রাজমিস্ত্রি আর শ্রমিকদের সঙ্গে তারাও

একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিক। নিচের রাস্তার লরি থেকে পাথর, বালি, সিমেন্ট, লোহালক্কড় উঁচু টিলার ওপর পিঠে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল এই সব ছেলেরা। ফাদার বললেন, ষোল লক্ষ টাকা মোট খরচ পড়েছে বাড়িটি তৈরি করতে—ছাত্ররা স্বেচ্ছায় শ্রমদান করে দু'লাখ টাকা খরচ বাঁচিয়ে দিয়েছে।

সেণ্ট অ্যালফনসোস স্কুলের সুদৃশ্য অডিটোরিয়ামে বসে নেপালী-খ্রিস্টান ছেলেমেয়েদের রামায়ণ-নৃত্যনাট্য দেখতে দেখতে সেদিন আমরা অভিভূত হয়েছিলাম। গান্ধিজীর সাধের শ্রমদানের আদর্শকে বাস্তবে মূর্ত করে তুলেছে কার্সিয়াঙের এই পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা। মনকে ডেকে বলছিলাম ঃ 'কর্মশিক্ষা যদি কোথাও থাকে তাহা এইখানে—তাহা এইখানে—তাহা এইখানে।' বক্তৃতায় নয়—ফাদার এব্রাহাম কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, কর্মশিক্ষার তিন উপাদান, তিন শর্ত আর তিন পদ্ধতির কথা যা যা বলা হয়, তার পিছনকার মূল কথা একটাই—শিক্ষাকে জীবনমুখী করতে হবে। কেতাবি বিদ্যা শিখে, আর যা-ই হোক, মানুষ হওয়া যায় না—এ কথা বিশ্বের সমস্ত দেশ স্বীকার করেছে। নতুন সৃষ্টির আনন্দে ভরপুর হয়ে আছে ছেলেমেয়েরা—তার জন্যে সুযোগ করে দিতে হবে না? কর্মশিক্ষা এই সুযোগ তৈরি করে দেবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছে।

'নতুন সৃষ্টি' মানেই পুনর্গঠন। যা ছিল তাকে নিজের পছন্দ মতন নতুনভাবে গড়ে নেওয়া। 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তাহারে করেছি রচনা'। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে ঘরে এবং বাইরে শ্রীমান অভীক যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছে তা তার মনের মণিকোঠায় জমা হয়ে আছে। অভিজ্ঞতাই শিক্ষা— বলেছেন কেউ কেউ। কিন্তু শুধু অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ই শিক্ষার শেষ কথা নয়। 'অভিজ্ঞতা যখন পুনর্গঠিত হয় তখনই তাকে শিক্ষা বলা যাবে'— আমেরিকার জনৈক বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এ উক্তি করেছিলেন। আমাদের অভীক সেই বৃদ্ধ মৃৎ শিল্পীর চালাঘরে দাঁড়িয়ে মাটির কাজ দেখে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে বিদ্যালয়ে এল, তাকে বাস্তবে প্রয়োগের সুযোগ যদি স্কুলে পাওয়া যায় তাহলে অভীকের 'শিক্ষা' সম্পূর্ণ হবে—অর্থাৎ তার অভিজ্ঞতা নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে (সরস্বতী পূজার জন্য মাটির গেলাস তৈরিতে) পুনর্গঠিত হয়ে তার শিক্ষাকে সম্পূর্ণ এবং অর্থবহ করে তুলছে।

পুঁথিবদ্ধ শিক্ষা, বাঁধা-ধরা রুটিন আর পাঁচিলঘেরা স্কুল (রবীন্দ্রনাথ যাকে নাম দিয়েছেন 'হরিণ বাড়ি')—এর মধ্যেই আমরা শিক্ষক ও ছাত্ররা আমাদের সমস্ত শক্তি আর আয়োজনকে অভ্যস্ত করে ফেলেছি এবং সেজন্যেই ঐসব নতুন সৃষ্টি, নতুন অভিজ্ঞতার কথা উচ্চারিত হলেই 'লেখাপড়া রসাতলে গেল' বলে আমরা সমস্বরে হাঁ-হাঁ করে উঠি। অথচ শিক্ষাকে জীবনমুখী করতে হলে লেখাপড়াকে কাজের চৌকাঠের কাছাকাছি আনতেই হবে। তাকে সুয়োরাণী করে পালংকে বসিয়ে রাখলে চলবে না। এই কাজ আর লেখা-পড়ার মধ্যে সেতুবন্ধনের দৃঢ় স্তম্ভই কর্মশিক্ষা।

কর্মশিক্ষার সূচিতে যে সব উৎপাদন-মূলক প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সেগুলো হাতে-কলমে সম্পাদন করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে না। নতুন সৃষ্টির আনন্দ যেমন ঘটছে, সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের আত্মীয়তা গড়ে উঠছে,

তারা সমাজ-সচেতন হচ্ছে, বুঝতে শিখছে সমাজের বিভিন্ন বৃত্তির মানুষরা কিভাবে প্রতিনিয়ত দৈনন্দিন জীবনধারাকে সাবলীল ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে। এর ফলে সমাজের প্রতি, বিদ্যালয়ের প্রতি, অন্যান্য জনকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠানের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব, শরিকত্ব বোধ—sense of belongingness জাগ্রত হবে। সমাজের গঠনমূলক কাজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীর মনে একটা নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি হবে। মূল্যবোধের এই নয়া আবিষ্কার সমাজ-তান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্রের পুনর্গঠনকেও ত্বরান্বিত করবে। কর্মশিক্ষার সামাজিক তাৎপর্য এইখানেই।

কর্মশিক্ষার স্বরূপ বুঝতে হলে এই ছবিগুলো লক্ষ্য করতে হবে :

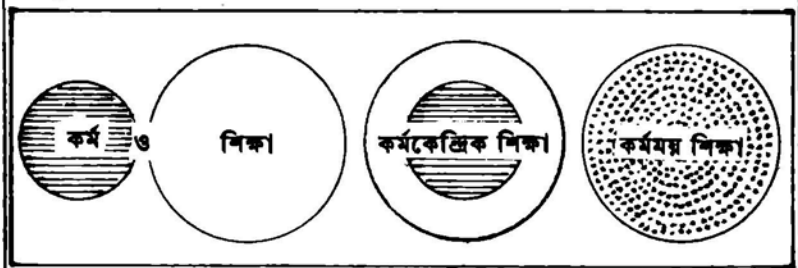

ছবিতে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে কর্ম ও শিক্ষা যখন বলছি তখন দুটি ব্যাপারই পৃথকভাবে ঘটছে—কাজ আর শিক্ষা যেন দুই আলাদা জগতের বাসিন্দা। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় একটি কাজকে কেন্দ্রে রেখে লেখাপড়ার সবকিছু ঘটছে অথচ লেখাপড়ার সবকিছুই যে উৎপাদনাত্মক কর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে, সেটা না-ও হতে পারে। কিন্তু কর্মময় শিক্ষার বেলায় যাবতীয় শিক্ষাকর্মই মুখ্যস্থান অধিকার করে, হাতের কাজ তার অনিবার্য উপলক্ষ। হাতে-কলমে কাজটি শিক্ষা-লাভকে আরও আকর্ষণীয়, আরও বাস্তব আরও জীবনমুখী করে তোলে—কর্ম এখানে শিক্ষার সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। এই কর্মময় শিক্ষাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'শিক্ষার স্বাংগীকরণ'।

পূর্বে যে বাঞ্ছিত মনোভাব গঠন, পটুত্ব অর্জন এবং জ্ঞানের বিকাশসাধন—এই তিনটি উপাদানের উল্লেখ করা হয়েছে, সে প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপন করে বলা যায় কর্মময় শিক্ষায় কোন একটি উৎপাদনাত্মক কাজে পটুত্ব বা দক্ষতা অর্জনটাই শেষ কথা নয়। ঐ হাতে-কলমে কাজের ভিত্তিতে প্রাসঙ্গিক জ্ঞানলাভ হবে এবং সে সম্পর্কে কাজের প্রতি অনুরাগ, সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, কর্মজীবীদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা এইসব বাঞ্ছিত মনোভাবের সৃষ্টি হবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে আবার সেই অতীতকে স্মরণ করা যাক। তাদের স্কুলে হাতে-কলমে কাজ নেওয়া হয়েছে—'টবে গাছ তৈরি'। এর সঙ্গে যদি 'মাটির কাজ' প্রকল্প গ্রহণ করে স্কুলেই টব তৈরি করা যায় তাহলে তো কথাই নেই। যদি সম্ভব না-ও হয়, তবে বাজার থেকে টব কিনে এনে গাছ তৈরির কাজে হাত দিতে হবে। শিক্ষক-মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে বিভিন্ন ফুলের বা বাহারি পাতার গাছ টবে তৈরি করা হল—এবিষয়ে পটুত্ব অর্জিত (acquirement of skill) হল। এবার জানবার পালা, শেখবার পালা। মাটির পরীক্ষা, কোন্ মাটির কী ধর্ম, ফুলের আকৃতি, ফুলের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ, পরাগযোগ,

পাতায় কাজ, সালোক-সংশ্লেষ, পত্ররন্ধ্র, ক্লোরোফিল ইত্যাদি জীবন-বিজ্ঞানের নানা তথ্য ও রহস্য সম্পর্কে ছাত্ররা জানবে। শুধু জীবন-বিজ্ঞানই নয়—ঐ সব তথ্য এবং পাটুত্বভিত্তিক কর্ম প্রয়াসের ধারাবাহিক বিবরণ কর্ম-দিনপঞ্জী বা ওয়ার্ক ডায়েরিতে লিখে রাখতে গিয়ে ছাত্রদের ভাষা প্রয়োগের স্টাইলের উৎকর্ষ ঘটবে (integration of work with academic subjects)। সঙ্গে সঙ্গে টবের গাছ রক্ষণাবেক্ষণের উপায়, প্রাত্যহিক পরিচর্যার প্রয়োজনীয়তা, টবগুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার মানসিকতা ইত্যাদি মনোভাব গড়ে উঠবে (development of desirable attitude) আবার এই কাজের মধ্যে দিয়ে ছাত্ররা সমাজের আরও পাঁচজন চাষীর সঙ্গে সহযোগিতামূলক আনন্দ-ভিত্তিক পরিচিতি লাভে ধন্য হবে। **ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হবে আনন্দময় কর্মের মাধ্যমে।** কর্মশিক্ষার এটাই বড় লাভ। সমাজ-বিচ্ছিন্ন, জীবন-বিচ্ছিন্ন মানুষ স্বার্থপর মানুষ।

কর্মশিক্ষার এইসব উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখেই মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ তার সিলেবাস প্রণয়ন করেছে। পরিকল্পনাটা এইভাবে করা হয়েছে : সমাজের গণ্ডির মধ্যে শিশুর চারপাশে যে কাজের দুনিয়াটা ছড়িয়ে রয়েছে, সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে বিভিন্ন রকমের কাজ হয়, তাই দেখে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে—তারা দোকানপাট, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র উৎপাদন-শিল্প, কামারশালা-ছুতারশালা, চাষবাস, পশুপালন ইত্যাদি দেখে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করবে। এইসব Environmental Activities বা পরিবেশের কাজকর্ম দেখে কাজের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল হবে, স্বনির্ভর হবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে। এর পরের স্তরে—নবম ও দশম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের জীবনমুখী বাস্তব পরিবেশে কর্ম-অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ দেওয়া হবে। বীজ বোনা বা ফসল কাটার সময় মাঠের কাজ কিংবা প্রতিমাশিল্পী কোন পরিবারের ব্যবসাভিত্তিক কাজ (মূর্তি গড়া, শোলার কাজ, চালচিত্র অলংকরণ ইত্যাদি) অথবা বাণিজ্যিক ও শিল্পসংস্থার কোন কাজে ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে 'কথায় না বড় হয়ে কাজে বড়' হয়ে উঠবে।

আসল কথা, উৎপাদনাত্মক শ্রম। রাশিয়ার মহানেতা লেনিন যাকে বলেছিলেন, Productive Labour. বলেছিলেন—দেশের উৎপাদনাত্মক শ্রমযজ্ঞে যে অংশ গ্রহণ করবে না, রাষ্ট্র তাকে খেতে দেবে না। কর্মশিক্ষার পিছনেও এ মন্ত্রটিই কাজ করছে। তোমাকে শ্রম করতে হবে; কারণ সমাজের সবাই তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ তাই তাঁদের নির্দেশপত্রিকায় বলেছেন : উৎপাদনশীল শ্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অন্তর্বিকাশের ফলে তার বৌদ্ধিক পরিণতি ঘটবে, আবার বহির্বিকাশের ফলে সমাজের আবহাওয়ায় পুষ্ট এক উদ্দীপিত জনসমাজের সঙ্গে তারা একাত্ম হতে পারবে। পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীলতার পরিবর্তে উৎপাদনশীল শ্রমের অনুকূলে তাদের মনোভাব গড়ে উঠবে।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে পরিবেশের কাজকর্ম পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করা এবং তারই সঙ্গে কিছু কিছু সহজ, অনাড়ম্বর, অল্পব্যয়ে সৃজনাত্মক কাজকর্ম করা—এই হবে উদ্দেশ্য। এই

অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতা অবলম্বন করে ছাত্রছাত্রীরা নবম ও দশম শ্রেণীতে সমাজোপযোগী উৎপাদনাত্মক প্রকল্পে (Socially Useful Productive Work) আত্মনিয়োগ করবে। ১৯৮২ সাল থেকে মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ নবম-দশম শ্রেণীর জন্যে নতুন পাঠ্যসূচি ঘোষণা করেছেন। এতে এগারটি উৎপাদনমুখী প্রকল্প নির্ধারিত হয়েছে ঃ

১. সাবান, ফিনাইল ও কালি তৈরি (যে কোনো দুটি)
২. গৃহস্থালীর তড়িৎ-সংযোগ ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামতি অথবা, ট্রানজিস্টর -এর অংশাদির সংযোগবিধান ও মেরামতি।
৩. খাদ্যশস্যের চাষ (ধান ও গম)
৪. পাট চাষ
৫. শাকসবজি ও ফুলের চাষ
৬. বার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক উদ্যান রচনা
৭. প্রাথমিক সূতাকাটা বয়ন
৮. নক্সা আঁকা, রঞ্জন ও বয়ন
৯. সীবন ও সূচীশিল্প
১০. কাঠের কাজ
১১. মাটির মডেলিং।

পর্ষদের নির্দেশ ঃ স্কুলের আয়তন অনুসারে এবং উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা পাওয়া সাপেক্ষে নবম ও দশম শ্রেণীতে এক বা একাধিক (তবে তিনের অনধিক) প্রকল্প নেওয়া হবে। তবে একটা দরকারী কথা হচ্ছে, কোনো ছাত্রছাত্রীকেই নবম ও দশম শ্রেণীতে মিলে একটির বেশী প্রকল্প নিয়ে কাজ করতে হবে না এবং ১৯৮৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা থেকে ঐ একটি মাত্র প্রকল্পের ভিত্তিতেই পরীক্ষাগারে পরীক্ষা দিতে হবে।

যে কর্ম প্রকল্পই নবম/দশম শ্রেণীতে গ্রহণ করা হোক না কেন, তার প্রকৃতি বুঝতে হবে। কর্ম প্রকল্পগুলি দু'ধরনের হতে পারে ঃ একক বা যৌথ। একক কর্মপ্রকল্পে (যেমন সূতাকাটা ও বয়ন, সেলাই ও সূ'চের কাজ, কাঠের জিনিসপত্র তৈরি, মাটির মডেলিং, টবে গাছ করা) ব্যক্তিগত পটুত্ব গড়ে ওঠে আর যৌথ কর্ম প্রকল্পে (যেমন সাবান-ফিনাইল-কালি তৈরি, তড়িৎ-সংযোগ বা ট্রানজিস্টর মেরামতি, চাষের কাজ, ফুলের চাষ, উদ্যান রচনা) সামাজিক গুণাবলী, সহযোগিতার মনোভাব ও পটুত্ব ইত্যাদি বিকশিত হবার সুযোগ পায়। যৌথ প্রকল্পে একটি দলের কাজের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট থাকে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে কয়েকটি উপদল তৈরি করে তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম কাজ ভাগ করে দিতে হয়।

তোমাদের স্কুলে যে প্রকল্পটি নির্বাচন করা হয়েছে সেটি এই নিয়মেই সম্পাদন করবে।

পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়

নবম দশম/১২৪

ছবি ঃ পাহাড়ী রায়চৌধুরী

শারীর শিক্ষা

ক্যালিস্থেনিকস

ক্যালিস্থেনিকস যাকে আমরা সাধারণত খালিহাতে ব্যায়াম বলে থাকি। শারীর শিক্ষার পাঠক্রমে এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এর মাধ্যমে সহজেই শরীরের শক্তি ও সৌন্দর্যবৃদ্ধি করা যায়। নতুন সিলেবাসে ক্যালিস্থেনিকসকে বাধ্যতামূলক রাখা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকেই প্রতিটি ক্লাসে কয়েকটি করে টেবিল বা সারণী করতে হবে এবং প্রতিটি ক্লাসেই আগেরগুলো আবার করার পর নতুন করে কয়েকটি সারণী করতে হবে। কয়েকটি ব্যায়ামকে নির্বাচন করে তাকে নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে নিয়ে একটি সারণী করতে হবে।

ক্যালিস্থেনিকস কথাটা গ্রীক থেকে এসেছে। গ্রীক শব্দে এর অর্থ সুন্দর শক্তি। এক কথায় বলা যায়, ক্যালিস্থেনিকস হল 'সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতিবিহীন এমন কতকগুলো ব্যায়ামের সমষ্টি যার মধ্য দিয়ে সহজেই শরীরকে সুন্দর ও শক্তিশালী করে তোলা যায় ও শারীরিক পটুতা অর্জন করা যায়। ক্যালিস্থেনিকস-এর সারণী যদি ঠিকমত তৈরি করা হয়, তাহলে যে কোন মাংসপেশীর একক বা দলবদ্ধভাবে উন্নতি ঘটান সম্ভব; আবার সহজেই যে কেউ এককভাবে বা কয়েকজন মিলে দলবদ্ধভাবে ক্যালিস্থেনিকস করতে পারে। একঘেয়েমি কাটানর জন্য অনেক সময়েই সংগীত ব্যাণ্ডের সাহায্য নিয়ে ছন্দের তালে তালে ব্যায়ামগুলো করা হয়ে থাকে। তবে এটাও ঠিক যে খুব বেশিক্ষণ ধরে করলে একঘেয়েমি আসে—খুব ক্লান্তও লাগে।

ক্যালিস্থেনিকস ঠিকমত করার ও বেশি উপকার পাবার জন্য সব সময়ে মনে রাখতে হবে ঃ

১. যদিও ক্যালিস্থেনিকস একটি বিশেষ ছন্দে করা হয় তবুও মনে রাখা উচিত প্রথম দিকে প্রতিটি ব্যায়ামই আস্তে আস্তে, মন্থরগতিতে ও সংখ্যার দ্বারা করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে দেখে বা দেখিয়ে নিতে হবে কোথাও ভুল হচ্ছে কিনা। সেগুলো এই প্রথম অবস্থাতেই ঠিক করে শুধরে নিয়ে এগোতে হবে। তাই প্রথম দিকে অন্যের সাহায্য নিয়ে ব্যায়ামগুলো ঠিক করে নিয়ে এগোলে ভাল ফল পাবে। মনে রাখবে সঠিক ব্যায়ামের মধ্য দিয়েই সব থেকে বেশি উপকার পাওয়া সম্ভব।

২. সম্পূর্ণ শরীরের উন্নতি ও সুষম বিকাশের জন্য বিভিন্ন রকমের ব্যায়াম ক্যালিস্থেনিকসের সারণীতে থাকা উচিত।

৩. প্রত্যেক ক্যালিস্থেনিকস সারণীতে অন্তত ৬ থেকে ৭টি ব্যায়াম থাকা উচিত। প্রতিটি ব্যায়ামই সাধারণত চার সংখ্যায় করা হয় ও চার বার করে করা উচিত।

৪. প্রথমে অল্প সময়ের জন্য ব্যায়াম করা উচিত। আস্তে আস্তে সময় বাড়াবে ও দুটি ব্যায়ামের মধ্যে যে বিশ্রামের সময় থাকে তাকে কমাবে।

৫. ক্যালিস্থেনিকসের ব্যায়ামগুলো সাধারণত ঘাড় থেকে শুরু করে পরপর হাত, কাঁধ, কোমর ও পায়ের হওয়া উচিত।

নবম শ্রেণীতে দু'টি সারণী করতে হবে। এই সারণীগুলোতে কোন কোন

ব্যায়াম থাকবে তা ঠিক করা হয় মূলনীতি মনে রেখে। মূলনীতি মনে রেখে যে কোন ব্যায়ামকে এই সারণীতে আনা যায়। এখানে দুটি সারণী দেওয়া হল অনুশীলনের জন্য। তবে কারো বিদ্যালয়ে যদি একটু ভিন্ন ধরনের ব্যায়াম দেয়, তাহলে সেগুলোও করতে পার।

প্রথম সারণী

একের ব্যায়াম

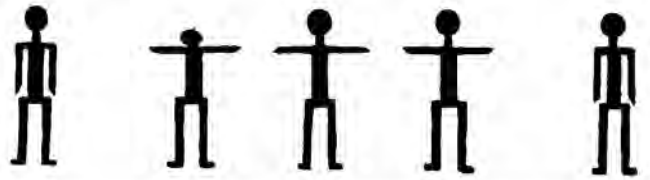

ব্যায়াম আরম্ভের অবস্থান : সোজা হয়ে সাবধানে দাঁড়াও।

১. দুই হাত দুই পাশে কাঁধসমান তোল, তালু নিচের দিকে থাকবে ও আঙুলগুলো জড়ো করে রাখবে। দৃষ্টি সামনে থাকবে।

২. ঘাড় বাঁকিয়ে মাথা পিছনে নিয়ে যাবে, হাত ঘুরিয়ে তালু ওপরের দিকে নিয়ে যাবে।

৩. ১ নম্বর অবস্থায় আসতে হবে।

৪. ব্যায়াম আরম্ভের অবস্থানে এস।

দুয়ের ব্যায়াম

ব্যায়াম আরম্ভের অবস্থান : সোজা হয়ে সাবধানে দাঁড়াও।

১. দুই হাত সোজা সামনের কাঁধসমান তোল। হাতের আঙুলগুলো জোড়া থাকবে ও তালু ভেতরে পরস্পরের দিকে সামনাসামনি থাকবে।

২. দুই হাত মাথার ওপরে সোজা ওঠাও। হাতের অবস্থা ১ নম্বর-এর মতই থাকবে।

৩. ১ নম্বর-এর মত কর।

৪. হাত নিচে নিয়ে ব্যায়াম আরম্ভের অবস্থায় আসবে।

তিনের ব্যায়াম

ব্যায়াম আরম্ভের অবস্থান : সোজা হয়ে সাবধানে দাঁড়াও।

১. দুই হাত পাশে কাঁধ সমান তোল। আঙুল জোড়া থাকবে ও তালু নিচের দিকে থাকবে।

২. লাফিয়ে পা ফাঁক করে দুই হাত মাথার ওপরে নিয়ে গিয়ে তালি বাজাবে।

৩ লাফিয়ে ১ নম্বর অবস্থায় ফিরে এস।

৪. ব্যায়াম আরম্ভের অবস্থায় ফিরে এস।

চারের ব্যায়াম

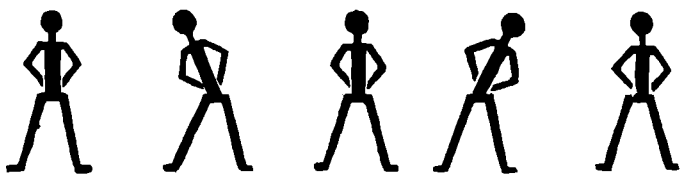

ব্যায়াম আরম্ভের অবস্থান : দুই পা ফাঁক করে দুই হাত কোমরে রেখে দাঁড়াও।

১. শরীরের নিচের অংশ সোজা রেখে কোমর থেকে ওপরের অংশকে বাঁ দিকে বাঁকাও। দৃষ্টি সোজা থাকবে।

২. ব্যায়াম আরম্ভের অবস্থায় ফিরে এস।

৩. ১ নম্বর অবস্থায় ডানদিকে শরীরকে বাকাবে।

৪. ব্যায়াম আরম্ভের অবস্থায় ফিরে এস।

পাঁচের ব্যায়াম

ব্যায়াম আরম্ভের অবস্থান : সোজা হয়ে সাবধানে দাঁড়াও।

১. লাফ দিয়েই পা ফাঁক করে দুই হাত মাথার পিছনে নিয়ে যাও। মাথার

পিছনে দুই হাতের আঙুলগুলো পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকবে।

২. শরীরের নিচের অংশকে সোজা রেখে শরীরের ওপরের অংশকে কোমর থেকে ভেঙে সামনের দিকে কোমর পর্যন্ত বাকাও। দৃষ্টি নিচের দিকে থাকবে।

৩. ১ নম্বর অবস্থায় ফিরে এস।

৪. লাফিয়ে ব্যায়াম আরম্ভের অবস্থায় ফিরে এস।

ছয়ের ব্যায়াম

ব্যায়াম আরম্ভের অবস্থান : সোজা হয়ে সাবধানে দ'াড়াও।

১. লাফিয়ে দুই পা ফাঁক করে দুই হাত মাথার পিছনে নিয়ে যাও। দুই হাতের আঙুলগুলো পরস্পরের সঙ্গে লেগে থাকবে।

২. শরীরের নিচের অংশকে সোজা রেখে শরীরের ওপর অংশকে কোমর থেকে ভেঙে পিছনে নিয়ে যাও। দৃষ্টি ওপরের দিকে থাকবে।

৩. ১ নম্বর অবস্থায় ফিরে এস।

৪. লাফ দিয়ে ব্যায়াম আরম্ভের অবস্থায় ফিরে এস।

সাতের ব্যায়াম

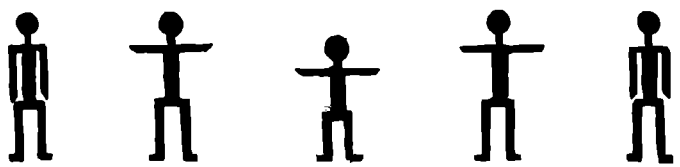

ব্যায়াম আরম্ভের অবস্থান : সোজা হয়ে সাবধানে দাঁড়াও।

১. দুই হাত দুই পাশে কাঁধের সমান মাটির সমান্তরাল তোল। তালু নিচের দিকে ও আঙুল জড়ো থাকবে।

২. ১ নম্বর অবস্থায় হাঁটু অর্ধেক ভেঙে অর্ধবসার অবস্থায় এস।

৩. ১ নম্বর অবস্থায় ফিরে এস।

৪. আরম্ভের অবস্থায় ফিরে এস।

অমিয় সাহা

বিচিত্রা

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন

সমরজিৎ কর

নিউইয়র্ক শহরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে হাডসন নদী। তার পাশে দাঁড়িয়ে প্রসিদ্ধ রিভারসাইড চার্চ। সেই চার্চের মধ্যে থরে থরে সাজান রয়েছে সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম মনীষীদের মূর্তি। ১৯৩০ সালের কোন একদিন সেই মূর্তিগুলো দেখার জন্যেই সেখানে হাজির হলেন প্রৌঢ় এক দম্পতি। যিনি স্বামী, তাঁর পরনে আলুথালু পোশাক।

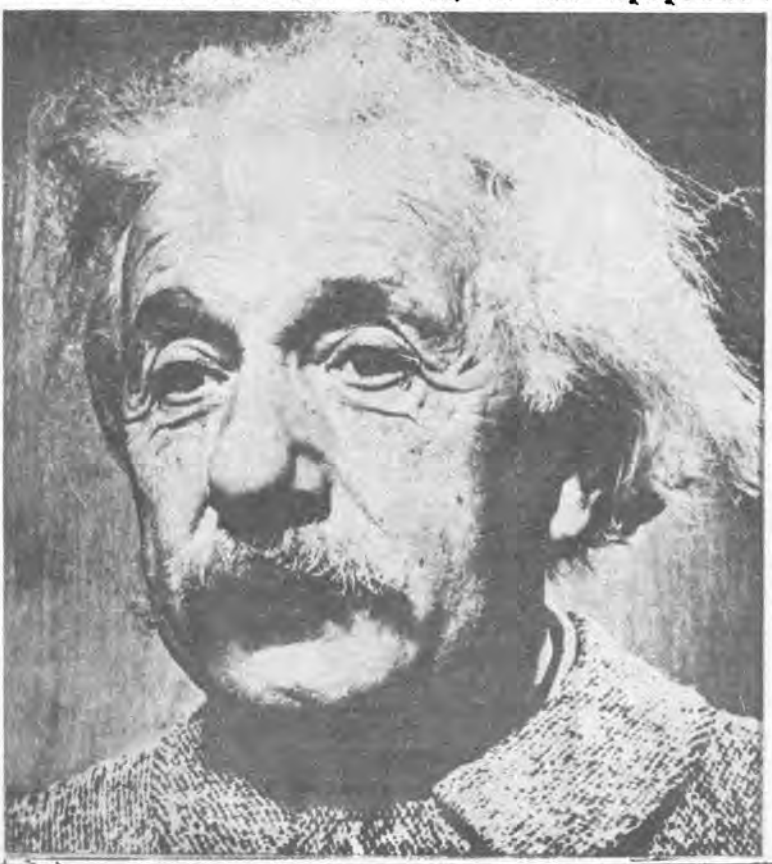

মাথার ওপর ছড়ান গুচ্ছ গুচ্ছ চুল। প্রশান্ত মুখ। স্বপ্নালু চোখে সাগরের গভীরতা। চার্চের সেই মূর্তিগুলো দেখতে দেখতে মুহূর্তে তিনি সমাহিত হয়ে গেলেন যেন।

এমন সময় তাঁর স্ত্রী একটি মূর্তির সামনে এসে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

আলবার্ট, দেখছি তোমারও মূর্তি এখানে স্থান পেয়েছে, স্ত্রী বললেন।

স্ত্রীর আহ্বানে স্বামী এসে দাঁড়ালেন সেই মূর্তিটির সামনে।

জীবন্ত মানুষের সামনে তাঁরই পাথরের মূর্তি। আরও কত মূর্তিই ত রয়েছে। সে সব মূর্তি যাঁদের, তাঁরা সবাই মৃত। ব্যতিক্রম শুধু এই একটিমাত্র মূর্তি। এ মূর্তি যাঁর, তিনি জীবিত।

নিজের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে জীবন্ত মানুষটি কেমন যেন উদাস হয়ে উঠলেন। আর সত্যিই ত। জীবদ্দশায় এত বড় সম্মান! এমন সম্মান কে পেয়েছেন এ পর্যন্ত?

শুধু সম্মান? ভালবাসাও কি নয়? সর্বজনের ভালবাসা?

আরও একবার। হলিউডের পথ ধরে হুডখোলা গাড়িতে চড়ে চলেছেন দুজন মানুষ। আইনস্টাইন এবং বিখ্যাত কৌতুক অভিনেতা চার্লস চ্যাপলিন। তাঁদের দেখতে পথের দুধারে কাতারে কাতারে মানুষ। আইনস্টাইনের মুখের ওপর সেই একই প্রশান্তি।

চার্লস, রাস্তার ধারে এত ভিড় কেন? কতকটা অন্যমনস্কভাবেই জিজ্ঞেস করলেন আলবার্ট।

ভিড়? ও, হ্যাঁ, এ ত স্বাভাবিক ব্যাপার। আমরা বিখ্যাত কিনা? তাই মানুষ আমাদের দেখতে চায়। এর জন্যেই এত ভিড়। চার্লস চ্যাপলিন জবাব দিলেন।

বিখ্যাত কেন?

ও, বুঝেছি। আমার কথাটা বোধ হয় আপনার কানে ঢোকেনি। শুনুন, ওরা আপনাকে দেখতে চায়, কারণ ওরা কেউ আপনাকে বুঝতে পারে না। আর আমাকে দেখতে চায়—কারণ সবাই আমাকে বুঝতে পারে।

অদ্ভুতই বটে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে আইনস্টাইন সত্যিই যেন এক ব্যক্তিত্ব। প্রবাদ পুরুষ।

জন্ম ১৪ মার্চ, ১৮৭৯। দক্ষিণ জার্মানির উল্‌ম শহরে। বাবা হারমান আইনস্টাইন। মা পাউলিন। ওঁদের ছিল একটি ছোটখাটো ব্যবসা। কিন্তু আলবার্টের জন্মের এক বছরের মধ্যে সে ব্যবসা শিকেয় উঠল। ফলে জীবনের গোড়া থেকেই দারিদ্র্য এবং অনিশ্চয়তা হয়ে দাঁড়াল আইনস্টাইনের সঙ্গী। লেখাপড়ার জন্যে কখনও গেছেন ইটালিতে, কখনও সুইজারল্যাণ্ডে। সঙ্গীতে তাঁর ছিল অসাধারণ অনুরাগ। বিজ্ঞান-গবেষণার সঙ্গে চলত বেহালাবাদন। ১৮৯৫ সালে জুরিখ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে আরাউ-এর একটি ইস্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে স্নাতক। এর পর শুরু হল জীবন সংগ্রাম। চাকরি নিলেন বেরন-এর এক পেটেণ্ট অফিসে। কেরানীর চাকরি।

কিন্তু প্রতিভাকে আটকে রাখে কে? বেরন-এ কেরানীর চাকরি করার সময়ই তাঁর মধ্যে ধরা পড়েছিল বৈজ্ঞানিক প্রতিভা। গণিত এবং সমকালীন পদার্থবিজ্ঞানে তখন থেকেই তাঁর মধ্যে ধরা পড়ে অসামান্য প্রতিভা।

আলবার্ট আইনস্টাইনের জীবন বিচিত্র। সে প্রসঙ্গে অনেক কথাই অনেকে জানেন। বরং যে কারণে তিনি বিজ্ঞানী-শ্রেষ্ঠ হিসেবে পরিগণিত সে কথাই বলি। কারণ বিজ্ঞান-জগতে তাঁর অবদান একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে। চিরায়ত বিজ্ঞান চিন্তায় হেনেছে কুঠারাঘাত।

যেমন ধর, তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন, কোন বস্তু যখন প্রচণ্ড গতিতে ধাবিত হয়, তখন তার মধ্যে ধরা পড়ে শক্তির আপাত পরিবর্তন। তিনি প্রমাণ করেন, আলোক বিকিরণকারী বস্তু গতিশীল অবস্থায় শক্তি ত্যাগ করে। প্রমাণ করেন, আলোরও ওজন আছে। যাকে আমরা বলি বস্তু, আসলে তা শক্তিরই জমাট অবস্থা। বস্তু মাত্রেরই ভর আছে। আর সেই ভর শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। তিনি বললেন, ধরা যাক কোন বস্তুর ভর m, আলোর গতি c। এখন সেই বস্তুকে যদি পুরোপুরি শক্তিতে রূপান্তর করা যায়, তা হলে ওই m বিশিষ্ট ভরের বস্তু যতটা শক্তি দেবে তার পরিমাণ যদি E হয়, তা হলে ছোট্ট একটি সমীকরণের সাহায্যে E কে প্রকাশ করা যায়। সেই সমীকরণটি হল $E = mc^2$।

তত্ত্বের সাহায্যে তিনি দেখিয়েছেন ঃ

১ কোন বস্তু মাধ্যাকর্ষণের টানে যখন নিম্নগামী হয় তখন তার কিছুটা 'Rest energy', বা স্থিতিশীল শক্তির ক্ষরণ ঘটে।

২. মাধ্যাকর্ষণ বল আলোকেও আকর্ষণ করতে পারে। নক্ষত্রের পারমাণবিক জ্বালানি প্রজ্জ্বলনের দরুন কমে এলে কখনও কখনও এমন অবস্থা দাঁড়ায়, যখন ওই নক্ষত্রের অন্তর্নিহিত মাধ্যাকর্ষণের দরুন তার যাবতীয় বস্তুকণা সঙ্কুচিত হয়। জমাট বেঁধে সৃষ্ট হয় নাক্ষত্রিক বস্তু। এই বস্তুকেই বলা হয় 'ব্লাক হোল' বা কৃষ্ণগহ্বর। 'ব্লাক হোল'-এর সান্নিধ্যে কোন বস্তু এলে প্রচণ্ড ভাবে আকর্ষিত

হয়। এমন কি আলোও ব্লাক হোলের দ্বারা আকর্ষিত হয়।

৩ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ 'রেস্ট এনার্জি'।

৪. সূর্য থেকে যে শক্তি নিষ্ক্রান্ত হয় তা রেস্ট এনার্জি।

৫. পারমাণবিক বোমা অথবাপারমাণবিক চুল্লিতে আমরা যে শক্তি পাই সেই শক্তিও রেস্ট এনার্জি।

৬. আলোক এক ধরনের কণা, সেই কণায় কি পরিমাণ শক্তি আছে তার ওপরই নির্ভর করে কণার কম্পন কেমন দাঁড়াবে। বিভিন্ন কম্পাঙ্কের আলোর বর্ণালী এর জন্যেই ভিন্ন ভিন্ন হয়।

৭. আলো পরমাণুকে উদ্দীপ্ত করতে পারে। আলো পরমাণুকে উদ্দীপ্ত করলে সেই পরমাণু থেকে অনুরূপ আলো পরিত্যক্ত হয়। এই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেই বিজ্ঞানীরা পরবর্তীকালে 'লেজার' তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন। পারমাণবিক ঘড়িও।

৮. কোন ব্যক্তি যখন স্বাধীন ভাবে পতিত হয় (**falling freely**), তখন তার মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ অনুভব করার ক্ষমতা থাকে না। স্বাধীনভাবে পতনশীল বস্তু অথবা মহাকাশযানের পতনশীল অবস্থায় কোন ওজন থাকে না।

৯. মহাশূন্যের ভেতর দিয়ে মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রেরও সঞ্চারণ ঘটে।

১০. পারমাণবিক ঘড়ি পৃথিবীর বুকে ধীর গতিসম্পন্ন হবে, ঊর্ধ্বাকাশে তার গতি যাবে বেড়ে।

১১. পতনশীল অবস্থায় বস্তু তার 'রেস্ট এনার্জি' হারাতে থাকে, পরিবর্তে বাড়তে থাকে তার গতিশক্তি।

১২. মাধ্যাকর্ষণের টানে আলোর গতিপথ বক্র হয়।

১৩. আলোর মত মাধ্যাকর্ষণক্ষেত্রেরও তরঙ্গ রয়েছে।

১৪. যদি তুমি আলোর গতিতে চলতে পারো, তোমার বয়েস কোন দিন বাড়বে না।

১৫. কোন ঘড়ি যদি প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়ে নেওয়া হয়, ছুটন্ত অবস্থায় তার সময় ধীর গতিতে চলবে।

১৬. স্বল্পজীবী পারমাণবিক কণার জীবন দীর্ঘতর হয়, যদি সেই কণার গতি বৃদ্ধি করা যায়।

১৭. গতিশীল অবস্থায় বস্তুর ভর আপাত বৃদ্ধি পায়।

১৮. বস্তুর পরিবর্তন ঘটতে পারে, কিন্তু এতে করে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রাবলীর কোন পরিবর্তন ঘটে না।

বলা বাহুল্য, এইসব চিন্তা অথবা তত্ত্ব পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের বিভিন্ন অঙ্গনে অনেক কিছুই ঘটিয়েছে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং ধ্বংস সম্পর্কে জুগিয়েছে নতুন ধারণা।

তবে বিজ্ঞানের জটিল ক্ষেত্র ছাপিয়েও যে কারণে আইনস্টাইন 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ', সেটা তাঁর মানুষের প্রতি অগাধ ভালবাসা। তাঁর তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেই তৈরি হয়েছিল পরমাণু বোমা। আর সেই বোমার অপপ্রয়োগ দেখে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য মানব কল্যাণ—এটাই ছিল তাঁর বিশ্বাস। সেই লক্ষ্য বাস্তবে পরিণত হোক, এটাই ছিল তাঁর প্রার্থনা।

বিদ্যালয় পরিচিতি

মানুষ গড়ার দায়িত্ব নিয়েছে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ

সরস্বতী পুজোর সাতসকালেই পৌঁছে গেলাম বিদ্যাপীঠে। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল প্রবেশতোরণটি। যেন একটি মঙ্গল কলস। মাথার উপরে মুদ্রিত উপনিষদের বাণী—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' প্রবেশ পথটি সোজা গিয়ে মিশেছে প্রার্থনাগৃহে—শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে। বাগ্‌দেবীর আরাধনায় সমস্ত বিদ্যাপীঠ মুখরিত।

সম্পাদক স্বামী উমানন্দ পরিচয় করিয়ে দিলেন বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক স্বামী অমরানন্দজীর সঙ্গে। আমি বিদ্যাপীঠ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি সস্মিত ভাষণে বললেন, জানেন নিশ্চয়ই, কিছুদিন আগেই উদ্‌যাপিত হয়ে গেল এই বিদ্যা-পীঠের রজত জয়ন্তী উৎসব। অবশ্য এখন এই যে সব ঘর-বাড়ি, মন্দির দেখছেন পঁচিশ বছর আগে কিন্তু এমনটি ছিল না।

পশ্চিমবঙ্গে বোধহয় আর একটিও নজির পাবেন না, যেখানে শুধু নবম শ্রেণী নিয়েই একটি মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমন নজিরও পাবেন না, সাধারণ শিক্ষাবিধির বহির্ভূত হলেও একটি গভর্ণমেণ্ট স্পনসরড স্কুলে

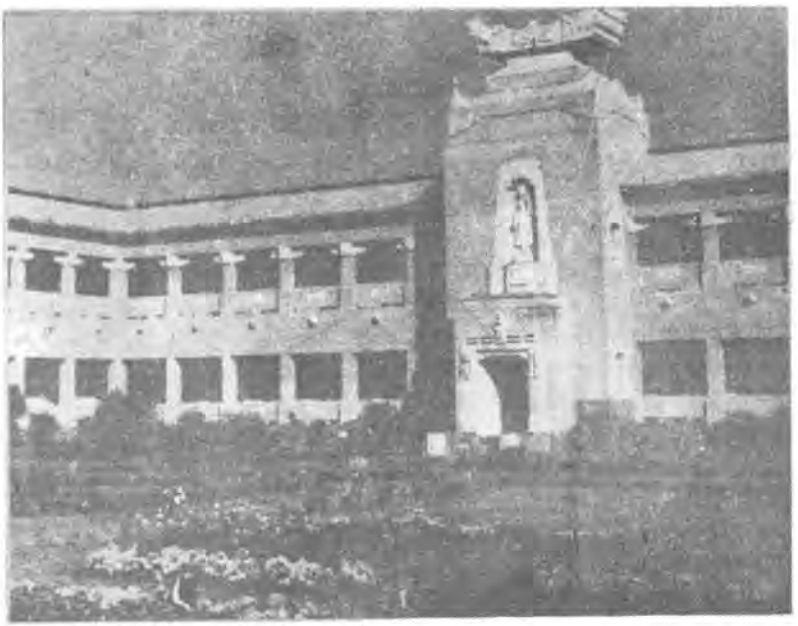

সারদামন্দির (উচ্চশ্রেণী ছাত্রদের বিদ্যালয় গৃহ)

মাধ্যমিক বিভাগ চতুর্থ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত। এ একমাত্র, পশ্চিমবঙ্গের এই পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠেই সম্ভব হয়েছে।

একটু থেমে অমরানন্দজী আবার শুরু করলেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শকে ভিত্তি করে প্রথম বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় একটি ভাড়া বাড়িতে—মিহিজামে (১৯২২)। সেখানে নানা অসুবিধা হতে থাকায় ১৯২৩ সালে দেওঘরে একটি ভাড়া বাড়িতে বিদ্যাপীঠটি স্থানান্তরিত হয়। তারপর আস্তে আস্তে বর্তমান রূপটি পায় বিহার সরকারের এক পয়সাও সহায়তা ছাড়া। এখনও বিহার সরকার দেওঘর বিদ্যাপীঠকে একটি কপর্দকও সাহায্য দেয় না। যাই হোক, দেওঘর বিদ্যাপীঠটি ছিল অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। অষ্টম শ্রেণী থেকে উত্তীর্ণ হয়ে অন্যত্র গিয়ে নবম-দশম শ্রেণীতে পড়া এবং মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখা দিতে থাকে নানা অসুবিধা। অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, সর্বোপরি ১৯৫৬ সালে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্বিন্যাসের ফলে পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সংকট আরও তীব্র হয়ে ওঠে। পশ্চাৎপদ, অনুন্নত পুরুলিয়ার নতুন রূপদান পরিকল্পনায় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রামকৃষ্ণ মিশনকে প্রস্তাব দেন পুরুলিয়ায় একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁর অনুরোধ মত মিশন কর্তৃপক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজীর নেতৃত্বে কিছু সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীকে সেখানে পাঠান দেওঘরেরই একটি সম্প্রসারিত শাখা-বিদ্যাপীঠ গড়ে তুলতে। ২৩টি জায়গা দেখার পর শহর থেকে ২ কিলোমিটার দূরে বোঙ্গাবাড়ি গ্রামে এখনকার পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠটি একটি বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৭-র ফেব্রুয়ারিতে। প্রতিরক্ষা দপ্তর, পঃ বঃ

গ্রাম সমীক্ষা

সরকার অধিকৃত এবং মিশনের নিজস্ব কেনা—সর্বমোট ৭৫ একর জমির উপর এই বিদ্যাপীঠটি প্রতিষ্ঠিত।

১৯৫৮-র ১ এপ্রিল থেকেই মূলতঃ বিদ্যাপীঠ শুরু হয়। দেওঘরে অষ্টম শ্রেণীর উত্তীর্ণ ছাত্ররা পুরুলিয়ায় এসে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। হিউম্যানিটিজ, সায়েন্স আর এগ্রিকালচার—এই তিনটি শাখা নিয়ে গড়ে ওঠা নতুন বিদ্যাপীঠ থেকে ১৯৬১ সালে প্রথম ব্যাচ ১১শ শ্রেণী পাশ করে বেরয়। ১৯৬৪ থেকে যুক্ত হয়েছিল আরও দুটি বিভাগ—টেকনিক্যাল, ফাইন আর্টস। ১৯৬৪-র মাঝামাঝি থেকে বিদ্যাপীঠে নিচুর দিকের ক্লাশ খোলা শুরু হয়।

সরকারি সাহায্যের প্রশ্নে বললেন, সরকারি অর্থানুকূল্যে যে বাড়িগুলি হয়েছে (বিদ্যাপীঠভবন, হোস্টেল, স্টাফ কোয়ার্টার, ডাইনিং হল) সেই বাড়িগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মোট ভ্যালুয়েশনের শতকরা আড়াইভাগ অর্থ সরকারি সাহায্য হিসাবে পাওয়া যায় বছরে। আর বিদ্যাপীঠ চালাতে যা খরচ হয় তার ½ অংশ সরকারি সাহায্য হিসাবে পাই (শিক্ষকদের বেতন প্রভৃতি), ½ অংশই আসে অভিভাবক এবং সহৃদয় মানুষের কাছ থেকে।

বছরে পরীক্ষা হয় ফাইন্যাল নিয়ে মোট ৯টি। মাইনর ৫টি, মেজর ৪টি। সারা বছরের ফলের ভিত্তিতে ছাত্রদের

মূল্যায়ন ঘটে। কাজেই কোন একটি ছাত্র ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করলেও তার সারাবছরের ফল ভাল থাকলে তাকে আর একবার সুযোগ দেওয়া হয়। তেমনি সারা বছরের পরীক্ষার ফল খারাপ করে ফাইন্যালে ফল ভাল করলেও তার প্রমোশন নাও হতে পারে। ফেল করলেই যে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তা নয়।

হোস্টেল আছে ৫টি। বড়দের ৪টি। ৪র্থ-৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য কম্পোজিট হোস্টেল ১টি। হোস্টেলগুলোর নামকরণ হয়েছে এইভাবে—রামকৃষ্ণ সদন, মাতৃসদন, বিবেকানন্দ সদন, ব্রহ্মানন্দ সদন এবং শিবানন্দ সদন। প্রতিটি হোস্টেল পরিচালনায় আছেন একজন সন্ন্যাসী ও একজন বেতনভোগী কর্মী।

১৯৭৬ পর্যন্ত বহুমুখী উচ্চমাধ্যমিক থাকার পর আবার ১৯৭৬ থেকেই মাধ্যমিক পুনঃপ্রবর্তিত হয়।

শুধু শিক্ষাদানেই যে একটা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব শেষ হয়, তা তো নয়, সমাজের প্রতিও একটি বিদ্যালয়ের অনেক দায়িত্ব থাকে, আপনারা কিভাবে সে দায়িত্ব পালন করেন, কিভাবে সমাজকেও আপনারা সাঙ্গীকৃত করেন, একটু বলবেন ?

স্বামীজী একটু ভেবে বললেন ঃ প্রায় প্রতি বছরই একটি সোস্যাল সারভিস ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। আশেপাশের গ্রামে

গ্রামে গ্রামে রোগ প্রতিরোধের কাজে স্কুলের ছাত্ররা

ছাত্ররা এই সময় নানারকম সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করে।

বিদ্যাপীঠের কর্মীদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্যে রয়েছে একটি নার্শারী। আছে সভাগৃহ। উন্মুক্ত সভাবেদী।

বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের কৃতিত্বের কথা সবাই জানেন। শিক্ষকদের কৃতিত্বও কম নয়। এবারই শিক্ষকদের জন্য জাতীয় পুরস্কার রাষ্ট্রপতির হাত থেকে গ্রহণ করলেন বিদ্যাপীঠের ইতিহাসের শিক্ষক ডঃ দেবকুমার চক্রবর্তী, ১৯৮০ সালের জন্যে।

এতসব শেষে জিজ্ঞাসা ছিল, এখানকার ছাত্ররা যে এত ভাল ফল করে, এর মূলমন্ত্রটি কী ?

স্বামী অমরানন্দজীর সস্মিত উত্তর, মন্ত্র হল একটাই—আমরা এবং শিক্ষকরা ছাত্রদের জন্যে খাটি। এবং আমরা সাধুরা যে কী পরিমাণ পরিশ্রম করি, তা জানেন এখানকার শিক্ষকরাই।

পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত, বনগর্মরিত—ছাত্র, সমাজ, সর্বোপরি সকল শ্রেণীর মানুষেরই সর্ববিধ মঙ্গল কামনায় সদা উন্মুখ—এমন একটি বিদ্যাপীঠ পশ্চিম বাঙলায় আর দু-একটি মাত্র আছে—তাও শ্রীরামকৃষ্ণ নামাঙ্কিত। আমি শেষ প্রশ্ন করলাম, এখনকার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন ?

স্বামীজী বললেন, আজকের ছাত্র আগামীদিনের ভারতের নাগরিক। কাজেই দায়িত্ব তাদের অনেক। চরিত্র, আদর্শ, সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা—এগুলো ছাত্রদের অবশ্য প্রয়োজন। এখনকার পাঠক্রমে কো-কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজের মধ্যেই রয়েছে নানারকম সুযোগ। ছাত্রদের সেই সুযোগগুলি গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিবেদন ঃ
তাপসকুমার ভট্টাচার্য

বিজ্ঞপ্তি

প্রেস অ্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশন বুকস অ্যাকট-এর (ফরম ৪) ১৯ ডি ধারা অনুযায়ী 'নবম-দশম' পাক্ষিক সংবাদপত্রের মালিকানা ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বিবরণ প্রকাশিত হলো।

১। প্রকাশ স্থান ঃ ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭২

২। প্রকাশ সময় ঃ পাক্ষিক

৩। মুদ্রকের নাম ঃ শ্রীঅরুণকুমার পাল
নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭২

৪। প্রকাশকের নাম ঃ শ্রীঅরুণকুমার পাল
নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭২

৫। সম্পাদকের নাম ঃ শ্রীঅশোক চৌধুরী
নাগরিকত্ব ঃ ভারতীয়
ঠিকানা ঃ ৪৭ বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭২

৬। উক্ত সংবাদপত্রের শতকরা একভাগেরও বেশি অংশীদারগণের নাম ও ঠিকানা ঃ

১। শ্রীঅশোকবরণ চৌধুরী
৪৯/১ পূর্ণদাস রোড
কলকাতা-২৯

২। শ্রীমতী গীতা চৌধুরী
৪৯/১ পূর্ণদাস রোড
কলকাতা-২৯

৩। শ্রীশক্তিপদ মৈত্র
২৮, ডাঃ সুন্দরীমোহন এভিন্যু
কলকাতা-১৪

৪। শ্রীপ্রশান্তকুমার মুখার্জি
৩৫৫, জি টি রোড (সাউথ)
হাওড়া-৩

৫। শ্রীবিমলকুমার দাস
পোঃ পাণিহাটি, ২৪ পরগণা

৬। শ্রীশিবচরণ দত্ত
১৩৬, আনন্দ পালিত রোড
কলকাতা-১৪

৭। শ্রীমতী অনিতা বিশ্বাস
২/১৮৬ এফ, শ্রী কলোনী
কলকাতা-৪৭

৮। শ্রীঅমিতাভ বক্সী
৭/১৬, লরেন্স স্ট্রিট
পোঃ উত্তরপাড়া, হুগলী

আমি শ্রীঅরুণকুমার পাল জানাচ্ছি উপরোক্ত বিবরণাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

স্বাঃ অরুণকুমার পাল
প্রকাশক ঃ নবম-দশম

সন্ধানী প্রতিযোগিতা

এই সংখ্যায় সন্ধানী প্রতিযোগিতার চরিত্র সামান্য পরিবর্তন করা হল। এবারের সন্ধানী প্রতিযোগিতা শব্দ-সন্ধান নির্ভর, তবে সমস্ত শব্দই লুকিয়ে আছে ভূগোল বইতে। পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে আমরা এইভাবে নানা নির্দিষ্ট বিষয়-নির্ভর শব্দ-সন্ধান তোমাদের উপহার দেবার চেষ্টা করব। এবারের শব্দ-সন্ধান তৈরি করেছেন **জগদীশ চৌধুরী**।

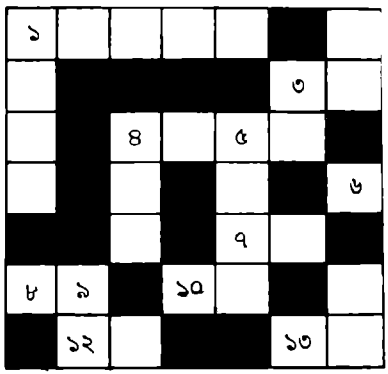

সূত্র ঃ পাশাপাশি

১. ভারতের কেন্দ্র-শাসিত একটি অঞ্চলের রাজধানী।

৩. পশ্চিম ঘাটের এক বিখ্যাত ঘাট।

৪. ভারতের উপকূল অঞ্চলের নাম।

৬. লাদাক অঞ্চলের শহর।

৭ দক্ষিণ ভারতের শৈল শহর।

৮ উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি রাজ্যের রাজধানী।

১০. রাজস্থানের নদী।

১২. উলটো করে পড়ঃ পাবে ভারতের প্রতিবেশী এক রাজ্যের রাজধানীর নাম।

১৩. উলটো করে পড়ঃ পাবে মেঘালয়ের এক শহরের নাম।

সূত্র ঃ উপর-নিচে

১. উত্তর-পূর্ব ভারতের এক রাজ্যের রাজধানী।

২. উত্তর খণ্ড (উত্তর প্রদেশ) হিমালয়ের বুকে স্বাভাবিক জলাশয় বা লেকের নাম।

সন্ধানী প্রতিযোগিতা
উত্তরপত্রের কুপন

নাম.....

শ্রেণী..... বিভাগ..... অনুক্রম.....

বিদ্যালয়ের নাম .....

ডাকঘর..... জেলা.....

প্রধান শিক্ষকের / শিক্ষিকার স্বাক্ষর..... বিদ্যালয়ের শীলমোহর.....

৩. মরুভূমি।
৪. হিমালয়ের এক সুউচ্চ শৃঙ্গ।
৫. একটি তৈল শোধনাগারের অবস্থিতি এখানে।
৯. আমাদের এক প্রতিবেশী রাজ্যের প্রাচীন নাম।
১১ কারাকোরাম পর্বতের সর্বোচ্চ শিখর।

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী

১। 'নবম দশম' পত্রিকার যে কোন পাঠকই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবে। তবে তাকে অবশ্যই কোন বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে।

২। প্রত্যেক উত্তরপত্রের সঙ্গে একটি করে প্রতিযোগিতার কুপন থাকতে হবে। ঐ কুপনের সব ঘর স্পষ্টাক্ষরে পূরণ থাকা চাই। বিদ্যালয়-প্রধানের স্বাক্ষর ও বিদ্যালয়ের শীলমোহর অবশ্য দেবে।

৩। আমরা কলকাতা ও হাওড়া অঞ্চলের প্রতিযোগীদের একটি দলে এবং অন্যত্র থেকে উত্তর পাঠান প্রতিযোগীদের অন্য দলে বিভক্ত করে বিচার করব।

৪। প্রত্যেক দলের প্রথম দিনে আসা উত্তর পত্রগুলির মধ্যে যাদের উত্তর বিচারকদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যাবে, তাদের প্রত্যেককে পাঁচ টাকা করে সন্ধানী পুরস্কার দেওয়া হবে।

৫। উত্তর এবং পুরস্কার বিজয়ীদের নামের তালিকা পরবর্তী দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

৬। বিজয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কার পত্রিকা দপ্তর থেকে যথাসময়ে বিদ্যালয়ের ঠিকানায় পাঠান হবে।

৭। উত্তরপত্র 'নবম দশম'-এর অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। খামের ওপর 'সন্ধানী প্রতিযোগিতার উত্তর' কথাটি লাল কালিতে অবশ্য লিখবে।

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ প্রকাশিত সন্ধানী প্রতিযোগিতার উত্তর।

১। শ্রীঅরবিন্দ, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুভাষচন্দ্র বসু ও মহাকবি কালিদাস।
২। জি শঙ্কর কুরুপ
৩। চণ্ডীগড়।
৪। চারুকলা
৫। নূর-উদ্দীন-জাহাঙ্গীর।
৬। ২৭৩ খ্রি.পূ. থেকে ২৩২ খ্রি.পূ.
৭। ১২টি।
৮। ১২, ৭৫৬ কি.মি.।
৯। গোয়ালিয়র।
১০। ১৯৬১।

সন্ধানী প্রতিযোগিতা
উত্তরপত্রের কুপন

নাম.....

বাড়ী বা রাস্তা

গ্রাম বা পাড়া

ডাকঘর ও পিন কোড

জেলা..... রাজ্য.....

নতুন করে দেখা

মল্লভূমি বিষ্ণুপুর

উৎপল চক্রবর্তী

এবার চল বিষ্ণুপুর। ইতিহাস জানায়, প্রায় পাঁচশো বছর আগে যখন সারা বাঙলা গৌড়ের সুলতানদের শাসনাধীন ছিল, তখন একমাত্র এই বিষ্ণুপুর ছিল স্বাধীন। সেই হিসেবেও এর আলাদা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

পর্যটকরা জানান, সারা বাঙলায় পোড়ামাটির কারুকার্যময় (টেরাকোটা) মন্দির এত বেশি সংখ্যায় আর কোন শহরে নেই। বিষ্ণুপুর যেন মন্দিরপুর। বাঙলার একান্ত নিজস্ব এই শিল্পরূপ যেন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিয়ে এই শহরের মন্দিরগুলোর শরীরে সগর্বে আজো সাক্ষ্য দিচ্ছে। আর এক কিংবদন্তীর গল্প বলে, গৌড়ের সুলতানরা এই রাজ্য অধিকার করতে না পারলেও, গৌড়েরই এক মহান ধর্ম অধিকার করেছিল বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজাদের হৃদয়। আর তারই ফলে আজকের এই শিল্পশোভিত মন্দিরময় নগরীর এই সৌন্দর্য। অতএব – এবার বিষ্ণুপুরে।

কলকাতার এসপ্ল্যানেড থেকে বাস ছাড়ে। ঘণ্টা চারেকের মধ্যেই সেই বাস পৌঁছে দেবে বিষ্ণুপুরে। ট্রেনেও যাওয়া যায়। তবে বাসে যাওয়াই সুবিধে।

কিন্তু প্রাচীনকালে এসব সুবিধে ছিল না। তাই সেদিন সেই ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দে উত্তর ভারতের কোন এক ক্ষত্রিয় রাজা জগন্নাথদেবের দর্শনোদ্দেশে পুরী যাত্রা করেছিলেন গোশকটে করে। তখন বর্তমান বিষ্ণুপুরের কাছে কোতুলপুরের ছয় মাইল পুবে লাউদ্রামে তাঁর আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে পঞ্চানন নামে জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়িতে রেখে যান বিশেষ কারণে। সেখানে জন্ম নেন রাজপুত্র। কিন্তু সেখানে রাজপুত্র রাখালের কাজ করতে থাকে। একদিন পঞ্চানন দেখেন ক্লান্ত ঘুমন্ত সেই বালকের মাথায় যেন রাজছত্র ধরে ফণা মেলে দাঁড়িয়ে

আছে এক বিষধর সাপ। পঞ্চানন বিস্মিত হন, পঞ্চানন বিশ্বাসও করেন এই বালক ভবিষ্যতে রাজা হবে। তিনি বালকের যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষার আয়োজন করেন। একসময় স্থানীয় পঞ্চমগড়ের আদিবাসী রাজা তাকে 'আদিমল্ল' উপাধি দেন। মল্লবংশের উদ্ভব হয়। শুরু হয় মল্লরাজবংশের ইতিহাস। রাজধানী ক্রমে স্থাপিত হয় বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুর বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

এ এক পুঁথির গল্প, যে পুঁথি বিষ্ণুপুর রাজপরিবারে সংরক্ষিত আছে।

কিন্তু আর একটি বিখ্যাত বই, স্যার উইলিয়াম হাণ্টারের 'অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল'—আছে অন্য এক গল্প।

বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ সিং বৃন্দাবনের কাছে জয়নগরের এক রাজপরিবারে জন্ম নেন। একবার পুরী যাবার পথে বিষ্ণুপুরের গভীর বনে তাঁর রানী সন্তান প্রসব করেন। তিনি মহিষী ও শিশুপুত্রকে রেখে তীর্থে যান। একজন আদিবাসী শিশুটিকে মানুষ করতে থাকেন। এখানে এক দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ শিশুর মধ্যে রাজ লক্ষণ দেখতে পান। বালককে নিয়ে তিনি একবার স্থানীয় এক আদিবাসী রাজার শ্রাদ্ধবাসরে গিয়েছিলেন। সেখানে ঘটে এক আশ্চর্য ব্যাপার। মৃত রাজার হাতী শুঁড় দিয়ে বালককে তুলে শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে দেয়। সবাই তাকে নৃপতি হিসেবে মেনে নেন। 'মাল' ও 'বাগদী' উপ-জাতীয়দের রাজা বলে 'মল্ল' শব্দটি যুক্ত হয়।

এইসব গল্প কতটা সত্য এখন আর জানার কোন উপায় নেই। এমন অনেক গল্পই ছড়িয়ে আছে আজো বিষ্ণুপুরের বাতাসে। ঐ ত বিষ্ণুপুরের অদূরে রাম-সাগরের সেই পথ যে পথ ধরে একদিন গৌড়ের সেই ধর্মবিজয় ঘটেছিল বিষ্ণুপুরে। ঐ পথ ধরে সেদিন বৃন্দাবন থেকে গৌড়ে যাচ্ছিল এক গোশকট। খবর পেয়েছিলেন প্রবল পরাক্রমী নৃপতি বীর হাম্বির—এক মহামূল্যবান সম্পদ গোপনে চলে যাচ্ছে ঐ গোশকটে তাঁরই রাজ্যের উপর দিয়ে। এই স্পর্ধা সহ্য করতে পারেননি বীর হাম্বির। তাঁর সৈন্যদল লুণ্ঠন করল সেই মহামূল্যবান সম্পদের আধারটি, বন্দী করল যাত্রীদের। কৌতূহলী নৃপতির সম্মুখে খোলা হল সেই আধারটি—আর বিস্ময়ে চমকে উঠলেন বীর হাম্বির। না, চোখ ধাঁধানো কোন মনিমাণিক্য নয়—শুধু একটি পুঁথি খুব যত্ন করে রেখে দেওয়া হয়েছে সেই আধারে। হাম্বিরের বিস্ময় ক্রোধে ফেটে পড়ে।

—কি আছে এই পুঁথির শ্লোকে?

উত্তরে ক্ষমাসুন্দর আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাসেন সেই পুঁথির রক্ষক এক গৈরিক বসনাবৃত সন্ন্যাসী। নাম শ্রীনিবাস আচার্য। বলেন, এ হল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা কথা, যা শুনলে মানুষের উন্নতি হয়।

বীর হাম্বির বিশ্বাস করতে গিয়ে যেন

দ্বিধা অনুভব করেন। শ্রীনিবাস আচার্য ধীরে ধীরে আবৃত্তি করেন সেই পুঁথির শ্লোক। অবিশ্বাসী নৃপতির মন শান্ত হয়ে আসে। আর তখনই বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে ঘটে যায় এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত। শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন তিনি। সেই গোশকট লুণ্ঠনের জন্য একটুও আপশোষ করেন না তিনি। সত্যিই এক মহামূল্যবান সম্পদ চলে যাচ্ছিল তাঁর রাজ্যের মধ্য দিয়ে।

সেই পুঁথি যেন পরশমণি। তার ছোঁয়ায় যেন নতুন এক জীবনের ছন্দ প্রবাহিত হল বিষ্ণুপুরে। গড়ে উঠল একটির পর একটি মন্দির।

ঐ ত সেই রাসমঞ্চ—যা দূর থেকে একটা পিরামিড বা প্যাগোডার মত দেখতে লাগে—যার মত রাসমঞ্চ সারা বাঙলায় আর কোথাও নেই। এখানে রাস উৎসবের সময় বিষ্ণুপুরের সমুদয় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সকলের দর্শনের জন্য এখানে এনে রাখা হত। ঐ ত তার সামনে স্তব্ধ হয়ে আছে বিষ্ণুপুরের ইতিহাসের অলৌকিক এক অধ্যায়। অলৌকিক আবরণ সরিয়ে দিয়ে বা প্রচণ্ড গর্জনে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠে জানিয়ে দেবে বাঙালীর শৌর্যবীর্যের আর এক ইতিহাস। ঐ সেই 'দলমাদল' কামান। সাড়ে বার ফুট দীর্ঘ, আর সাড়ে এগার ইঞ্চি ব্যাসের এই কামান তেষট্টিটি লোহার আংটি ঢালাই করে তৈরী করা হয়েছে। এর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী আছে মুর্শিদাবাদের 'জাহানকোষা' কামান। শোনা যায়, এই দুটো কামানই নাকি একজন কর্মকারের তৈরী। তাঁর নাম জনার্দন কর্মকার।

কিংবদন্তী বলে রাজা গোপাল সিংহের আমলে বিষ্ণুপুরের দেবতা মদনমোহন স্বয়ং নাকি ঐ কামান থেকে গোলাবর্ষণ করে পরাস্ত করেন বর্গীর আক্রমণ। বীর হাম্বিরের পর এসেছেন আরও অনেক নৃপতি। প্রত্যেকেই সমৃদ্ধ করেছেন বিষ্ণুপুরের ইতিহাস। গড়ে দিয়ে গেছেন এক একটি আশ্চর্য সুন্দর মন্দির।

ঐত সেই শ্যামরায়, জোড়বাঙলো আর কালাচাঁদের মন্দির—যা তৈরী করেছিলেন রঘুনাথ সিং। শ্যামরায় আর জোড়-বাঙলোর মন্দিরের মত এত পোড়ামাটির সূক্ষ্ম কাজ বাঙলার খুব কম মন্দিরেই আছে।

শুধু মন্দির নয়। নৃপতি বীরসিং বিষ্ণুপুরকে উপহার দিয়েছিলেন সাতটি সুস্বাদু জলের সরোবর। বিষ্ণুপুরের দুর্গ। তাঁর মহিষী শিরোমণি দেবী বা চূড়ামণি দেবী তৈরী করিয়েছিলেন ঐ লালজীর মন্দির, মদনগোপালের মন্দির, মুরারী-মোহনের মন্দির।

এরপর দুর্জন সিং এসে তৈরী করান নগর দেবতা মদনমোহনের মন্দির। কিন্তু বিষ্ণুপুরের এই দেবতা পরবর্তীকালের নৃপতিদের আর্থিক সংকটের কারণে বাঁধা পড়েন কলকাতার বাগবাজারের গোকুল মিত্রের কাছে।

আজও তিনি ফিরে আসেননি বিষ্ণুপুরে। কতযুগ পার হয়ে গেছে তারপর। তাঁর নিত্য আশীর্বাদে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে বিষ্ণুপুর। কত মানুষ আজও আসেন বিষ্ণুপুর দেখতে। কিন্তু অতীত ইতিহাসের সেই স্বর্ণময় দিনগুলোর স্মৃতি বোধহয় আজও বিগলিত করে তাঁকে। বিষ্ণুপুরের পরবর্তী নৃপতি চৈতন্য সিং, দামোদর সিং প্রভৃতির অন্তর্কলহ, গৃহবিবাদ—যার ফল, নবাব সিরাজদৌল্লার সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় পরস্পরের যুদ্ধ, শেষে সমগ্র রাজ্য ভাগ করা আর ইংরাজদের ধূর্ত ছলনায় ১৮০৬ সালে খাজনা না দেওয়ার ফলে মল্লভূম রাজস্ব প্রকাশ্য নীলামে বর্ধমান রাজের কাছে বিক্রী হয়ে

যাওয়া—এইসব হীন কুটিল অপদার্থতার কাহিনী বোধহয় বিষণ্ণ করে তাঁকে। সেই বিষণ্ণতা যেন লালবাঁধের জলের ঢেউ-এর মৃদু শব্দের সঙ্গে অস্ফুট স্বরের মত আজও পর্যটকের কানে বাজে। ঐ লালবাঁধের জলে একদিন টুকরো টুকরো করে কাটা নর্তকী লালবাঈ-এর দেহ নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। কত নাটক কত গল্প কত উপন্যাস লেখা হয়েছে এনিয়ে।

কিন্তু আজ সব স্মৃতি!

আর শুধু মল্লভূমেরই নয় প্রায় সারা বাঙলারই এমন অজস্র ঐতিহাসিক স্মৃতির সাক্ষী অসংখ্য পুঁথি, পাথরের মূর্তি, প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরের অস্ত্র, মালা, মুদ্রা—সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে বিষ্ণুপুরের সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায়। বিষ্ণুপুরে এসে এই সংগ্রহশালা দেখে এবং এর সম্পাদক শ্রীমানিকলাল সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করলে বিষ্ণুপুর এবং বাঙলারও ইতিহাস সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে সহজেই।

শুধু ত মল্লরাজাদের ইতিহাসই নয় এইখানে ছিল সঙ্গীত সম্রাট যদুভট্টের বাড়ি—যিনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে গান শিখিয়েছিলেন। এখানেই ছিলেন সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞান গোস্বামী। এই বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ির সুন্দর নকসার কারুকার্য আজও দেশবিদেশের মানুষকে আকর্ষণ করে। সেই সব শিল্পীর কাজও এখানে দেখা যাবে। দেখা যাবে—পুরনো দিনের তাস—যা দশাবতার তাস নামে বিখ্যাত। আর বিষ্ণুপুরের অদূরে আছে পাঁচমুড়া—সেখানকার পোড়ামাটির ঘোড়া আজ অশ্বমেধের ঘোড়ার মত বিশ্বজয় করতে বেরিয়েছে। আছে আশ্চর্যসুন্দর শঙ্খ শিল্প। শাঁখের তৈরী নানাধরনের জিনিস যা বাঙলার কারুশিল্পীদের প্রতি নতুন করে শ্রদ্ধা জাগাবে।

বিষ্ণুপুরে এলে একই সঙ্গে অতীত আর বর্তমান বাঙলাকে যেন প্রত্যক্ষ করা যাবে। অতীতের সমৃদ্ধি আর বর্তমানের উন্নতি যেন হাত ধরাধরি করে চলেছে বিষ্ণুপুরে।

বুদ্ধির খেলা

নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কোন সমস্যার জট খোলার মজা আলাদা। 'বুদ্ধির খেলা' বিভাগের অবতারণা এই জন্যই। এর প্রতিটি ধাঁধা এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে তোমরা তোমাদেরই জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে একটু ভেবে এর উত্তরগুলো বলে দিতে পার। বড়দের সাহায্য নিতে হবে না। সময়, ধর প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ২ মিনিট। না পারলে আরো ৩ মিনিট। পারলে আমাদের জানাও। সঠিক উত্তরদাতার নাম ও উত্তর প্রকাশ করা হবে আগামী সংখ্যায়।

১.

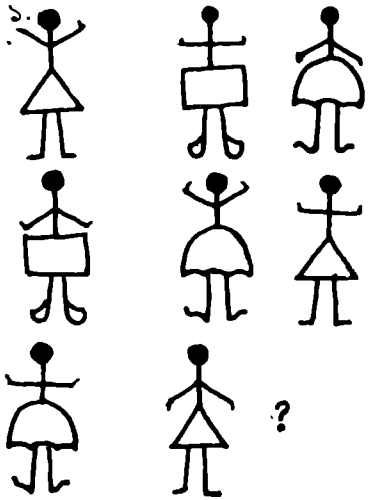

নিচের ছটি ছবির মধ্য থেকে খুঁজে বের কর শূন্যস্থানের ছবি কোনটি হওয়া উচিত—

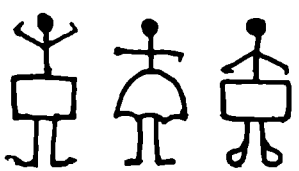

১ ২ ৩

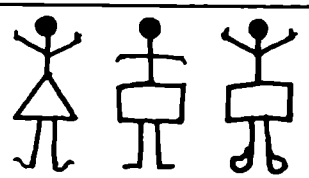

৪ ৫ ৬

২.

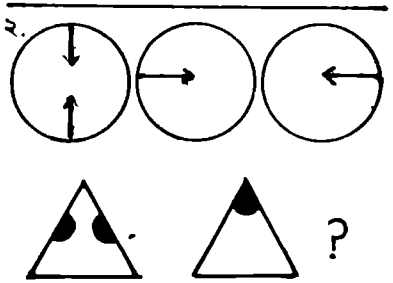

নিচের চারটি ছবি থেকে বল হারিয়ে যাওয়া ছবি কোনটি—

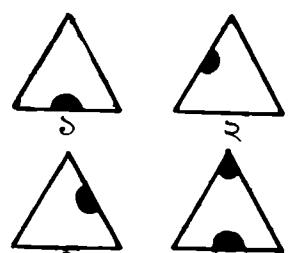

১ ২ ৩ ৪

৩. হারিয়ে যাওয়া সংখ্যাটি বসাও—

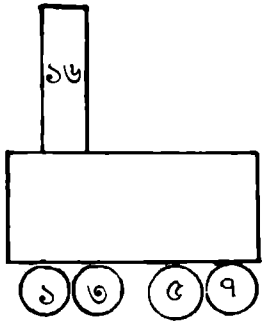

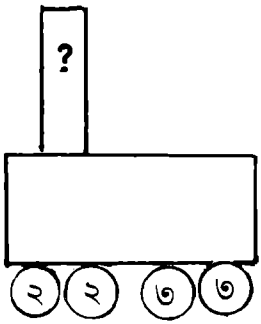

৪. দলছুট কোন জন ?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, শিশির ভাদুড়ী

৫. চতুর্থ ঘরের সংখ্যা ও অক্ষরটি বসাও—

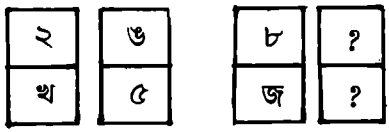

উত্তর

(৪র্থ সংখ্যা, ১৬ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত বুদ্ধির খেলার উত্তর)

১. আঠারটি ঃ ক খ ট ঞ ; খ গ ঠ ট ; গ ঘ ড ঠ ; ক গ ঠ ঞ ; ক ঘ ড ঞ ; খ ঘ ড ট ঙ চ ট ঞ ; চ ছ ঠ ট ; ছ জ ড ঠ ঙ ছ ঠ ঞ ঙ জ ড ঞ ; চ জ ড ট ; ক খ চ ঙ ; খ গ ছ চ ; গ ঘ জ ছ ; ক গ ছ ঙ ; ক ঘ জ ঙ ; খ ঘ জ চ।

২. ঘ. ০.৭৪।

৩. গ্রাফাইট (পেন্সিলের শিষ গ্রাফাইট দিয়ে তৈরী হয়)।

৪. বায়ু। বায়ু হল গ্যাসের মিশ্রণ। অন্যগুলো বাতাসের অংশ।

৫. এমন বাড়ি সত্যিই সম্ভব। উত্তর মেরুতে কোন ঘর তৈরি করলে তার চারটে দেওয়ালই দক্ষিণমুখী হবে। কেন না, উত্তর মেরুতে সবদিকই দক্ষিণ।

গত তৃতীয় সংখ্যায় (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২) প্রকাশিত বুদ্ধির খেলার সঠিক উত্তরদাতাদের নাম–

১। শ্রীকুমারেশ দে
চকদীঘি, বর্ধমান

২। শ্রীমৃণাল মণ্ডল
আর. আর. রোড, রাণীগঞ্জ

৩। কুমারী সৌমি মুখোপাধ্যায়
বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬

৪। শ্রীতাপস পট্টনায়ক
দুর্গাপুর-৫

৫। শ্রীতপনকুমার প্রামাণিক
ভৈরবপুর, বাঁকুড়া

দৃষ্টিহীন কৃতী ছাত্রী মণিকা ধর

সমীরণ মুখোপাধ্যায়

উনিশ'শ একাশি সাল, মফঃস্বল শহরের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে দৃষ্টিহীন ছাত্রী মণিকা ধর। অন্য সকলে যখন যে যার প্রশ্নোত্তর লিখতে ব্যস্ত, ব্যতিক্রম দৃষ্টিহীন ছাত্রীটি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে ক্লাসরুমের দিকে। মাঝে মাঝে গড়গড়িয়ে বলে যাচ্ছে পাঠ। পাশে বসা আর এক ছাত্রী সেগুলি খাতায় লিখে নিচ্ছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রত্যেক দিন একই ছবি। একজন বলছে, অন্যজন লিখছে। মাস্টার মশাই এসে মাঝে মাঝে জটিল প্রশ্নগুলি বুঝিয়ে দিচ্ছেন ওকে মণিকাও শুনছে পাশের ছাত্রীটি কি লিখল। উত্তর ঠিক হল কিনা।

কয়েক মাস পর। ইতিমধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। ১৯৮১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর, কলকাতার রবীন্দ্রসদন মঞ্চে পুরস্কৃত হল দৃষ্টিহীন কৃতী ছাত্রী মণিকা ধর। মাধ্যমিকে পশ্চিমবঙ্গের দৃষ্টিহীন ছাত্রীদের মধ্যে ওই পেয়েছে সর্বোচ্চ নম্বর। পদার্থবিদ্যায় লেটার মার্কসসহ মণিকার মোট নম্বর ৬১২।

একাশি সালে মাধ্যমিকে দৃষ্টিহীন কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ। সেদিনের আসরে শুধু মণিকাই নয়। উপস্থিত ছিল বিভিন্ন ব্লাইণ্ড স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষকরা।

এত বড় সাফল্য, মণিকা ভাবতেও পারেনি। আশা ছিল রেজাল্ট ভাল হবে। অবাক হননি কিন্তু একজন। মণিকার বাবা। চন্দননগর বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মণিলাল ধর। অভিজ্ঞ শিক্ষক মেয়ের উত্তরগুলি শুনে অনুমান করেছেন ফল কি হতে পারে।

হুগলীর মফঃস্বল শহর চন্দননগরের মেয়ে মণিকা ধর। ১৯৬৬ সালে জন্ম এই শহরেই

জন্ম থেকেই দৃষ্টিহীন ছিল না মণিকা। ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে -ও একদিন জগৎকে দেখেছে। এক বছর পর থেকেই চোখের রোগ ধরা পড়ে। ডাক্তাররা পরীক্ষার পর রায় দিয়েছেন শিশুটি চোখের কঠিন ব্যাধি 'বুফথলেমাসে' ভুগছে। জরুরী অপারেশনও হয়েছে কয়েকবার। কাজ কিছু হয়নি। তারপর থেকেই মণিকা দৃষ্টিহীন। চোখের সামনে ঘোর অন্ধকার। ওর অন্ধকার জগতে আশা যুগিয়েছেন দুটি মানুষ। শিক্ষক পিতা আর জননী।

তিন বছর বয়সে মায়ের কাছে ছড়ার গান শুনে কয়েকদিন পর তা মুখস্ত বলে দিত মেয়েটি। পাঁচ বছর বয়সে বাবার মুখে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনে পরের দিন নিখুঁত উত্তর দিয়েছে মণিকা।

ওর তখন সাত বছর বয়স। হাতে খড়ি হল দৃষ্টিহীন শিক্ষক সুবোধ বর্মনের কাছে। শুরু হল 'ব্রেইল' পদ্ধতিতে পড়া-শোনা। ব্রেইল স্লেটে, কাগজ এঁটে তারপর লোহার সূচ দিয়ে ফুটিয়ে 'ডট' বা অক্ষর লেখা।

পরিবারের ইচ্ছে ছিল মণিকা কলকাতার কোন ব্লাইণ্ড স্কুলে প্রশিক্ষণ নিক। বড় হোক। রাজী হয়নি কিশোরী বাবা-মাকে ছেড়ে থাকতে। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে চন্দননগর কৃষ্ণভামিনী নারীশিক্ষা মন্দিরে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হল মণিকা। এর আগে বাড়িতেই পাঠ নিয়েছে প্রশিক্ষকের কাছে।

প্রথম স্কুলে যাওয়ার দিনটি স্পষ্ট মনে আছে। কেমন মনে হয়েছিল? মণিকার কথাতেই বলি—'খুব মজা লাগছিল সেদিন। রেগুলার স্কুলে পড়ব। আমিই একমাত্র অন্ধ ছাত্রী। খুব শীতের ভোর। বাবার হাত ধরে গেছলাম স্কুলে। ঢোকার আগে জিজ্ঞেস করেছিলাম বাবাকে, কত বড় স্কুল বাবা? কেমন দেখতে? ক্লাসে ঢুকতেই আমাকে নিয়ে সোরগোল। অনেকে এগিয়ে এসে আমার নাম জিজ্ঞেস করেছে। দিদিমণি আমার হাত ধরে বেঞ্চিতে বসিয়ে দিলেন। একটাই দুঃখ ছিল সেদিন, সবাই আমায় দেখছে আমি কিন্তু কাউকে দেখছি না।

অনেকের ভয় ছিল স্কুলে চলাফেরা করতে গিয়ে ও হয়তো দুর্ঘটনায় পড়বে। কিন্তু তা হয়নি। কয়েক দিনেই মণিকা ওর নিজস্ব জায়গাটুকু অনুভব করেছে। বুঝে নিয়েছে ক্লাশরুম, সিঁড়ির ধাপ, বাথ-রুম। বাড়ি আসা যাওয়ায় সাহায্য করেছে জনৈক মহিলা।

ব্রেইল স্লেটে কাগজ বসিয়ে দিদিমণি-দের পড়ানো নোট করেছে মণিকা, প্রথম প্রথম অন্য ছাত্রীদের কাছে মণিকা বিস্ময়ের ছাত্রীই ছিল। স্লেটের কাগজের উল্টো পিঠে ফুটে ওঠা 'ডটে'র ওঠানামা হাত দিয়ে অনুভব করে প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছে।

ক্লাসে আলাদা কোন পাঠ্য বই ছিল না মণিকার। বাড়তি কাজ একটাই। পাঠ্য পুস্তকের কোন অংশ এবং প্রশ্নোত্তরগুলি কেউ বলে যেত ও-সেগুলি ব্রেইল স্লেটে লিখে নিত।

চতুর্থ শ্রেণীর হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় নিয়মমাফিক পরীক্ষা দিয়েছে মণিকা। 'রাইটার' নিয়ে। 'রাইটার' অর্থ ওকে যে লেখায় সাহায্য করবে। যাকে এক ক্লাস সিনিয়র হতে হবে। ক্লাস ফোরের বার্ষিক পরীক্ষা ভাল হয়নি মণিকার। পরীক্ষার আগেই ও অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরের বার ক্লাস ফাইভে সব বিষয়েই ভাল নম্বর পেয়েছিল।

এইভাবে বছর গড়ায়। লেখাপড়ার ফাঁকে গানের তালিমও চলে। দশ বছর বয়সে রবীন্দ্রসংগীতে হাতেখড়ি হয়েছিল শিল্পী দেবদাস মণ্ডলের কাছে। তখন

থেকেই চর্চা চলেছে।

মণিকা বলেছে, উঁচু ক্লাসে পড়াশোনার সময় বাড়াতে হয়েছে অনেক। যেটুকু সময় পাই গান শিখি। আক্ষেপ করেছে ও, আমাদের পড়াশোনার জন্য 'ব্রেইলস' বইয়ের খুব অভাব। সব ক্লাসের বই পাওয়া যায় না, খুব কষ্ট হয় মোটা মোটা বই শুনে লিখতে গিয়ে। অনেকটা সময় চলে যায়, পড়ব কখন ?

মাধ্যমিকের বিভিন্ন বিষয়ে 'ব্রেইল' বই না থাকার জন্য অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে ওকে। দৈনিক সাত-আট ঘণ্টা লেখার পর তারপর মুখস্ত করা।

মাধ্যমিকের প্রথম দিন, ওর কথায়, ভাবলেই গা শির শির করে। যদি ভাল রেজাল্ট না হয়, উত্তর যদি গুলিয়ে যায় তবে.....

পরীক্ষার পর লম্বা ছুটিতে মনের আনন্দে গান গেয়েছে মণিকা, বাবার হাত ধরে কলকাতার গানের স্কুলে গেছে ছুটির দিন। বিরাশী সালের জুলাই মাসে গানের ফোর্থ ইয়ারের পরীক্ষা। তৈরি হতেই হবে।

ছুটির আগেজে কবিতাও লিখেছে খান-কয়েক। ছেলেবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। ওনার আসন মণিকার কাছে সবার চেয়ে উঁচুতে। 'কত বড় মানুষ উনি।'

শুধুই কি পাঠ্য বই ? ঘাড় নেড়েছে মণিকা, উঁহু। দেশ বিদেশের গল্প, বিজ্ঞান কথা, ইতিহাস শোনার ঝোঁক খুব। পড়ে শোনান মা কিংবা বাবা। রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত কিংবা ভাল বাঙলা নাটক হলে কান পেতে শোনে।

সকাল-দুপুর-সন্ধে ঠিক ঠিক বুঝতে পারে মণিকা। কখন কুয়াশা, রোদ্দুর উঠল কিংবা চাঁদের জোছনা অনুভব করতে পারে ও। কিভাবে ? মুচকি হেসে জবাব দিয়েছে, সবটাই অনুভূতি। এর বেশি কিছু জানি না।

মাধ্যমিকের ফল ঘোষণার দিনটি দু-চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। বাবা-মা-ভাই আত্মীয়-পরিজন সবাই খুশী। আনন্দে আত্মহারা মণিকাও। মনে হয়েছে পুরন কথা, এদিন যদি একটিবারের জন্য সবাইকে দেখা যেত। এ ইচ্ছাকে মনে বেশিক্ষণ পুষে রাখতে ইচ্ছুক নয় ও। সামনে যে অনেকখানি রাস্তা। বড় হতে হবে। গ্র্যাজুয়েট হবার পর আরও উঁচু ক্লাস। পাশাপাশি গান।

কৃষ্ণভাগিনী নারী মন্দিরে এগার ক্লাসে ভর্তি হয়েছে মণিকা। নতুন পাঠ্য বইগুলো লেখার কাজ শুরু না করলে দেরি হয়ে যাবে। বেশি বিশ্রাম নয়। মণিকারও সেই মত, দৃষ্টিহীন ছাত্রীরা এগিয়ে আসুক চোখ নেই তো কি হয়েছে। বোঝার-বোঝানর কায়দা ত শেখা যাবে। সেটাই কি কম পাওয়া ?

দৃষ্টিহীন ছাত্রীদের কাছে আজকের মণিকা চিরকালের প্রেরণা হয়ে রইল।

লোহিত সাগরের জল লাল

অনেকের ধারণা লোহিত সাগরের জলের রঙ বুঝি লাল। আসলে কিন্তু তা নয়, নামেই লোহিত সাগর। জলের রঙ অন্য সাগরের মতই নীলাভ। আসলে এ সাগরের জলে 'অ্যালগি' নামে এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ অনবরত ভেসে বেড়ায়। দূর থেকে তার রঙকে লাল দেখায়। এছাড়া জলের তলায় প্রবাল কীটেরা বাসা বেঁধে এক একটি ঢিবি তৈরি করে। যেগুলোর রঙ লাল। তারই ছায়া পড়ে সাগরের জলে। দুয়ের মিশ্রণে সাগরের জলের রঙ পালটে যায়।

তুমি কী হতে চাও

কমার্শিয়াল আর্টের জগতে সুধীর মৈত্র একটি বিশিষ্ট নাম। বিজ্ঞাপনের ছবি, গল্প উপন্যাসের ছবি, বইয়ের প্রচ্ছদপট অঙ্কনে তিনি প্রথম সারির শিল্পী। এক সময় আর্ট কলেজের অধ্যাপনা করেছেন, বর্তমানে স্টেটসম্যান-এর শিল্প ও প্রচার দপ্তরের বিভাগীয় প্রধান।

গল্পটা মোটামুটি সব শিল্পীর ক্ষেত্রেই এক। স্কুলে পড়ার সময় একটু আধটু ছবি আঁকা। ড্রইং সার থেকে শুরু করে বন্ধু বান্ধব বা দু একজন গুরুজনেরও প্রশংসা পাওয়া। কিন্তু বড়রা কেউই চান না ছোটরা পড়াশোনায় অবহেলা করে ছবি আঁকুক। কিন্তু গান গাইতে জানলে যেমন আপনিই গলায় সুর আসে, ছবি আঁকতে জানলে পেন্সিল কলমে টানা রেখায় তেমনি ছন্দ আসে। সব মিলিয়ে ছবি হয়ে যায়। তাই জটিল অঙ্কের পাশে হয়ত আঁকা হয়ে যায় একটা মেয়ে আইসক্রীম খাচ্ছে বা

ছেলের দল ফুটবল খেলছে। সেগুলো আবার যত্ন করে গোপন করতে হয়।

এইভাবে ছবি আঁকতে আঁকতেই স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ঢোকার সময় এসে যায়। আর তখনই অনেকে ঠিক করে বি এ, এম এ পাশ না করে ছবি আঁকার কলেজে ভর্তি হব। ভবিষ্যতে না হয় এটাকেই পেশা হিসাবে নেওয়া যাবে। সুধীর মৈত্র-র ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে ভর্তি হবার ঘটনাটাও অনেকটা এরকম। তবে আঁকার কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে বাড়ির গুরুজনেরা অনেকেই আপত্তি করেছিলেন। ছবি-টবি এঁকে কি আর পেট ভরবে?

সুধীর মৈত্র-র পরিচয় তোমাদের হয়তো পুরোপুরি না-ও জানা থাকতে পারে। পরিচয় দেবার আগে একটু অন্য আলোচনা সেরে নিই। চিত্র শিল্পীদের এক ধরনের কাজ আছে যাকে ফলিত শিল্প বা এ্যাপ্লায়েড আর্ট বলে; বাণিজ্যিক শিল্প বা কমার্শিয়াল আর্ট নামে যে কথাটা চালু আছে, সেটা ঐ একই বিষয়। মোট কথা শুধু ছবি আঁকার আনন্দেই ছবি আঁকা নয়, শিল্পের সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নিতান্ত কাজের জিনিস-গুলোকে মনোহর করে তোলা হয়। শিল্পের সেই কাজটাই বাণিজ্যিক শিল্প বা সঠিক অর্থে ফলিত শিল্প। যেমন ধর সাবান, ওষুধ, টুথপেস্ট, জামার প্যাকেট এসব মোড়কগুলোকে আকর্ষণীয় করার কাজ, সেটা কমার্শিয়াল আর্টিস্টের কাজ। বলতে গেলে এখন চোখ মেললেই বিজ্ঞাপন। আর বিজ্ঞাপন মানেই শিল্পীদের বিস্তর কাজ। অনেক কিছুর ভিড় থেকে আলাদা করে চোখে পড়ার মত কিছু কাজ করার চেষ্টায় শিল্পীরা সব সময়ই মাথা ঘামাচ্ছেন। কোন পণ্যদ্রব্য জনপ্রিয় করার জন্য বিজ্ঞাপনের ভূমিকা বিরাট। আর সে কাজটা সুষ্ঠুভাবে করতে শিল্পী ও বিজ্ঞাপন লিখিয়েদের দায়িত্ব অনেক। এসব ছাড়াও আছে, কোথাও কোন বিরাট প্রদর্শনী হচ্ছে, বাঁশ ত্রিপলের সাদামাটা মণ্ডপ দর্শকদের টানবে কেন! তখনই শিল্পীদের ডাক পড়ে, ভেবে চিন্তে মণ্ডপ সাজান তারা। আর আছে গল্প উপন্যাসের সঙ্গে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা, বইয়ের মলাট আঁকা।

এই ফলিত শিল্পের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি সুধীর মৈত্র। বিজ্ঞাপনের কাজ, গল্প উপন্যাসের ছবি আঁকার কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত। বর্তমানে স্টেটসম্যান পত্রিকার শিল্প ও প্রচার বিভাগের প্রধান। বাইরের অন্য ছবি আঁকার কাজ ত রয়েইছে।

সুধীরবাবু ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বেরোন ১৯৫০ সালে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে। তাঁর ইচ্ছে ছিল ইলাসট্রেটর হবেন, অর্থাৎ গল্প উপন্যাসের ছবি আঁকবেন, বইয়ের প্রচ্ছদপট আঁকবেন। সে সময় খুব নামকরা ইলাসট্রেটর প্রতুল ব্যানার্জি, শৈল চক্রবর্তী, কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, মাখন দত্তগুপ্ত, রণেনআয়ন দত্ত প্রমুখ। তাঁদেরই উত্তরসূরি হিসাবে কাজে নামলেন সুধীর মৈত্র। নানা পত্র-পত্রিকায় অসাধারণ সব ছবি আঁকলেন। খুব নাম ডাক হল। সে সূত্রেই স্টেটসম্যান পত্রিকায় শিল্প ও প্রচার বিভাগে কাজের ডাক পেলেন। মাঝে অবশ্য বছর সাতেক ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে শিক্ষকতা করেছেন।

সুধীরবাবু বললেন, 'আমরা যখন এ পেশায় আসব বলে ঠিক করেছিলাম, তখন সুযোগ অনেকটা কম ছিল। কিন্তু এই প্রায় বছর ত্রিশেকের ব্যবধানে অনেক কিছুই বদলে গেছে। মনোমত কাজ হয়ত সবার

ভাগ্যে জোটেনা, কিন্তু আর্ট কলেজ থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে বেরোলে কাজ নিয়মিত বা অনিয়মিত ঠিকই জুটে যায়।'

'অবশ্য একটা কথা, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়র ইত্যাদি পেশার মত পাশ করে বেরোলে মোটামুটি একটা রোজগারের রাস্তা খোলা থাকবেই, এমন কিন্তু নয়। সঙ্গে যোগ্যতার বিষয়টাও আছে। আর্ট কলেজগুলো শেখায় ছবি আঁকার নিয়মকানুন, কিছু ব্যাকরণ, কিছু টেকনিক বা প্রকরণ। আর পরিচিত করিয়ে দেয় পূর্ববর্তী শিল্পীদের ছবি আঁকার ধরনের সঙ্গে। এটা বলা যায় শিল্পরাজ্যে প্রবেশের একটা চাবিকাঠি মাত্র। শিল্পী শিল্পের বিরাট অন্দর মহলে কীভাবে প্রবেশ করবেন বা কতটা প্রবেশ করবেন, সেটা শিল্পীর যোগ্যতা, একাগ্রতা, অধ্যবসায়ের ওপর নির্ভর করে।

'সাহিত্যিক হওয়ার কি কোন সঠিক শিক্ষাক্রম আছে? কাউকে কি বলে দেওয়া যায়, এইভাবে চললে তুমি তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণ হবে। ছবি আঁকার ক্ষেত্রেও তাই, খানিকটা ভেতরকার প্রেরণা না থাকলে কাজ করা মুশকিল। অনেকে খুব আগ্রহ নিয়ে ছবি আঁকার কলেজে ভর্তি হয়ে, হয়ত সেকেণ্ড কি থার্ড ইয়ারে কলেজ ছেড়ে চলে যায়। মানে, তারা যে ধারণা নিয়ে ছবি আঁকা শিখতে এসেছিল, তার সঙ্গে বাস্তবের মিল ঘটেনি।'

স্কুলের পরীক্ষা শেষ করে আঁকার কলেজে ভর্তি হতে হয়। কলকাতায় তিনটি প্রতিষ্ঠান আছে, চৌরঙ্গীতে গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজ, ধর্মতলা স্ট্রিটে ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ আর একটি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রথমে এ্যাডমিসন টেস্টে বসতে হয়। সে সময় বয়সটা কুড়ি বছরের নিচে থাকা প্রয়োজন। প্রথম দু বছর প্রাথমিক শিক্ষা তারপর তিন বছর যে যা লাইনে যায়। তবে যেহেতু রোজগারের পথটা সুগম — বাণিজ্যিক শিল্পের দিকেই ছাত্র-ছাত্রীদের ঝোঁক বেশি।

আর্ট কলেজে পড়ার খরচ কেমন? মাইনেটা বেশি নয়। কিন্তু শিখতে গেলে রং তুলি, কাগজ, পেন্সিল, ক্যানভাস ইত্যাদির খরচ অনেক। এ সবের দাম দিন দিনই বাড়ছে। প্রথম দু বছর মাসে শ খানেক টাকা লাগে, পরের তিন বছর এ খরচটা বেড়ে দ্বিগুণের বেশি হয়ে যায়। একটা সাধারণ তুলির দামই গোটা পঁচিশেক টাকা।

দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের যত প্রসার হচ্ছে, কমার্শিয়াল আর্টিস্টদের চাহিদা তত বাড়ছে। এই পেশায় আরো বেশি নতুন নতুন ছেলেমেয়ে আসছে। পেশার ক্ষেত্র যত প্রসারিত হচ্ছে, প্রতিযোগিতাটাও বাড়ছে। প্রতি মুহূর্তেই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হচ্ছে। যাদের ছবি আঁকায় আগ্রহ আছে, চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ক্ষমতা আছে, তারা এখন থেকেই উদ্যোগী হতে পার।

সাক্ষাৎকার ঃ
অশোক চট্টোপাধ্যায়

ছবি ঃ অচিন্ত্য হাজরা

গতির জগতে মানুষ

শতঞ্জীব রাহা

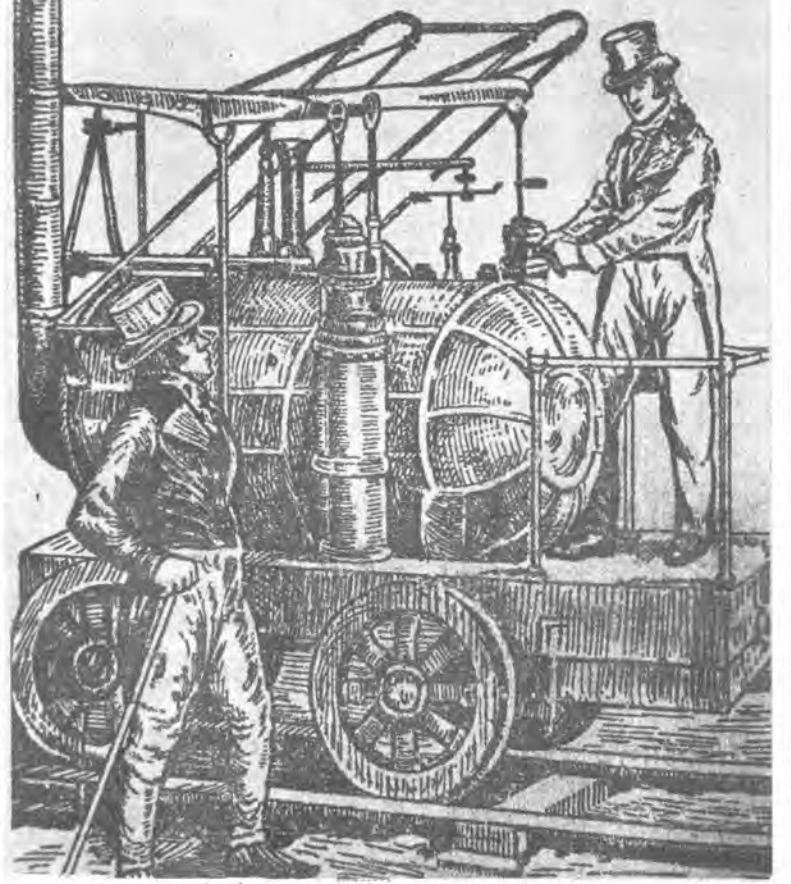

জর্জ স্টিফেনসন কর্তৃক আবিষ্কৃত রেল এঞ্জিন

মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার দুটি : —আগুন ও চাকার আবিষ্কার। আগুন মানুষকে দিয়েছিল শক্তি আর চাকা দিয়েছিল গতি। আধুনিক সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উন্নতিতে চাকার ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াতের জন্য চক্রযুক্ত যানের ব্যবহার মানুষ করে আসছে অতি প্রাচীনকাল থেকে। যে গতিবেগ মানুষ চাকার মধ্যে পেয়েছিল, তা মানবসভ্যতার চিরন্তন ও প্রতীক সত্যে পরিণত হয়েছে। এই চাকার সাহায্যে মানুষ জয় করেছে সমস্ত পৃথিবী। চাকা বা হুইলের ব্যবহার ছাড়া বড় বড় জটিল

ক্যারিওট : খ্রিঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মেসোপটেমিয়ার পশুতে টানা গাড়ি

যন্ত্রের মসৃণ নিখুঁত গতি কি কল্পনা করা যায় !

যানবাহনের প্রাচীন যুগ

স্বভাবতই তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগছে, মানব সভ্যতার এমন যুগান্তকারী ঘটনা, চাকা আবিষ্কার হয়েছিল কবে ? আগুনের মতই চাকা আবিষ্কারের দিনক্ষণও জানা যায় না। তবে তা যে মানব ইতিহাসের আদিকালেই তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচীনকালেই যাযাবর মানুষ চাকার ব্যবহার জানত। সাধারণভাবে সেসময় কাঠের গাড়ি ব্যবহৃত হত। টানত—মানুষ ও বা বিভিন্ন গৃহপালিত পশু। বিশেষভাবে ঘোড়া, কুকুর, ছাগল বা উট। প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরোন সিন্ধুসভ্যতার মানুষও চাকার ব্যবহার জানত। অনুমান করা যায়, শকটের ব্যবহারও তারা করত। রামায়ণ বা মহাভারতের মত প্রাচীন কাব্যে, গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াড, ওডিসিতে নানান ধরনের ঘোড়ায় টানা রথের বিবরণ আছে। দেবর্ষি নারদ নাকি ঢেঁকিতে চড়ে উড়ে বেড়াতেন, আর রামায়ণে উল্লেখ আছে—রাবণের পুষ্পক রথের, এই রথ নাকি আকাশ-পথে ছুটত। তাই আধুনিককালে কেউ কেউ মনে করেন, তখনও , মানুষ শূন্যপথে উড়ে বেড়াবার মত যান আবিষ্কার করেছিল, আবার কেউ কেউ বলেন, না, পুষ্পক রথের ব্যাপারটা নিছকই কবির কল্পনা।

মানুষ নিজের যাতায়াত এবং মাল-বহনের সুবিধার জন্য কত ধরনের যান যে ব্যবহার করেছে ও করছে তার ইয়ত্তা নেই।

যীশুখ্রিস্টের জন্মেরও আগের লেখা শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে নায়িকা বসন্ত-সেনার গো-যান যাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়। জলপথে নানান ধরনের যানের ব্যবহারও মানুষ করে আসছে আদিকাল থেকেই। এসব যানবাহনের মধ্যে ছিল নৌকা, ভেলা, বজরা ইত্যাদি। নৌকা বা জাহাজই-বা কত ধরনের ! সাধারণ প্রয়োজনের জন্য একরকম, যুদ্ধের সময় অন্যরকম। রামায়ণে নৌকাযাত্রার বর্ণনা আছে। গ্রীসের বীররা ট্রয়ে গিয়েছিলেন নৌকাতেই। গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, নৌকা ইত্যাদি কাঠের যানের আদিযুগে পালকি, চতুর্দোলা, ডুলি ইত্যাদির ব্যবহার ব্যাপক ছিল। লক্ষ্য কর এইসব যানের সবই পশুশক্তি-চালিত বা

মনুষ্যচালিত। অবশ্য দেশ, কাল ও সুবিধা-অসুবিধা ভেদে যানবাহনের ধরনের তারতম্য ছিল ও আছে। নদীমাতৃক ও পল্লীসভ্যতার দেশ বাঙলায় জলে প্রধান বাহন ছিল নৌকা এবং গ্রামের কাঁচা রাস্তায় চলার উপযোগী গরুর গাড়ি। তেমনি ইউরোপে বহুদেশে নৌকার বদলে বয়া নামের এক ধরনের গোলাকার নৌকার প্রচলন আছে আবার বরফের দেশের প্রধান যান স্লেজ গাড়ি। দেশে দেশে নৌকার এবং প্রাচীনকালে যুদ্ধে ব্যবহৃত জলযানের কত বৈচিত্র্য।

বাষ্পশক্তি ঃ যানবাহনে আধুনিকতার সূত্রপাত

বাষ্পশক্তি আবিষ্কৃত হওয়ার পর যানবাহনের জগতে নতুন যুগের সূত্রপাত হল। ১৭১২ সালে নিউকোমেন নামে ব্রিটেনের একজন সন্ধানী স্টিম বা বাষ্পশক্তি নিয়ে নানান পরীক্ষা চালান, কিন্তু কার্যকর-ভাবে বাষ্পের অমিত শক্তি আবিষ্কার করলেন জেমস ওয়াট। এই শক্তি যেমন কলকারখানায় ব্যবহৃত হল, তেমনই যানবাহন ও গতির জগতে মানুষের ক্ষমতাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করল। ১৮১৪ সালে স্টিফেনসন আবিষ্কার করলেন রেল এঞ্জিন। বাষ্পের সাহায্যে জলপথে চলল বড় বড় স্টিমার ও জাহাজ, স্থলপথে চলল রেলগাড়ি। মানুষের পথযাত্রার শ্রম, সময় ও নিরাপত্তার অভাব অনেক কমে গেল, দূর হল নিকট, অর্থ-নৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগা-যোগ গেল বেড়ে। বাষ্পচালিত নৌকা কার্যকরভাবে উদ্ভাবন করেছিলেন বৃটেনের সিমিংটন। পরে এজাতীয় নৌকাকে আরও উন্নত করলেন আমেরিকার ফালটন। বাষ্পচালিত পূর্ণাঙ্গ জাহাজটি তৈরী হয়েছিল ব্রিটেনে, নাম ছিল 'গ্রেটব্রিটেন।'

যানবাহনের আধুনিকতা

বিদ্যুৎশক্তি আবির্ভাব গতির জগতে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। যদিও তার আগেই যানবাহনের ক্ষেত্রে অন্য কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনার একটি হল বলবেয়ারিং আবিষ্কার। বলবেয়ারিং কতকগুলি ক্ষুদ্র ও মসৃণ বলের সমষ্টি। ১৭৯৪ সালে ভ্যানসুহান বলবেয়ারিং আবিষ্কার করেন। বস্তুত বলবেয়ারিং চাকাকে মসৃণভাবে ঘোরাবার ব্যাপারে খুবই উপযোগী। ১৮১১ সালে ম্যাকাডাম পিচঢালা রাস্তা তৈরির উপায় উদ্ভাবন করলেন। এর ফলে পথঘাটের আশ্চর্য-রকম উন্নতি হল। ১৮৫৫ সালে Michans বাই-সাইকেল আবিষ্কার করেন। ১৮৮৪ সালে আধুনিক বাই-সাইকেল

নিউটনের তৃতীয় নিয়ম প্রমাণ করবার জন্য এই বাষ্পীয় এঞ্জিনটি তৈরি করা হয়

আবিষ্কার করেন ব্রিটেনের স্টারলে। বাই-সাইকেলকে আরও উন্নত করলেন আমেরিকার পোপ ১৮৯৬ সালে। তার আগেই ১৮৮৯ সালে ডানলপ টায়ার আবিষ্কার করেছিলেন।

১৮৯১ সালে Dureya মোটর গাড়ি আবিষ্কার করলেন। যানবাহনের জগতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংযোজিত হল। যদিও তার আগেই ১৮৮৫ সালেই জার্মানীর Daimler মোটর সাইকেল আবিষ্কার করেছিলেন। এইসব আবিষ্কার বাষ্পের একছত্র আধিপত্যকে কমিয়েছিল। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ যে মানুষ যানবাহনের ক্ষেত্রে গতিকে ক্রমশঃ বাড়িয়ে চলেছে নতুন নতুন উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু শুধুমাত্র চলতে জানলেই তো হবে না থামতেও শেখা চাই। গতি যেমনি সত্য, তেমনি গতিকে নিয়ন্ত্রণ করাটাও মানুষের অন্যতম কাজ। তাই ১৮৬৮ সালে আমেরিকার ওয়েস্টিংহাউজ উদ্ভাবন করেছিলেন 'এয়ারব্রেক।' গতিকে প্রয়োজন মত ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বেনজ্ ১৮৮৫ সালে আবিষ্কার করেছিলেন 'অটোমোবাইল ডিফারেন্সিয়াল গীয়ার।'

অন্তরীক্ষ জয়

এত গেল জল ও স্থলের কথা।

মানুষ কিন্তু জলে ও স্থলে তার গতিকে বিস্তৃত করেই ক্ষান্ত থাকেনি, আকাশপথে দ্রুত চলাচলের পন্থাও আবিষ্কার করেছে। ১৯০৩ সালে আমেরিকার রাইট ব্রাদার্স আবিষ্কার করলেন উড়োজাহাজ। ব্রিটেনের হোয়াইটলে আবার ১৯৩০ সালে জেট এঞ্জিন আবিষ্কার করে উড়োজাহাজের গতিকে দিলেন বাড়িয়ে। কিন্তু এতেই কি মানুষ সন্তুষ্ট থাকল? মোটেই না; পৃথিবী ছাড়িয়ে গ্রহলোকে পাড়ি দেওয়ার জন্য রকেট, স্পুটনিক ও অন্যান্য মহাকাশ-যান আবিষ্কৃত হয়েছে। একদিন যে চাঁদ বা দূরের গ্রহ নিতান্তই কল্পনার ব্যাপার ছিল, তা আজ মানুষের নাগালের মধ্যে।

তবু...

মানুষ দ্রুতগামী মহাকাশযানে চড়ে চাঁদে পদচিহ্ন এঁকে দিয়েছে, সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজে করে সমুদ্রের তলাকার অসীম রহস্য জানতে চেয়েছে, তবু পশু বা মানুষে টানা যানবাহনের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। এই খোদ কলকাতা শহরেই এখনও ঘোড়ার গাড়ি চলে, মালবোঝাই ঠেলাগাড়ি বা মানুষে টানা রিক্সা ঘর ঘর শব্দে আসে যায়। অন্যদিকে যানবাহনের উন্নতি নিয়ে পরীক্ষারও অন্ত নেই। ইউরোপের

সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত খেলনা গাড়ি

শিল্প-বিপ্লবের ফলে যানবাহন ব্যবস্থার যেমনি উন্নতি হয়েছিল, দুটি বিশ্বযুদ্ধও তেমনি গতিময় বোমারু বিমান, রকেট বোমা ইত্যাদির উদ্ভাবনে সাহায্য করেছে। মানুষ তার গতিকে যেমন কল্যাণের কাজে ব্যবহার করেছে, তেমনি ব্যবহার করেছে ধ্বংসের কাজেও। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষারও কোন অন্ত নেই। জল দিয়ে, চাকাবিহীন মোটর গাড়ি চালানর কথা শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে উড়ন্ত ট্রেনের কথা। গরুর গাড়ির যুগকে আমরা বিদায় দিইনি, আবার মহাকাশ অভিযানেও কুণ্ঠিত নই। বস্তুত, যানবাহনের বিবর্তনের ইতিহাস যেমন দীর্ঘ, তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। □

নিখিল মানব নন্দনে : কালীপদ মণ্ডল বল্মীক প্রকাশন। ৫৭ এফ গরচা রোড়। কলিঃ-১৯।

কিশোর নাট্যগুচ্ছ : দীননাথ সেন। বল্মীক প্রকাশন। ৫৭ এফ গরচা রোড। কলিঃ-১৯।

বল্মীক প্রকাশনের গ্রন্থ দুটি প্রথম দর্শনেই মন কেড়ে নেয়। মাত্র দুই রঙ্-এর প্রচ্ছদ। কিন্তু পরিকল্পনাগুণে যেমন ছিমছাম তেমন আকর্ষণীয় হয়েছে। শিল্পী দীননাথ সেন মশাইকে এজন্য আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

প্রথম গ্রন্থ আসলে এগারজন বাঙালী মণীষীর জীবন-কথা। লেখক কালীপদ মণ্ডল মহৎ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই জীবন কথাগুলো সংকলন করেছেন।. তিনি 'নিবেদনে' জানিয়েছেন, 'সেই সব বিস্মৃত অতীতের আলোছায়ায় যে অনবদ্য কথাচিত্র আঁকা যেত তা আজ প্রায় অসম্ভব। তবু নানা সূত্রে যেটুকু সংগ্রহ করা গেছে তাই দিয়ে আমি সাধ্যমত সাজিয়েছি আমার জীবন-গল্প-মালার ডালি। আমাদের শিশু ও কিশোরেরা পূর্ব পুরুষের জীবন কথা থেকে প্রেরণা লাভ করুক, মহত্তর জীবনের প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হোক।'

কালীপদবাবুর এই ইচ্ছাকে আমরা স্বাগত জানাই। স্বাধীন দেশের কিশোর-কিশোরীদের স্বজাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করানর দায়িত্ব বর্তমানকালের কিশোর সাহিত্যের সাহিত্যিকদেরই নেওয়া উচিত। আর একখানা ভৌতিক গল্প বা রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের পরিকল্পনায় না মেতে তিনি যে এমন একটা বিষয়ে হাত দিয়েছেন, আমাদের অভিনন্দন এ জন্যই।

তবে মণীষা কতখানি জন্মগত আর কতখানি চেষ্টার্জিত সে তর্কে না গিয়েও বলা যেতে পারে যে, দৈব - নির্দিষ্ট শক্তির অধিকার নিয়ে শিশু জন্মাল এবং জীবন-যাত্রার ভিতর দিয়ে দেশ ও স্বকালকে প্রভাবিত করল—জীবনী রচনার এ ধারা কিশোর মনের বৃদ্ধির অনুকূল নয়। এতে পাঠকের মনে হীনমন্যতার জন্ম ঘটতে পারে। বরং কী প্রচেষ্টা, অধ্যাবসায় এবং নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে ঐ ক্ষুদ্র শিশু অসামান্য হয়ে উঠল, অর্থাৎ

তাঁর জীবন ও মানস সংগ্রামটিই যদি কাহিনীতে বড় হয়ে ওঠে, তবে তা অনেক বেশি প্রেরণার কারণ হয়ে উঠতে পারে। আমরা পরবর্তীকালে কালীপদবাবুর হাত থেকে এ জাতীয় রচনা আশা করব।

কালীপদবাবু স্থানে স্থানে ছোটেখাট অনবধানতা-জনিত বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন। যেমন রামমোহনের দাদু শৈব না বৈষ্ণব

এ সম্পর্কে পাঠকের ধাঁধা থেকে যায়। দু'টি শব্দই তিনি প্রয়োগ করেছেন। বিদ্যাসাগরের হেঁটে যাওয়ার ছবিতে বালক-বিদ্যাসাগর না যুবক-বিদ্যাসাগর তখন বিদ্যুতের তার বা টেলিগ্রাফের তার কি কলকাতার আকাশে দাগ কেটে ছিল ?

রচনাগুলো সাজাবার মধ্যে কোন কালানুক্রমিকতা কেন রাখা হয়নি তার কোন কারণ বোঝা গেল না। কালানুক্রমিক সজ্জার প্রয়োজন ছিল।

সামগ্রিকভাবে গ্রন্থটি খুশি হবার মত।

দ্বিতীয় গ্রন্থটি এক কথায় আমাদের খুশি করেছে। 'একটি ভুলের জন্য', 'ব্যাকরণ বিভ্রাট' 'বাঘরে বাঘ' এবং 'ডাঃ সর্ববিদ্যা' নামে চারটি নাটিকা এ গ্রন্থে একত্রে সংকলিত হয়েছে।

নাট্যকারের ভাষা সাবলীল এবং নাট্যগুণসমৃদ্ধ। তিনি সমগ্র প্রযোজিত রূপটি চোখের সামনে ধরে নাট্য রচনা করতে পারেন। নাট্যকারের আর একটি গুণ এই যে তিনি খুব সহজেই ফ্যাণ্টাসির রাজ্যকে প্রমূর্ত করে তুলতে পারেন।

যদিও প্রতিটি নাটিকাই বেশ সুলিখিত তবু 'বাঘরে বাঘ' নাটিকাটিই শ্রেষ্ঠ রচনা বলে ঘোষণা করা যায়। তিনি খাঁচার শিকগুলোকে জীবন্ত অভিনেতা রূপে উপস্থিত করে আধুনিকতম আঙ্গিকই শুধু প্রযুক্ত করেননি, নাটিকাটিকে গতিশীল ও প্রাণবন্তও করে তুলেছেন।

আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে স্বল্প খরচায় নাট্যচর্চার জন্য এ জাতীয় নাটিকা একান্ত প্রয়োজন। অথচ দৃশ্যপট, পোষাক, মুখোস ইত্যাদি সৃষ্টির মধ্যে কিশোর-প্রতিভার সৃজনশক্তির বিকাশের সুযোগও এ নাটিকাগুলিতে রয়েছে। এ জাতীয় নাটিকার যেমন প্রয়োজন, তেমনি অভাব। দীননাথবাবু এ অভাব পূরণের সামর্থ্য রাখেন। আমরা তাঁর কাছে এমন বহু বহু নাটিকা প্রত্যাশা করি।

তবে, আটান্ন পৃষ্ঠার এই নাট্যগুচ্ছের দাম আট টাকা স্থির করে প্রকাশক গ্রন্থটির বহুল প্রচারের পথ রুদ্ধ করেছেন। এ গ্রন্থের দাম এর অর্ধেক হওয়া উচিত ছিল।

বল্লীক প্রকাশন-এর নাম আমাদের কাছে অজানা ছিল। তাঁদের দুটি গ্রন্থই শোভন রুচি ও মুদ্রণ পারিপাট্যের পরিচয় বহন করে।

লোচন শর্মা

টেবল টেনিস ঃ সেকাল থেকে একাল

সন্দীপ দত্ত

টেবল টেনিস খেলাটির জন্মদাতা কে ? এই বিষয়ে একসময় প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা মত পোষণ করতেন। যেমন অস্ট্রেলিয়ানরা দাবি করেন—এই খেলাটির জন্ম হয়েছিল তাদের দেশে। ১৮৯৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিটিশ শাসিত কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জে এই খেলাটির উৎপত্তি। আবার ইংরেজদের দাবি- টেবল টেনিস খেলাটি তাদেরই সৃষ্টি।

যাইহোক খেলাটির জন্মস্থান এবং সৃষ্টিকর্তা কে এ নিয়ে সবরকম বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছেন বিশ্ব টেবল টেনিস সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি আইভর মণ্টেগু। তাঁর বক্তব্য ঃ টেবল টেনিস খেলাটির জন্ম ইংল্যাণ্ডে, ১৮৮০ সালে। সে সময় ইংরেজরা টেবল টেনিস খেলতেন নিছক সময় কাটানর জন্য। আইভর মণ্টেগুর এই বক্তব্য সকলেই মেনে নিয়েছেন।

স্পোর্টস এনসাইক্লোপিডিয়াতে টেবল টেনিস খেলাটির জন্ম এবং সৃষ্টিকর্তা কে এ ব্যাপারে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, এই খেলাটির জন্ম ইংল্যাণ্ডেই। ১৮৭৯ সালে ইংল্যাণ্ড অ্যামেচার অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা জেমসগিবই প্রথম এই খেলাটিকে মোটামুটি আধুনিক ঢঙে চালু করেন। পেশায় এঞ্জিনিয়ার জেমসই প্রথম দুটি ক্লাম্পের সাহায্যে টেবলের মাঝামাঝি স্থানে একটি দড়ি টাঙিয়ে খেলা শুরু করেন। এখন দড়ির পরিবর্তে যেখানে নেট লাগানো হয়। সে সময় টেবল টেনিসের কোনও রকম আইনকানুন ছিল না। গির পরিবারের প্রচলিত নিয়মেই ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র খেলা

টেবল টেনিসের প্রবাদপুরুষ হাঙ্গেরির ভিক্টর বার্ণা

হত। কোনও খেলোয়াড় বল মিস করলেই প্রতিপক্ষ পয়েন্ট পেয়ে যেতেন। এইভাবে যিনি প্রথম ২১ পয়েন্ট করতেন, তিনিই ম্যাচ জিততেন। খেলা হত ছোট রবারের বলে। এর কিছুদিন বাদে জেমস আমেরিকা যান এবং সেখান থেকে ফেরার সময় কয়েকটি সেলুলয়েডের বল নিয়ে আসেন। গোড়ায় জেমস যখন এই খেলাটি চালু করেন, তখন এর নাম ছিল 'গোসিমা'। সেলুলয়েডের বলে খেলা শুরু করায় জেমসের বন্ধুবান্ধবরা মজা করে খেলাটির নাম দেন পিং পং। ব্যাট ও বলের ছোঁয়া থেকে উদ্ভূত শব্দ শুনেই সম্ভবত জেমসের বন্ধুরা এধরনের নামকরণ করেছিলেন। বেশ কিছু দিন বাদে একটি খেলাধূলার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক সংস্থা এই খেলাটির প্রতি আগ্রহী হয়ে

ওঠেন। ফলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই খেলাটি ইংল্যাণ্ডে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এবং পিং পং খেলাটিকে প্রতিযোগিতামূলক করে তোলার ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের অনেকেই উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এই উৎসাহের ফসল হিসেবেই ১৯০২ সালে গড়ে ওঠে পিং পং অ্যাসোসিয়েশন। কিন্তু বাঁধাধরা নিয়মে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ব্যাপারটা উৎসাহী খেলোয়াড়দের কিছুদিনের মধ্যেই নিরুৎসাহ করে তোলে, এবং পরের কিছুদিন ইংরেজরা এই খেলাটির প্রতি সেরকম আগ্রহী ছিলেন না, অবশ্য পিং পংয়ের এই ঝিমিয়ে পড়া ভাবটা কেটে যেতে দু-বছরের বেশি সময় লাগেনি। এই সময় পার্সি ব্রোমফিল্ডের রবারে মোড়া ব্যাটে স্পিনের চমক দেখেই ইংরেজরা দ্বিগুণ উৎসাহে পিং পং খেলতে শুরু করেন। এর আগে সকলেই খেলতেন কাঠের তৈরি ব্যাটে। অবশ্য তখনও প্রায়ই নানারকম অসুবিধে দেখা দিত।

যাইহোক ১৯২৭ সালে পিং পং অ্যাসোসিয়েশন নামটা রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে দেখা গেল এই নামে ইংল্যাণ্ডে একটি রেজিস্টার্ড ব্যবসায়িক সংস্থা রয়েছে। অতএব সংস্থার নাম বদলাতে বাধ্য হলেন কর্মকর্তারা, এবং সেবছরই খেলাটির নাম পাল্টে টেবল টেনিস রাখলেন। পিং পং অ্যাসোসিয়েশনের নাম পাল্টে হল ইংল্যাণ্ড টেবল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন। সভাপতি হলেন আইভর মণ্টেগু। ইতিমধ্যে এই খেলাটি ইউরোপীয় দেশগুলোতেও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল (১৯২৭) ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। ইংরেজ শাসিত ভারতেও এই খেলাটি চালু হয়েছিল বহুদিন আগেই। ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি এবং ওয়েলসের সঙ্গে ভারতও এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ায় এই প্রতিযোগিতার নাম বদলে হল বিশ্ব টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ। একই বছরে আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশনের জন্ম হয়। বলাবাহুল্য সভাপতি নির্বাচিত হন আইভর মণ্টেগু। লেডি সোয়েথলিং পুরুষদের দলগত চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য একটি সুদৃশ্য ট্রফি দান করেন। আজও পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন দলকে সোয়েথলিং কাপ দেওয়া হয়। মহিলাদের দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ করবিলন কাপের খেলা শুরু হয় ১৯৩৪ সালে। এর আগে পর্যন্ত বিশ্ব টেবল টেনিসে হাঙ্গেরির একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। এই সময় বিশ্বের সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় হাঙ্গেরির ভিক্টর বার্না মোট পাঁচবার সিঙ্গলসে জয়ী হন (৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫)। উল্লেখ্য এই প্রতিযোগিতার প্রথম নয় বছরের মধ্যে হাঙ্গেরি দলগতভাবে মোট আটবার সোয়েথলিং কাপ জিতেছিল। মেয়েদের সিঙ্গলসে পরপর পাঁচবার জিতে রেকর্ড করেছিলেন (২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১) হাঙ্গেরিরই এম ডেডেনাইয়ানস্কি। কিন্তু ২৫ বছর বাদে রোমানিয়ার এ রোজিয়ানু পরপর ছয় বছর (৫০ থেকে ৫৫) সিঙ্গলস জিতে সে রেকর্ড ভেঙ্গে দেন। রোজিয়ানুর রেকর্ড এখনও অম্লান।

১৯৫৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরে একবার করে বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা হত। এখন দু'বছর পরপর বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতা হয়। উল্লেখ্য বিশ্ব টেবল টেনিস সংস্থা গড়ে তোলায় ভারত অন্যতম ভূমিকা নিয়েছিল। আর ভারতীয় টেবল টেনিসে বাংলা বরাবরই অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। ভারতে এ পর্যন্ত দুবার বিশ্ব টেবল টেনিস হয়েছে। প্রথম ১৯৫২ সালে বোম্বাইয়ে। দ্বিতীয়বার কলকাতায় ১৯৭৫ সালে। এবং কলকাতায় বিশ্ব টেবল টেনিসকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা আধুনিক স্টেডিয়াম নেতাজী ইন্‌ডোর স্টেডিয়াম।

এবং জবাব

পুলক দত্ত,
বুড়িখালি ক্ষেত্রমোহন স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়, হাওড়া।

...আমি আপনাদের 'নবম দশম' পাক্ষিকের একান্ত পাঠক, গ্রাহক নই। আমি হকার অথবা স্টল থেকে 'নবম দশম' সংগ্রহ করছি। আমি ১৯৮২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। যদিও আপনাদের হিসেবে এটি নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পাঠযোগ্য তবুও এটি আমাকে খুব খুশি করেছে।

আমার অনুরোধ যদি রাখেন তাহলে আমি আরও খুশি হব। আমার অনুরোধ পত্রিকাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়িয়ে ইংরেজি পদ্য পাঠ দিন।

আমার আরও একটি প্রশ্ন 'সন্ধানী প্রতিযোগিতা'র যদি আমি আংশিক উত্তর দিই তা কি গ্রাহ্য হবে? তা যদি আমাকে পত্রিকা মারফৎ জানান খুশি হব।

মৃন্ময় পাঁজা,
গারুলিয়া মিল হাইস্কুল,
চব্বিশ পরগণা

নবম দশম পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে সব সংখ্যাই আমি আগ্রহসহকারে পড়ছি এবং নিচ্ছি। পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে তারিফযোগ্য এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাদের গৃহ-শিক্ষক নেই বা গৃহশিক্ষকের সান্নিধ্য সব-সময় যারা পাচ্ছে না, তাদের কাছে এই বইটি খুবই প্রিয়। আমি নবম শ্রেণীতে পড়ি। তাই আমি এই পত্রিকা পেয়ে খুবই উপকৃত হয়েছি। কিন্তু আমি আপনাদের কাছে মাত্র দুটি অনুরোধ করছি, সেটা হল, প্রথমত পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬০ থেকে বাড়িয়ে ১৭৫ করতে এবং দ্বিতীয়ত প্রত্যেক সংখ্যাতেই 'পাটিগণিত' ও 'বীজগণিত' আরও ভাল করে আলোচনা করতে।

● তোমরা দু'জনেই পৃষ্ঠা বাড়াবার প্রস্তাব দিয়েছ। আসলে বই ত ১৭৫ কেন ২০০ পৃষ্ঠা করলে আরও ভাল হয়। কিন্তু বোঝ কি যে আজকের কাগজ, ছাপা এ সবের খরচ কেমন বেড়েছে! পৃষ্ঠা বাড়িয়ে দাম বাড়ানও যেমন সম্ভব নয়, দাম না বাড়িয়ে পৃষ্ঠা বাড়ানও তেমন সম্ভব নয়। কবিতা পাঠ থাকছে।

আসলে, কেন তোমরা পাতা বাড়াবার জন্য এত উদগ্রীব হয়ে উঠেছ? আমরা যেটুকু তোমাদের দিচ্ছি, প্রতি পক্ষে ঐটুকু পড়লেই শুধু পরীক্ষায় পাশ নয়—ভাল নম্বর পাবে। এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। এ ব্যাপারে আমাদের ওপর আস্থা রেখে মন দিয়ে পড়ে যাও।

আর পুলক, পাঠাও না আংশিক উত্তর। ক্ষতি কি! জান ত প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার মন্ত্র কি! Not to win but to take part.

কুমারী রিন্টু রায়,
শ্রীরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

...১ ফেব্রুয়ারি যে নবম-দশম সংখ্যাটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের লিখিত 'মস্তক বিক্রয়' কবিতাটির সম্পর্কে আপনারা আলোচনা করিয়াছেন। 'মস্তক-বিক্রয়' কবিতাটি 'কথা ও কাহিনীতে' রহিয়াছে। আমাদের স্কুলে 'কথা ও কাহিনী' বইটি পাঠ্য নয়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কবিতা সংকলন নামক বইটি পাঠ্য। 'মস্তক বিক্রয়' কবিতাটি উহাতে নাই। এখন প্রশ্ন হইল 'মস্তক বিক্রয়' কবিতাটি কি নবম শ্রেণীর সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত? যদি হয় তাহা হইলে আমি এখন কি করিব?

● তুমি অকারণেই বিব্রত হয়েছ। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ দুখানা উপপাঠ্য রেখেছে যার থেকে একটি মাত্র তোমাকে পড়তে হবে। অর্থাৎ তুমি হয় 'কথা ও কাহিনী' নতুবা 'কবিতা-সংকলন' পড়বে। আমরা প্রত্যেক সংখ্যায় দুটি গ্রন্থ থেকেই কিছু আলোচনা রাখছি। ঐ সংখ্যাতে 'মস্তক-বিক্রয়ে'র পরেই 'অশোকতরু' সম্পর্কে যে আলোচনা, তাই তোমার পাঠ্য। 'কথা ও কাহিনী' তোমার জন্য নয়।

তোমাকে কবিতা-সংকলন থেকে নিচের কবিতাগুলো নবম শ্রেণীতে পড়তে হবে এবং তারকা চিহ্নিত কবিতাগুলো মুখস্থ করতে হবে।

*ভারত বিলাপ, ধাত্রী পান্না, অশোক-তরু, *দুর্ভাগা দেশ, *তা বটেই ত তা বটেই ত, সুখ, মা (রজনীকান্ত সেন), *সাগর তর্পণ ডাক হরকরা, রথযাত্রা, সীতা ও সরমা, কীর্তিনাশা, *অশোক, *ওরা কাজ করে, শারদীয় বোধন, *সিংহগড়, আবছায়ায়, গদ্য ও পদ্য, চাঁদ সদাগর, *ছাত্র দলের গান।

মোহঃ আবুবক্কার সেখ,
বেলডাঙ্গা সি আর জি এস হাইস্কুল,
মুর্শিদাবাদ।

…আমরা একটি পত্রিকাই চাই না, যদি না দশম শ্রেণীর জন্য আর একটি পত্রিকার ব্যবস্থা নেন। এই অতুলনীয় ভাবভাষা নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা আশা না করেও যদি পেতে পারে, তাহলে আমরা দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা অনুরোধ করেও কি কোন দিনই পাব না?

● ভাই আবুবক্কার। তোমার আকুল কথাগুলো আমাদের মনকে একান্ত নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। আমরা জানতাম যে ছাত্র-ছাত্রীদের এ জাতীয় পত্রিকার চাহিদা আছে। এই চাহিদাই ত চাওয়া। নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা ব্যক্তিগতভাবে বলেনি। কিন্তু তাদের নীরব আকুতি আমাদের প্রাণে নাড়া দিয়েছিল—এবং তার ফলেই আমরা এ পত্রিকা প্রকাশ করি।

দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না, এ বিষয়েও আমরা কম ভাবিনি। তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করতে গেলে এক বছরে দু'ক্লাসের পাঠ্যসূচী শেষ করতে হত। আমাদের সামর্থ্যে অত বড় দায় বইবার ক্ষমতা ছিল না ভাই।

টি রহমান,
গ্রীণ ভিউ, কলকাতা-১৭।

● আপনার পত্রের জন্য ধন্যবাদ।

আপনি যদি নবম দশম ভাল করে দেখে থাকেন, তবে বুঝবেন এই পত্রিকায় I.C.S.E.-র পাঠ্যসূচী নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক: অরুণকুমার পাল কর্তৃক ইত্যাদি প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৩, ফোন ২৪-৭৭২০ থেকে মুদ্রিত ও ইত্যাদি প্রকাশনী (প্রাঃ) লিমিটেড, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২, ফোন ২৭-৩৩১৬ থেকে প্রকাশিত।

কোন্ খেলার খবর তোমরা জানতে চাও ?

ফুটবলের, ক্রিকেটের, ব্যাডমিণ্টনের, হকির, সাঁতারের, অ্যাথলেটিক্সের, না জিমন্যাস্টিক্সের, কিংবা কবাডি, খো-খো বা বক্সিং-এর—

সারা দুনিয়ার যে কোন খেলার খবর জানার অসাধারণ পত্রিকা

খেলার আসর

ছোটদের আঁকার, লেখার পৃথক বিভাগ 'উঠছে যারা'য় তোমরা আজই লেখা পাঠাতে পারো নাম, ঠিকানা ও বয়স দিয়ে

সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩৩, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭২

Declaration No. 238 (8) Dt. 3.12.81 NABAM DASAM
1 March 1982 Rs. 5.00

নিজের লাইব্রেরিতে
ডঃ আইনস্টাইন